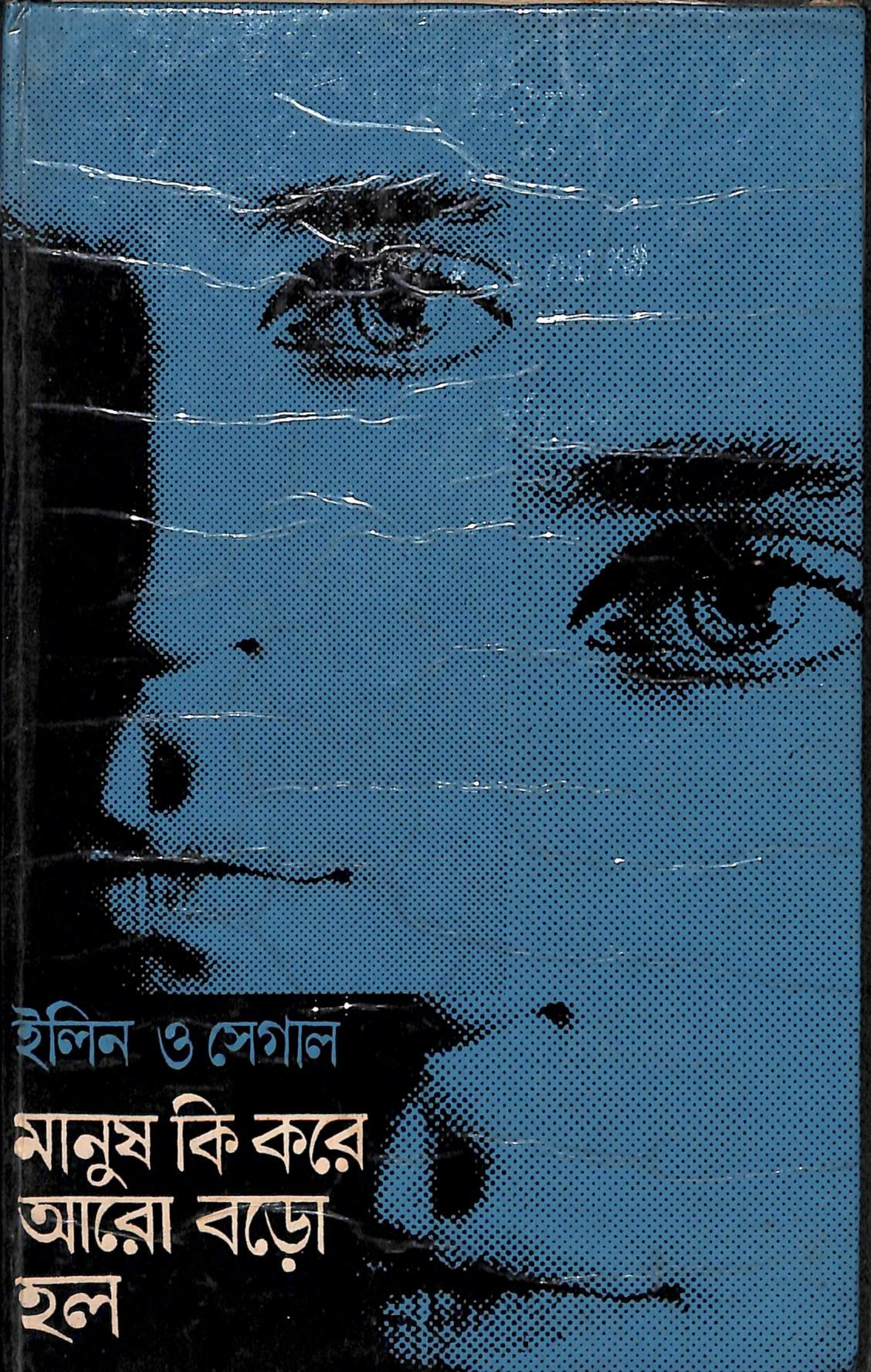

ইলিন ও সেগাল
মানুষ কি করে
আরো বড়ো
হল

মানুষ কি করে আরো বড়ো হল

প্রাচীন সভ্যতার কাহিনী

এম ইলিন
ই সেগল

অনুবাদ
অমল দাশগুপ্ত

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি

Manush Ki Kore Aro Baro Halo
Bengali translation of :
Giant At the Crossroads
M. Ilin and E. Segal

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৮৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭

প্রকাশক
সলিল কুমার গাঙ্গুলি
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ
১২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক
সমীর দাশগুপ্ত
গণশক্তি প্রিণ্টার্স (প্রাঃ) লিঃ
৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০১৬

প্রচ্ছদ
অজয় গুপ্ত

দাম ঃ আঠারো টাকা

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

বড়ো মানুষের যাত্রা শুরু

১। সংকীর্ণ এক গৃহে কি-ভাবে মানুষ থাকত। কি-ভাবে মানুষ সেটা জানল এবং সেখান থেকে বেরিয়ে এল।

প্রাচীনকালের আফ্রিকার মানুষ চারদিকে তাকিয়ে দেখতে পেত তার ডাইনে ও বাঁয়ে কারাগারের পাঁচিল—ধূ ধূ আরব মরুভূমি। তারই মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নীলনদ। সামনে কালো থমথমে সমুদ্র, পিছনে পাতালের ভয়াল ঘূর্ণি ও খরস্রোত, যেখান থেকে নীলনদ উঠে এসে মাটির ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। মাথার ওপরে আকাশের নীল ঘেরাটোপ, যেন ঘিরে-থাকা পর্বতমালার দেয়ালের ওপরে বসানো।

মিশরীয়রা ভাবত, এই জায়গাটুকুই গোটা বিশ্ব।

গোড়ার দিকে নদীটিকে তারা শুধুই 'নীল' বলত, মানে নদী। নিজেদের বলত শুধুই মানুষ। কেননা তারা ভাবত বিশ্বে আর কোনো নদী নেই, আর কোনো মানুষ নেই।

তাদের ধারণায় কালো ভালো রঙ, লাল খারাপ রঙ। কারণ তাদের মাটি কালো, আর বাইরের মরুভূমির জমি লাল। লাল জমি তাদের খুবই কাছে, কিন্তু সেখানে যাবার সাহস তাদের নেই। নীল সমুদ্র ছড়িয়ে আছে বিশ্বের মধ্যে একটা জানলার মতো, কিন্তু তাদের কাছে মনে হয় যেন একটা দুর্ভেদ্য আড়াল। তারা ভাবত সমুদ্রের ফেনা আসে সমুদ্র-দেবতার মুখ থেকে আর সমুদ্রের লবণ বিষাক্ত।

হাজার বছর ধরে মিশরীয়রা এমনিভাবে জীবন কাটিয়েছে, নিজেদের জনাকীর্ণ জগৎ ছেড়ে বাইরে যায়নি।

সময় কাটে। নীলনদ তাদের দেয় আরো বেশি বেশি শস্যদানা, দান হিসেবেই দেয়—এমনি এমনি। তবুও মানুষগুলো কাজ করে যায়, তাদের হাতের কাজ চালিয়ে যায়, এবং প্রতি শতকেই মানুষের হাত হয়ে ওঠে আরো দক্ষ, আরো কুশলী। তারা বুঝতে পারে, যুদ্ধবন্দীদের খুন না করে, তাদের মাথাগুলো কেটে নিয়ে সর্দারদের কাছে উপঢৌকন হিসেবে না পাঠিয়ে, তাদের দিয়ে যদি কাজ করানো যায় তাহলেই লাভ অনেক বেশি। খোদাই চিত্রে এই বন্দীদের দেখা যেতে পারে, সৈন্যবাহিনীর পিছনে পিছনে চলেছে, তাদের হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। মিশরীয়রা লাঠি নিয়ে এই বন্দীর পালকে তাড়িয়ে নিয়ে যেত। এই বন্দীরা ছিল 'বিদেশী', শয়তানের বাচ্চা।

মিশরীয়দের মধ্যে তখনো পর্যন্ত 'দাস' বলে কোনো শব্দ নেই।

পুরনো নামেই তারা নতুন জিনিসের নাম দিত। বন্দীদের বলত 'জীবন্ত মড়া'—আমাদের কানে অদ্ভুত ঠেকে, কিন্তু এই দুটি সংযুক্ত শব্দকেই আমরা দেখতে পাই কবরে ও লিপিতে। এই সমস্ত 'জীবন্ত মড়া' ক্ষেতে কাজ করত, খাল খনন করত, বাঁধ নির্মাণ করত।

মিশরে জীবন বদলে যায়। পুরনো ব্যবস্থা ছিল আদিম সাম্যবাদের, সেই ব্যবস্থায় জমি, থাকার জায়গা, পশুর পাল, এমনকি হাতিয়ারের ওপরেও ছিল সাধারণ মালিকানা। তার জায়গায় এখন দেখা দিল দাসত্বের ব্যবস্থা।

এতদিন পর্যন্ত সকলকেই সমানভাবে কাজ করতে হতো। এখন সেই কাজ ভাগ করে দেওয়া হলো শত শত মানুষের মধ্যে। কবরের দেয়ালে এখনো আমরা এমন সব চিত্র দেখতে পাই যাতে দেখানো হয়েছে কৃষক ও কারিগররা নিজের নিজের কাজ করছে—কুমোর ঘোরাচ্ছে কুমোরের চাকি, ছুতোর করাত দিয়ে কাঠ কাটছে, নিচু টুলের ওপরে বসে মুচি চটি বানাচ্ছে, কামার হাপর টানছে, চাষী ষাঁড় তাড়াচ্ছে।

যেখানেই কাজের ভাগাভাগি ঘটে সেখানেই মানুষ শুরু করে কাজ থেকে উৎপন্ন সামগ্রীর বিনিময়। কবর ও মন্দিরের দেয়ালের চিত্রে দেখা যায়, জেলে তার চুবড়ি থেকে একটা মাছ তুলে দিচ্ছে কামারের হাতে, বিনিময়ে কামার দিচ্ছে বঁড়শি ; চাষী তার সামগ্রীর বিনিময়ে নিচ্ছে একজোড়া চটি ; ব্যাধ খাচাঁসমেত পাখি তুলে দিচ্ছে শৌখিন পুঁতির জন্য।

আগেকার আদিবাসী জীবনের সময়ে গ্রামের সবকিছুর ছিল সাধারণ মালিকানা, ক্ষেতের কাজ করত সবাই একসঙ্গে। কিন্তু এখন যারা ধনী ও অভিজাত তাদের রয়েছে বড়ো বড়ো জায়গির, যারা গরিব তাদের সামান্য একটুখানি ক্ষেত। ধনীরা নিজেদের জমি নিজেরা চাষ করে না, চাষ করার জন্য তাদের আছে দাস। লাঙল দেওয়া ও ফসল কাটার সময়ে বৃহৎ জমিদাররা নিজেদের কাজ করিয়ে নেবার জন্য মুক্ত চাষীদের ভাড়া খাটাত। এমনকি কোনো ধনী লোক মারা যাবার পরেও লোকে তার কবরে ভেট নিয়ে আসত। মন্দিরের দেয়ালের চিত্রে দেখা যায় চাষীরা বলি দেবার জন্য ভেড়ার বাচ্চা নিয়ে আসছে, ধনী লোকের কবরে বলির অনুষ্ঠানের জন্য নিয়ে আসছে ঝুড়িভর্তি ফল ও ঘড়াভর্তি সুরা।

উৎপাদনের ব্যবস্থা বদলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ধ্যানধারণাও বদলে যায়।

মিশরীয়রা এই ধারণা লাভ করতে শুরু করে যে বিদেশীরাও 'মানুষ'। তবুও অনেকটা সময় কেটে যায় তাদের এই উপলব্ধি হতে যে তারা ও বিদেশীরা একই ধরনের মানুষ।

তারা বলত, বিদেশীরা হচ্ছে গরিব ও ঘৃণিত জীব। ভগবান'রা তাদের ঘৃণা করেন। সূর্য তাদের জন্য কিরণ দেয় না, কিরণ দেয় শুধু মিশরীয়দের জন্য। দাসকে হত্যা করা অপরাধ নয়।

মিশরীয়রা যে জগতে বাস করত তা তখনো পর্যন্ত সংকীর্ণ ও ক্ষুদ্র। শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়। যুদ্ধ-দেবতা ও পথ-প্রদর্শক ভেস্‌পুয়াতের নেতৃত্বে মিশরীয়রা আরো ঘনঘন ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। তাদের চাই দাস, আর একমাত্র যে উপায়ে তারা দাস পেতে পারে তা হচ্ছে যুদ্ধ করে

তাদের ধরে আনা। তাদের চাই সিডারকাঠ—গৃহনির্মাণের জন্য, তামা—কুড়ুলের জন্য, সোনা ও হাতির দাঁত—প্রাসাদ ও মন্দিরের জন্য। তরবারির জোরে যা পাওয়া যেত না তা তারা পেত শস্য, অস্ত্র ও অলংকারের বিনিময়ে।

দক্ষিণে, 'গজদন্ত দ্বীপে', তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তাদের কৃষ্ণকায় প্রতিবেশী নুবিয়ান হাতি-শিকারীদের সঙ্গে। সমুদ্রতীরে মিশরীয়রা বিছিয়ে দিল তাদের সামগ্রী—তামার ছুরি, নেকলেস ও পুঁতি। নুবিয়ানরা নিয়ে এল তাদের হাতির দাঁত ও সোনা-মেশানো বালি।

শুরু হয়ে গেল মূল্য নিয়ে দর-কষাকষি। ছোট যে বসতিতে এই সমস্ত দর-কষাকষি চলেছিল তার নাম সেভেন, যার অর্থ 'মূল্য'।

উত্তরের দিকে অন্য যে প্রতিবেশীরা ছিল, ফিনিসীয়রা, তারা এল জাহাজে। জাহাজগুলোকে টেনে নিয়ে এল তীরের ওপরে, কাছি দিয়ে বাঁধল তীরের শক্ত পাথরের সঙ্গে, আর তারপর জাহাজ থেকে নামিয়ে আনল সিডারকাঠ ও আকরিত তামা।

বাণিজ্য শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো ভূগোল। দ্বীপ, পর্বত, উপত্যকার নাম দেওয়া হলো। এমন নাম যা শুনেই বোঝা যেত সে-দেশে কী উৎপন্ন হচ্ছে। 'সিডার উপত্যকা' ঢাকা ছিল সিডারগাছে। সাইপ্রাসের 'তামাদ্বীপ' থেকে আসত তামা। রূপো আসত দূরের 'রৌপ্য পর্বত' থেকে, এখন যাকে আমরা বলি টরাস।

এক সময়ে মানুষ ভাবত বালির দানার চেয়ে ছোট আর কিছু নেই, পর্বতের চেয়ে বড়ো আর কিছু নেই। 'বালির দানার মতো ছোট' বা 'পর্বতের মতো বড়ো'—কথাগুলো আজও আমরা ব্যবহার করে চলেছি।

মানুষ কিন্তু ছোট জিনিসের জগতে প্রবেশ করেই চলল—এত ছোট যে খালি চোখে দেখা সম্ভব নয়। পথ তারা অনুভব করে নিত অন্ধ মানুষের মতো—কি করে ধাতু পাওয়া যায় সেই উপায় খুঁজত। ধাতু নিয়ে যারা কাজ করত, অর্থাৎ কামাররা, তারা আগুনকে ডেকে আনল তাদের সাহায্য করার জন্য। আর আগুন সেই আকরিক থেকে তামাকে মুক্তি দিল। গলগল করে পড়তে লাগল তামা—চকচকে, ঝকঝকে ও ঝনঝনে।

মানুষের হাতে যেই-না একটুকরো আকরিক এসে গেল অমনি তার ধারণা হলো যে বিরাট এক সম্পদ সে পেয়ে গিয়েছে। তখন সেই আকরিকের মধ্যে নজর চালাতে লাগল যাতে ছোট জিনিসের জগতে বড়ো জিনিসের জগতের চাবিকাঠির সন্ধান পাওয়া যায়।

সিডার উপত্যকায় শত-বছরের প্রাচীন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ পড়ে গেল। ফিনিসীয়রা তাদের ধারালো তামার কুড়ুল দিয়ে সেই সমস্ত গাছের শক্ত গুঁড়ি থেকে কেটে কেটে বার করল তাদের ছুঁচলো মুখওলা ছোট ছোট ডিঙি। প্রথমে কেটে বার করল লম্বা একটা বীম, তার সঙ্গে জুড়ে দিল নৌকোর কাঠামো। কিনারাগুলো মিলিয়ে দিল চামড়া মাপার চামড়ার দড়ি দিয়ে। তারপরে ওপরের দিক এক সঙ্গে জুড়ে দিল, তার ওপরে বসিয়ে দিল পাটাতন। তলকাঠ বানাল মাছের লেজের মতো করে, যাতে ডিঙি জলের ওপর দিয়ে ভেসে যেতে পারে মাছের মতো। গলুই বানাল প্রকাণ্ড একটা পাখির চঞ্চুর মতো করে, যাতে ডিঙি ঢেউ কেটে এগিয়ে যেতে পারে বাতাস কেটে যাওয়া পাখির মতো।

বাস্, তৈরি হয়ে গেল আশ্চর্য এক বিস্ময়, যা তাদের বয়ে নিয়ে যাবে অজানা দেশে।

কিন্তু ওই যে দেখা যাচ্ছে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে গলুইয়ের ওপরে বসিয়েছে অদ্ভুত চেহারার ছোট একটা মানুষের মূর্তি—সে কে? সে হচ্ছে বামন পুয়াম, হাতুড়ির দেবতা। তাকে সঙ্গে নেবে না তো কাকে নেবে? সে সাহায্য করেছে বলেই না অন্ধকার গুহা থেকে তারা আকরিক বার করতে পেরেছে। সে-ই তো বানিয়েছে কামারশালার অগ্নি থেকে কুড়ুল। আর ছুতোররা যখন জাহাজ তৈরি করছিল তখনো সে কাজ থেকে সরে দাঁড়ায়নি। এই মানুষটি বেরিয়ে আসুক তার ছোট জিনিসের জগৎ থেকে, লক্ষ্য করুক বিরাট জগতের বিপুল বিস্তারের মধ্যে তার সন্তান এই জাহাজটিকে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়। আমাদের অব্দ শুরু হতে এখনো পাঁচ হাজার নয়, চার হাজার বছর বাকি।

ফিনিসীয়দের ডিঙি সারা ভূমধ্যসাগরে পাড়ি দিয়ে বেড়াল, এমনকি তার চেয়েও দূরে, আরও দূরে, দ্বীপে-দ্বীপে ও উপদ্বীপে-উপদ্বীপে গড়ে তুলল বসতি, খাড়া করল বাণিজ্যের ঘাঁটি, স্থাপন করল বসতিস্থাপনকারীদের উপনিবেশ।

মহাসাগরের মুখের কাছেও তারা এসেছিল, সেখানে দেখেছিল 'মেলকার্টের স্তম্ভ'। এই সেই মেলকার্ট যিনি ফিনিসীয় নগর টায়ার-এর প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন। তিনিই বসিয়েছিলেন সাগর থেকে মহাসাগরে বেরিয়ে যাবার মুখে এই স্তম্ভগুলো। এই হচ্ছে চিহ্ন যা ছাড়িয়ে কেউ যেন না যায়। যেন নাবিকদের তিনি বলছেন, 'থামো! আর এক পা-ও সামনে নয়! অনেক আগেই তুমি তোমার মাতৃভূমির দেয়াল থেকে দূরে চলে এসেছ! এই হচ্ছে জগতের কিনার, এখানেই থেমে পড়ো।'

বহু বছর এই হুকুম অমান্য করার সাহস নাবিকদের ছিল না। বাইরের দিকে ছড়ানো মহাসাগরের অকূল বিস্তৃতি ভীতিপ্রদ মনে হতো।

কিন্তু যে-সব বণিকের দুঃসাহস বেশি তাদের প্রলুব্ধ করত অদেখা দেশ। একের পর এক তারা সীমানা ছাড়িয়ে চলে গেল। দাঁড়ীরা ঝুঁকে পড়ল দাঁড়ের দিকে আর দাঁড়গুলো গান গেয়ে উঠল। দূরে ঐ দেখা যাচ্ছে ফ্রান্স ও স্পেনের উপকূল যেখানে তখনো বন্য মানুষরা বাস করত। ফিনিসীয়রা পৌঁছে গেল ব্রিটেনের টিন-সমৃদ্ধ দ্বীপে ও বাল্টিকের হলুদ উপকূলে!

লোকে এখন সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইতিমধ্যে পৃথিবী অনুসরণ করেছে সূর্যের চারদিকে তার নিয়মিত পরিক্রমা।

শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়। এখন চলেছে খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০০ অব্দ নয়, ২৮০০।

জ্ঞানী রাজা সলোমন তাঁর নিজের জাহাজগুলোতে কাজ করার জন্য প্রতিবেশী ও বন্ধু, ফিনিসীয়দের রাজা, হিরমের কাছে জনকয়েক অভিজ্ঞ নাবিক চেয়ে পাঠালেন। সেই সমস্ত জাহাজে চেপে হিব্রুরা ও ফিনিসীয়রা চলে গেল লোহিত সাগরে, পারস্য ও ভারতবর্ষের দূর দূর দেশে—নিজেদের প্রাসাদ ও মন্দিরের জন্য সোনা ও রুপো আনতে, সেই সঙ্গে হাতির দাঁত, বানর, ময়ূর...

বিশ্বের সীমানা ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু খোলা মহাসাগরে যাবার মতো সাহস নাবিকদের ছিল না। তারা ভাবত, মহাসাগর থেকে ফিরে আসার পথ তারা আর খুঁজে পাবে না। তার কারণ এই যে জমি ও সমুদ্র হচ্ছে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। জলের ওপরে দাঁড়ের কোনো চিহ্ন থাকে না। কিন্তু জমির ওপরে নিজের পায়ের চিহ্ন ধরে কিংবা যাবার সময়ে সিডারগাছের গুঁড়িতে ফুটিয়ে তোলা সংকেত দেখে ফিরে আসার পথ খুঁজে পাওয়া যায়। তাছাড়া এখানে-ওখানে পাওয়া যেতে পারে পুরনো কোনো বসতির চিহ্নস্বরূপ পাথরের স্তূপ। যাত্রীদলের প্রাচীন কোনো গমনপথ বরাবর ছড়ানো থাকতে পারে মাটির পাত্রের ভাঙা টুকরো কিংবা ভেড়া ও উটের সাদা হয়ে যাওয়া হাড়। এমনকি রাস্তার ধারে নির্দেশক ফলকও থাকে যা দেখে বোঝা যায় রাস্তাটি কোথায় গিয়েছে আর লোকে সেই সমস্ত কালো নির্দেশক ফলকগুলোকে দেবতা বলে পুজো করে।

জমির কোথায় কী আছে, শুধু সেটুকু দেখলেই পথের হদিস পাওয়া যায়। একজন যাত্রী যদি যেতে যেতে প্রত্যেকটি টিলা ও প্রত্যেকটি উপত্যকা লক্ষ্য করে চলে তাহলে তার পক্ষে পথ খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়।

কিন্তু সমুদ্রের ওপরে...সেখানে উত্তাল নিত্য-পরিবর্তনশীল ঢেউ ছাড়া আর কিছু নেই। একটি থেকে অপরটিকে আলাদা করে চেনা যায় না। কোনো রকম বসতির কোনো চিহ্ন নেই। জলের নিচে চিরকালের জন্য চোখের আড়াল হয়ে গিয়েছে ডুবে-যাওয়া মানুষের মৃতদেহ ও জাহাজের ধ্বংসাবশেষ। নিচে নীল সমুদ্র, ওপরে নীল আকাশ—এছাড়া আর কিছুই যেখানে নেই সেখানে গেলে হারিয়ে যেতে হবে না এমন হতেই পারে না।

মানুষ তখন পিছনদিকে মাথা হেলিয়ে দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। আকাশের তারার মধ্যে অনুসন্ধান করল দিক-নির্দেশক ও সংকেত-জ্ঞাপক কিছু পাওয়া যায় কিনা। দেখা গেল, অবশ্যই পাওয়া যায়। দিনের বেলা হলে সূর্যই দেখিয়ে দিচ্ছে কোন দিক দক্ষিণ। আর রাত্রিবেলা হলে উত্তরদিক দেখিয়ে দিচ্ছে লিট্‌ল ডিপার। এই কারণেই তারা লিট্‌ল ডিপার-এর তারামণ্ডলকে বলত 'ওয়াগন'—এটি ছিল যাত্রীদের যান।

এমনিভাবে মানুষ সূর্য ও তারার দিকে তাকিয়ে তার নিজের গ্রহের ওপরে প্রভুত্ব স্থাপন করল। গ্রহদের মধ্যে অনুসন্ধান চালাল তার নিজের বৃহৎ জগতের চাবিকাঠির জন্য আর সেই চাবিকাঠি সে লাভ করল যেমন ক্ষুদ্র জিনিসের অদৃশ্য জগতের মধ্যে, তেমনি অন্যান্য গ্রহের বৃহৎ জগতের মধ্যে।

যে সমুদ্র এক দেশকে অন্য দেশ থেকে পৃথক করে রাখত সেই সমুদ্রই এখন এক দেশের সঙ্গে অপর দেশকে মিলিত করল।

বিদেশীরা সঙ্গে নিয়ে আসত মাটির পাত্র, সুতিবস্ত্র ও দাস শুধু নয়, তদুপরি বিদেশী বিশ্বাস, বিদেশী রীতি-নীতি, বিদেশী চারু ও কারু শিল্পও। লিপি নিয়ে আসা হলো ক্রিট থেকে ফিনিসিয়ায়, ফিনিসিয়া থেকে গ্রীসে আর এই যাত্রাপথে পরিবর্তিত হলো চিত্র থেকে অক্ষরে—বর্ণমালায়।

ফিনিসীয় যতো জাহাজ সমুদ্রে পাড়ি দিত তার প্রত্যেকটিতে থাকত লিখতে ও পড়তে-জানা একজন মানুষ। সে নোট নিত ও হিসেব রাখত। সেটা এই কারণে যে জাহাজ যখন আবার স্বদেশে ফিরত তখন জাহাজের মালিকের কাছে সঠিক বিবরণ দিতে হতো। অতএব ফিনিসীয় ডিঙিগুলো

সঙ্গে নিয়ে গেল কেবল কড়া প্যালেস্টাইনীয় সুরা ও ঝকঝকে লাল পোশাক নয়, সেই সঙ্গে বর্ণমালার অক্ষরগুলিও—যা ছিল বিশ্বের প্রথম বর্ণমালা। ফিনিসীয় সেই শব্দগুলো এখনো আমাদের ভাষায় থেকে গিয়েছে।

মনুষ্যদল বিলুপ্ত হয়, রাজ্যের পতন ঘটে, বাণ্ডিল বাণ্ডিল প্যাপিরাস ছাই হয়ে দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বর্ণমালা বিলুপ্ত হয় না—অক্ষরগুলো টিকে থাকে। সময় নিজেও এই অক্ষরগুলোর ওপরে কোনো জোর ফলাতে পারে না।

এই ডজনদুয়েক চিহ্নের চেয়ে আরো মূল্যবান কোনো সম্পত্তি মানবজাতির ছিল না। একটি হাল্‌কা অথচ জোরালো সেতু দিয়ে যুগ থেকে যুগে তারা এক জাতির সঙ্গে অপর জাতিকে যুক্ত করল। সেই অক্ষরগুলো ছিল বলেই আমরা জানতে পেরেছি সেই দীর্ঘকাল ধরে ব্যাপ্ত শতাব্দীগুলিতে মানুষের চিন্তায় কী সৃষ্টি হয়েছিল। স্মৃতিতে এমন সীমান্ত নেই যাতে সমস্ত জ্ঞান ধারণ করা যেতে পারে। সাহায্যের জন্য আমাদের ডাক দিতে হয় বর্ণমালাকে। এই অক্ষরগুলো নতুন করে সৃষ্টি করে পুরনো বিস্মৃত জগতকে এক দীর্ঘ অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খলে ঐক্যবদ্ধ করে—কি প্রাচীন, কি আধুনিক—মানবজাতিকে। আমরা দেখতে পাই যা এখন আর নেই, শুনতে পাই যে স্বর অনেক আগেই থেমে গিয়েছে।

কিন্তু ফিনিসীয় নাবিকদের কথায় ফিরে আসা যাক।

অজানা কোনো তীরে পৌঁছলে তারা দোভাষীর সাহায্যে নিজেদের কথা বুঝিয়ে দিতে পারত। তাদের জানতে হতো প্রত্যেকটি জায়গায় কী ধরনের মানুষ বাস করে—এমন বুনো মানুষ কিনা যারা এখনো সভ্যতা জানে না, কিংবা এমন মানুষ কিনা যারা দেবতাদের পুজো করে। কখনো কখনো এমন হতো যে নতুন জায়গায় মানুষরা অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে বর্শা আর তীর ছুঁড়ে। অতিথিরা এ থেকে শিক্ষা নিত। আরো সতর্ক হয়ে যেত তারা। পরের বার বালুকাময় তীরের ওপরে পণ্যসম্ভার বিছিয়ে দিয়ে একটা সংকেতজ্ঞাপক আগুন জ্বালিয়ে দিত। নিজেরা সরে যেত সমুদ্রের মধ্যে, তার থেকে দূরে।

স্থানীয় মানুষরা আগুনের ধোঁয়া দেখতে পেত আর সাবধানে এগিয়ে আসত বিছিয়ে রাখা উপহারগুলো নেবার জন্য, আর বিনিময়ে নিজেরাও উপহার রেখে যেত। পরস্পরকে না দেখেও এমনিভাবে পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাৎকার হয়ে যেত।

কিন্তু বণিকরা যখন এমন কোনো জায়গায় এসে পৌঁছত যেখানকার মানুষদের সঙ্গে তারা আগে থেকেই পরিচিত তখন ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াত সম্পূর্ণ অন্যরকম। এখানে তারা নিজেদের ডিঙিগুলোকে টেনে নিয়ে আসত তীরের ওপরে, বড়ো দড়ি দিয়ে সেগুলোকে শক্ত করে বাঁধত কোনো ভারী পাথরের সঙ্গে, তারপরে নৌকোর পাটাতনের ওপরে পণ্যসম্ভার বিছিয়ে দিত—ঠিক যেন দোকান সাজিয়ে বসেছে। মেয়েরা ভিড় করে আসত, এমনকি জনকয়েক বান্ধবী সঙ্গে নিয়ে সর্দারের মেয়েও এসে দাঁড়াত।

বাণিজ্য চলত শান্তিপূর্ণভাবে। কিন্তু কখনো কখনো এমন হতো যে একেবারে শেষ মুহূর্তে, যখন সবকিছু বিক্রি হয়ে গিয়েছে আর জাহাজ তৈরি হচ্ছে সমুদ্রে ভাসার জন্য, শান্তিপূর্ণ বণিকরা হঠাৎ হয়ে দাঁড়াত

দস্যু। মেয়েদের পাকড়াও করে তারা টেনে নিয়ে আসত জাহাজে। মেয়েরা সাহায্যের জন্য চিৎকার জুড়ে দিত, কিন্তু তখন বড়োই দেরি হয়ে গিয়েছে। অনুকূল বাতাসে ফুলে উঠত সাদা পাল, দাঁড়ীরা নুয়ে পড়ত দাঁড়ের ওপরে, জাহাজ চলে যেত দূরে—ক্রমেই ছোট হতে হতে।

মায়েরা কাঁদত আর পরনের কাপড় ছিঁড়ত। বুড়ীরা সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করত তাদের ঃ 'দেবতার এই ইচ্ছে বুঝে নাও তোমরা। মোড়লের মেয়ের যতোই দেমাক থাকুক তাকেও দাসীগিরির তেতো সোয়াদ পাইয়ে দিচ্ছে।'

২। নতুন এক জগতে নিজেকে দেখতে পায় মানুষ যে জগত সে বোঝে না।

আরো এক শতাব্দী পার হলো। জাহাজগুলো আরো দূর থেকে দূরে যাচ্ছে। জগতটা বড়ো থেকে আরো বড়ো হয়ে চলেছে, যেমন আরো উঁচু ও আরো বড়ো হয় ঈগলপাখির চক্কর যতো সে আকাশে ওঠে।

গ্রীকরা ফিনিসীয়দের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে শুরু করল। পশ্চিমে তারা গিয়ে পৌঁছল ইতালিতে, উত্তরে সিথীয়দের স্তেপে। কৃষকরা—এশিয়া মাইনরের গ্রীক নগর মাইলেটাসের উপনিবেশস্থাপনকারীরা—কৃষ্ণসাগরের তীরে নেকড়ে শিকার করত। মাইলেসীয় বণিকরা বিক্রি করত সুন্দরভাবে অলংকার করা পাত্র ও সূচিকর্ম করা উলের কাপড়।

এক বৃহৎ নতুন জগৎ খুলে গিয়েছিল, যে-জগৎ ছিল রহস্যে ও বিস্ময়ে ভরা। সেজন্য মাত্র এটুকুই করার ছিল যে অ-দেখা কোনো বিদেশের তীরে নৌকো বাঁধতে হতো আর সেটাই হতো স্বপ্নের দেশ। নতুন এই জগতে মানুষরা তখনো পর্যন্ত বুঝতে পারত না তারা নিজেদের চোখে কী দেখছে, নিজেদের কানে কী শুনছে।

তারা শুনত অদ্ভুত দুর্বোধ্য সব ভাষা, একদল বাদুড়ের চিঁ-চিঁ ডাকের মতো, কিংবা পাখিদের কিচিরমিচিরের মতো। উঁচু উঁচু পর্বতকে দেখাত আকাশ-ছোঁয়া গম্বুজের মতো।

যাত্রীরা প্রথম যখন বানর দেখতে পেল তখন ভাবল ওরা হচ্ছে লোমে-ঢাকা মেয়ে-পুরুষ যারা কাছে গেলে কামড়ায় ও আঁচড়ায়। সমুদ্রের ধারে জ্বালানো আগুনকে ভাবল সমুদ্রে প্রবাহিত আগুনের নদী।

নতুন জগতে প্রবেশ করার জন্য মানুষকে হতে হলো নতুন, সে যা ছিল তা থেকে ভিন্ন। জলের ওপর দিয়ে যাবার জন্য তাকে শিখতে হলো দাঁড়ের ব্যবহার। ঘোড়ার চারটি দ্রুতগতি পা এবং ধৈর্যশীল ও বহু-সহনশীল উটকে সে ব্যবহার করল মরুভূমি ও স্তেপের তোরণ তার কাছে খুলে দেবার জন্য। এমন সব দেশে সে ঢুকে গেল যা আগে কখনো দেখেনি। কিন্তু, যা আগে কখনো দেখেনি তাই দেখাটাই যথেষ্ট ছিল না—তাছাড়াও তাকে বুঝতে হতো যা সে চিনত না। আর এটাই ছিল সবচেয়ে শক্ত।

আসলে মানুষ তখনো বিচার করছিল তার পূর্বপুরুষদের মাপকাঠি দিয়ে। নতুন কিছু দেখলেই তার মধ্যে খুঁজত পুরনো ও চেনা কিছু আছে

কিনা। আর পুরনো ও চেনা কিছু খুঁজে না পেলে হতভম্ব হয়ে যেত, নিজের চোখে যা দেখছে তা বুঝতে পারত না।

এবারে ফিরে যাওয়া যাক ফারাওদের সময়ের মিশরে। ফারাওরা তিন হাজার বছর আগে রাজত্ব করেছিল।

সে-সময়ে মিশরীয়রা ভাবত তাদের নদী হচ্ছে জগতের একমাত্র নদী। আরো হয়েছে কি, এই নদী প্রবাহিত হতো দক্ষিণ থেকে উত্তরে, তাই তারা ভেবে নিয়েছিল নদী প্রবাহিত হতে পারে একমাত্র এই একটি দিকেই। যখন তারা লিখতে চাইত 'উত্তর', তারা আঁকত পালহীন স্রোতে-ভেসে-চলা জাহাজের ছবি। আর 'দক্ষিণ' লিখতে হলে আঁকত পাল-তোলা স্রোতের-বিরুদ্ধে-চলা নৌকোর ছবি।

কিন্তু নিজেদের ছোট সংকীর্ণ বাসভূমি থেকে বেরিয়ে আসার পরে তারা দেখতে পেল অন্য নদী। ইউফ্রেটিসের কাছে যখন পেঁছিল তখন এক দেখার মতো দৃশ্য—তাদের নিজেদের নদী যে-দিকে প্রবাহিত, ইউফ্রেটিস প্রবাহিত হচ্ছে ঠিক তার উল্‌টো দিকে। ব্যাপারটা দেখে এতই অবাক হলো যে ভবিষ্যৎ বংশধরদের এই আশ্চর্য আবিষ্কারের কথা জানিয়ে যাওয়া দরকার বলে মনে করল। রাজা প্রথম টুট একটি শিলালিপি তৈরি করিয়েছিলেন যাতে বলা হয়েছে—'ইউফ্রেটিসে জল সম্পূর্ণ ঘুরে যায় এবং স্রোতের বিরুদ্ধে পিছনদিকে প্রবাহিত হয়।'

অনেক জিনিসই মিশরীয়দের অবাক করত। যখন তারা নিজেদের দেশ ছেড়ে বাইরের জগতে যেত। যেমন নিজেদের দেশে তারা দেখতে অভ্যস্ত ছিল যে নীল নদের ছাপিয়ে পড়া জলে ফসলের জলসেচ হয়। তাই, যখন তারা প্রথম বৃষ্টি পড়তে দেখল তখন ভাবল যে এ হচ্ছে আকাশ থেকে নেমে আসা এক আশ্চর্য নদী।

যতোই সময় পার হতে লাগল ততোই তারা তাদের শিলালিপিগুলো বসাতে লাগল মরুভূমির মধ্যে দূর থেকে দূরে। শিলালিপিগুলোতে ফলাও করে লেখা থাকত ফারাওদের কীর্তিকাহিনী, যে-ফারাওরা 'পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে'।

যতোই তারা তাদের সীমানা বাড়িয়ে নিয়ে গেল ততোই তাদের কাছে এ-কথা আরো পরিষ্কার হতে লাগল যে, আর যাই হোক, জগতে তারা একমাত্র মানুষ নয়, এমনকি সেরা মানুষও নয়। তাদের রাজদূতরা যখন দেশে ফিরে এল তাদের মুখে শোনা গেল বাবিলনের বিরাট প্রাচীরের কথা, যে-প্রাচীর এতই চওড়া যে তার ওপর দিয়ে চারটে ঘোড়া পাশাপাশি চলতে পারে। আর তারপরে তারা দেখল ঝুলন্ত বাগান, যেখানে পুরো আকারের গাছ জন্মাচ্ছে, যেখানে রয়েছে পুকুর আর সেই পুকুরে হাঁস সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। নগরের ওপরে মাথা তুলে দাঁড়ানো বাবিলনীয় মন্দিরগুলো দেখে এই রাজদূতরা বিস্ময়ে মূক হয়ে গেল। মিশরীয়রা গর্বের সঙ্গে ভাবত তারা খুব পন্ডিত, কিন্তু তারা দেখল যে বাবিলনীয় পুরোহিতদের কাছে তাদের অনেক কিছু শেখার আছে।

ক্রমে ক্রমে তারা শ্রদ্ধা করতে শিখল বিদেশীদের, তাদের আচার-আচরণকে, তাদের ধর্মকে। ব্যাপারটা এতদূর পর্যন্ত গড়াল যে যে-ফারাওরা

আগে বিয়ে করত কেবলমাত্র নিজেদের বোনদের তারাই বৌ বাছাই করতে লাগল বিদেশী রাজকুমারীদের মধ্যে থেকে। একটি লিপিতে আমরা দেখতে পাই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে কেমন করে উত্তরের দেশে খারাপ আবহাওয়া ও ঝড় চলতে থাকা সত্ত্বেও রাজকুমারী মিশরে এসেছিলেন একজন ফারাওকে বিয়ে করার জন্য।

অন্যদিকে যে মিশরীয়রা এক সময়ে আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়তে দেখলে অবাক হতো তারাই এখন বুঝতে পারল, শুধু বৃষ্টি নয়, আকাশ থেকে তুষারও পড়ে।

মানুষ দেখতে পেল নতুন নতুন জিনিস আর নতুনভাবে চিন্তা করতে শিখল।

তখনকার দিনে চিন্তা করা মানেই ছিল বিশ্বাস করা। এক সময়ে প্রত্যেক নগরের নিজস্ব দেবতা ছিল। এই দেবতা ছিল তার রক্ষাকর্তা, তার পূর্ব-পুরুষ, ভালোবাসত শুধু তার নিজের মানুষদের এবং বহিরাগতদের পরাভূত করতে তাদের সাহায্য করত। কিন্তু এখন, নগর থেকে নগরকে, উপজাতি থেকে উপজাতিকে বিচ্ছিন্ন করেছিল যে-প্রাচীর তা ভেঙে পড়ল। গোড়ার দিকে মানুষ সব সময়েই বাইরের লোকদের শত্রু হিসেবে দেখত, তাদের অবজ্ঞা করত। কিন্তু এখন তাদের দেখাসাক্ষাৎ হতে লাগল শান্তিপূর্ণভাবে। দেখাসাক্ষাৎ হতো শুধু রণক্ষেত্রেই নয়, হাটেবাজারে, জাহাজঘাটাতে, পুজোপার্বণের দিনে মন্দিরে। তারা মেলামেশা করত এবং নানা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলত, বিভিন্ন দেবতায় বিশ্বাস রেখে চলত। এই অজানা দেবতাদের বিষয়ে তারা যখন জানতে পারল তখন অবাক হয়ে আবিষ্কার করল যে ভিন্ন ভিন্ন নামে আসলে পুজো করা হচ্ছে একই দেবতাকে। ফিনিসীয়রা তাদের আদোনিসকে চিনতে পারল মিশরীয়দের ওসিরিস-এ, যিনি প্রকৃতির দেবতা, যাঁর মৃত্যু হয় কিন্তু অনন্তকাল ধরে পুনরুত্থান ঘটে।

প্রতি বসন্তে মিশরীয়রা চমৎকার একটি প্যাপিরাসের গোলক তৈরি করত। সেটি দিয়ে বোঝাত ওসিরিসের মস্তক, যে ওসিরিসকে শয়তান দেবতা সেট্ হত্যা করেছে। সমুদ্র পেরিয়ে মস্তকটি তারা পাঠাত ফিনিসীয়-দের কাছে। সেখানে স্ত্রীলোকরা কাঁদতে কাঁদতে মস্তকটি গ্রহণ করত অর্থাৎ আদোনিস-ওসিরিসকে। তারপরে আদোনিস-ওসিরিস-এর উত্থান ঘটত আর শুরু হতো বসন্তের উৎসব—যে উৎসব পুনরুত্থানের, যে উৎসব সর্বজনের।

এক মানুষ তখন অন্য মানুষের দেবতায় বিশ্বাস করতে শুরু করল। বাবিলনের রাজা দেবতা ইশ্তার-এর একটি মূর্তি পাঠিয়ে ফারাওকে লিখলেন ঃ 'সকল দেশের শাসনকর্তা নিনেভের ইশ্তার বলছেন ঃ আমার প্রিয় দেশ মিশরে চলেছি।'

অল্পদিনের মধ্যেই মানুষ পুজো করতে শুরু করল সকল জাতির রক্ষক এক বিশ্বজনীন দেবতাকে। মিশরের ফারাও আখেনাতেন এই নতুন দেবতার জন্য একটি মন্দির বানালেন এবং একটি আবেগসঞ্চারী স্তোত্রে তার বন্দনা করলেন :

'হে চির-শাসক, তোমার আগমন অতি সুন্দর। তোমার কিরণ সকল মনুষ্যজাতিকে আলোক দান করে। তোমার কিরণ যেখানে তুমি চালিত করো সেখানে সকল ভূমি আলোকিত হয়।'

একটা সময় ছিল যখন মিশরীয়রা ভাবত সূর্য শুধু তাদের জন্যই কিরণ দেয়। কিন্তু যখন তাদের কাছে জগৎ উন্মুক্ত হলো তারা দেখল সবচেয়ে দূরের দেশেও সূর্য কিরণ দিয়ে থাকে। 'সবচেয়ে দূরের দেশেও তুমি জীবন দিয়েছ। তুমি তাদের দিয়েছ স্বর্গ থেকে নেমে আসা নীলনদ।'

একসময়ে তারা ভাবত তারাই হলো একমাত্র 'মানুষ'—প্রকৃত মানুষ। দেবতারা বিদেশীদের ঘৃণা করে। তারপরে বিদেশীদের আরো ভালো করে চিনতে পারল তারা। কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, মিশরে বসবাস করছে যতো-না মিশরীয় তার চেয়ে বেশি বিদেশী। ফারাওর যুদ্ধরথের সঙ্গে সঙ্গে আসত বিদেশী যোদ্ধারা। দূর দূর থেকে পণ্যসম্ভার নিয়ে হাজির হতো বিদেশী বণিকরা।

'মানুষের ভাষা ভিন্ন, মানুষের গায়ের চামড়ার রঙ ভিন্ন.....কিন্তু প্রত্যেককে দাও তার নিজস্ব স্থান আর প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা করো......

'পৃথিবীতে সব মানুষের ঠাঁই হতে পারে, যা-ই তাদের ভাষা হোক না কেন...'

এমনি ভাবতেন তিন হাজার বছর আগে ফারাও আখেনাতেন। তবুও এমনকি আজকের দিনেও এমন মানুষ আছে যারা এই কথাটা বোঝে না বা বুঝতে চায় না।

অতএব সেই আখেনাতেনের সময় থেকেই জগতের সীমানা বাইরের দিকে এত দূর পর্যন্ত সরে গিয়েছিল যে নীলনদের তীর থেকে দেখা যেতে লাগল অন্যান্য নদী, অন্যান্য সাগর, অন্যান্য জাতি। 'মনুষ্য জাতি'—এই শব্দটি প্রথম দেখা গেল মিশরের মন্দিরের দেয়ালে।

কিন্তু সব মানুষ আখেনাতেনের মতো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিল না। তারা দেখতে পেত না কিংবা দেখতে চাইত না। এই শক্তিশালী রাজা বিদেশীদের সঙ্গে এবং প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন সাধারণ মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলেন। তাঁর ছিল অনেক শত্রু, যারা নিষ্ঠুরভাবে তাঁকে নির্যাতন করেছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে ক্ষমতা আবার চলে গেল পুরোহিত ও অভিজাতদের হাতে। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো মন্দির এবং প্রাচীন দেবতাদের পুজো। আখেনাতেনকে শত্রু ও পাপী হিসেবে চিহ্নিত করা হলো। এমনকি সমাধির শিলালিপি থেকে ও মন্দিরের দেয়াল থেকে তাঁর নাম তারা মুছে ফেলল।

চারদিক থেকে উন্মুক্ত হয়ে গেল এক বিশাল সীমাহীন জগৎ। কিন্তু পুরনো ব্যবস্থার সংরক্ষকরা একগুঁয়ের মতো আঁকড়ে থাকল পুরনো সীমানা ও পুরনো বিশ্বাস, যার প্রচলন হয়েছিল এমন এক সময়ে যখন মিশরীয়রা বাস করত সংকীর্ণ ক্ষুদ্র এক জগতে।

কথাটা শুধু যে মিশরের বেলায় সত্য তা নয়।

একই ব্যাপার ঘটেছিল গ্রীসে। গ্রীক নাবিকরা সমুদ্রে জাহাজ ভাসিয়েছিল, নতুন নতুন দেশ খুঁজে পেয়েছিল, পর্বতের গা বেয়ে উঠেছিল এবং গুহায় অনুসন্ধান চালিয়েছিল। তারা নিয়তই আরো বড়ো করে তুলছিল জানা জগতের সীমানা। তারা প্রকৃতই দেখেছিল উপকথার একচক্ষু দৈত্য ও তিন-মস্তক কুকুরের দেশ। কিন্তু তবুও সর্দারদের ভোজের আসরে চারণরা যে গান গাইত তাতে বলা হতো দেবতারা কি-ভাবে একসময়ে

দৈত্যদের সঙ্গে লড়াই করেছিল আর কি-ভাবে বীর হারকিউলিস তিন-মস্তক কুকুরকে পাতালের রাজ্য থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল। মানুষ যখন পর্বতের চুড়োয় উঠছে চারণ তখনো মাউন্ট অলিম্পাসে দেবতাদের বাস নিয়ে গান গাইছে।

গ্রীক শহরগুলোর অবস্থান ছিল মেসিনা উপসাগরের তীরে—ইতালি ও সিসিলির মধ্যে। কিন্তু গ্রীকরা তখনো বিশ্বাস করত সিলা ও কারিব্ডিসের পুরনো গল্প, যে-দুই রাক্ষসী এই সমস্ত উপসাগরে নাবিকদের ভক্ষণ করত।

জগতের সীমানা ছড়িয়ে পড়ল ব্রিটেনের টিন দ্বীপ পর্যন্ত, সিথিয়ানদের তৈলস্ফটিক উপকূল পর্যন্ত এবং ভারতবর্ষ পর্যন্ত। কিন্তু তখনো পর্যন্ত এমন লোক অনেক ছিল যারা ভাবত জগতটা সেই অডিসিয়ুসের সময়ের মতো একই রকম সংকীর্ণ ও ক্ষুদ্র।

তারা ভাবত, এই জগৎ হচ্ছে সমতল বৃত্তের মতো, ওল্টানো ব্রোঞ্জের বাটি দিয়ে বা আকাশ দিয়ে ঢাকা। তার তোরণ দুটি—একটি পুবে, অপরটি পশ্চিমে। রোজ ভোরে ঊষা পুবের তোরণ খুলে চারটি তেজী কেশরওলা ঘোড়া ছেড়ে দেয় আর সেই ঘোড়া চালিয়ে নিয়ে যায় ঝলমলে রথী। সন্ধেবেলা, ওসীন নদী ছাড়িয়ে পশ্চিমের কোনো এক জায়গায় অন্য তোরণ খুলে যায় আর পশ্চিম আকাশের ঢালু দিয়ে সেই রথ নিচে নেমে যায় রাতের দিকে।

অডিসিয়ুস যেখানে থাকত সেই সুন্দর ইথাকা দ্বীপের কাছে ছিল লিউকাডিয়ার সাদা চুড়ো। ঠিক তার পিছনেই ছিল পাতালরাজ্যে ঢোকার পথ, সেখানে ফুটে থাকত ম্লান অ্যাস্ফোডেল ফুল আর ভিড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াত মৃতদের বিলীয়মান ছায়া।

এই সব সুন্দর রূপকথা লোকে শুনত আর চোখের দেখা বাস্তব জগতকে ভুলে যেত।

সমুদ্রে ঘুরে বেড়াত এই মানুষরা আর নিজেদের জগতের সীমানাকে বাড়িয়ে চলত। কিন্তু এই নতুন বিরাট জগতে তাদের দাঁড়াতে হলো নতুন এক আড়ালের বিরুদ্ধে—যেটা ছিল তাদের নিজেদেরই পুরনো মতামত ও ধ্যানধারণার অদৃশ্য ও জোরালো আড়াল।

পুরনো দেবতারা এই আড়ালকে টিকিয়ে রাখত ও রক্ষা করত।

এই আড়ালকে ভাঙতে পারত একমাত্র বিজ্ঞান।

৩। বিজ্ঞান কোথায় লালিত হয়েছিল?

বিজ্ঞানের শেষ কথা আমরা প্রায়ই শুনতে পাই, কিন্তু বিজ্ঞানের প্রথম কথাটি কোথায় উচ্চারিত হয়েছিল?

শুনলে অবাক হতে হবে, আমরা এই প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারি।

যদি আমরা ধরে নিই যে বিজ্ঞানের প্রথম কথা হচ্ছে প্রথম প্রকাশিত বিজ্ঞানের বই তাহলে স্থানকাল নির্দিষ্ট করা চলে। স্থান—এশিয়া মাইনরের গ্রীক নগর মাইলেটাস। কাল—খ্রীষ্টপূর্ব ৫৪৭ অব্দ। বইটির নাম

'প্রকৃতি বিষয়ে'। বইটি লিখেছিলেন আনাক্সিমান্দের নামে একজন গ্রীক পণ্ডিত।

তাই যদি হয় তাহলে ১৯৫৩ সালে আমাদের উচিত ছিল বিজ্ঞানের ২৫তম শতবার্ষিকী জয়ন্তী পালন করা। তবে যদি পুরোপুরি সঠিক হতে হয়, তাহলে কিন্তু ১৯৫৩ সালের আগেই এই জয়ন্তীর তারিখ পার হয়ে গিয়েছে। কেননা, খ্রীষ্টপূর্ব ৫৮৫ অব্দে মাইলেটাস থেকে সূর্যগ্রহণ দেখা গিয়েছিল। বেশ তো, সূর্যগ্রহণ তো নতুন কোনো ব্যাপার নয়, আগেও হয়ে গিয়েছে আর মানুষজনকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। এবারে মাইলেটাসের নাগরিকরা অবাক হয়েছিল শুধু সূর্যগ্রহণের জন্য নয়, এই ঘটনার জন্যও যে সূর্যগ্রহণের কথা আগে থেকেই বলা হয়েছিল। এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন মাইলেটাসের অপর একজন পণ্ডিত থালেস।

বিজ্ঞানের জন্ম অন্য কোনো নগরে না হয়ে মাইলেটাসে হলো কেন? শিশু বিজ্ঞানের জন্য আরও উপযুক্ত অন্য কোনো স্থান কি ছিল না? জন্ম হলো কিনা মাইলেটাসেই, যে নগরে সবসময়ে গোলমাল, সবসময়ে বণিকদের ব্যস্ততা, যেখানকার সমস্ত পথ—কি সমুদ্রের, কি ডাঙগার—চলে গিয়েছে বিশ্বের চতুর্দিকে? প্রতিদিন বন্দর থেকে পাড়ি দেয় মাইলেসীয় পশমের বস্ত্র ও অলঙ্কৃত পাত্র বোঝাই জাহাজ। কিছু কিছু যায় সিথীয়দের দূর দেশে, কিছু দক্ষিণে মিশরে, কিছু পশ্চিমে ইতালির সাইবারিস-এ। মাইলেটাস থেকে যাত্রিদলের পথ-পরিক্রমা শুরু হয়। তারা যায় ভারতবর্ষে, পারস্যে, বাবিলনে—আঙুর-ক্ষেত ও জলপাই-কুঞ্জ পেরিয়ে, ঘাসে ঢাকা মাঠ পেরিয়ে যেখানে শীর্ণ পা-ওয়ালা ভেড়াগুলো খুঁটে খুঁটে ঘাস খায়। মাইলেটাসের বন্দরে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গোলমাল ও ব্যস্ততা—জাহাজ আসছে ও যাচ্ছে, নতুন জাহাজে ঠক-ঠক হাতুড়ির ঘা মারছে জাহাজের মিস্ত্রীরা, জাহাজঘাটায় ভিড় করছে নাবিকরা আর যারা জাহাজে মাল তোলে ও জাহাজ থেকে মাল খালাস করে তারা।

বাজারের এলাকায় ক্রেতা ও বিক্রেতাদের ভিড়। ভারী ভারী বোঝা পিঠে নিয়ে গাধাগুলো আর্ত ডাক ছাড়ছে।

আর পুরোদ্যানে সাধারণের জড়ো হবার দিনগুলিতে যখন দু-দলের মধ্যে জেতার লড়াই শুরু হয়ে যায়—একদিকে ধনী বণিক মহাজন ও দাস-মালিক, অন্যদিকে মজুর কারিগর ও জাহাজের মুটে—তখন সে কী সোরগোল! কখনো কখনো লড়াইটা জবর রকমের হয়ে ওঠে আর খোশবু-লাগানো চুল-চুমড়ানো ফুলবাবুরা একটু বেকায়দায় পড়ে, বেমক্কা লড়াইয়ের মধ্যে তাদের চমৎকার বেগুনী পিরান ও সযত্নে পাট করা চুলের বাহার এলোমেলো হয়ে যায়।

বিজ্ঞানের প্রথম বছরগুলির ঘুমপাড়ানী গান ছিল এই হাঙগামা, এই গোলমাল, এই হুটোপাটি বা চেঁচামেচি। শিশুটির পক্ষে নিশ্চয়ই আরো অনেক ভালো হতো যদি লালনাগারটি থাকত মিশর বা বাবিলনের কোনো শান্ত নির্জন মন্দিরের মধ্যে। বাবিলনে প্রত্যেকটি মন্দির দেখে মনে হতে পারত, এই হচ্ছে পর্যবেক্ষণ ও অনুধ্যানের উপযুক্ত স্থান। এমনকি তার চেহারাই ছিল এমন যে বিশ্বের কথা এবং গ্রহ ও তারার কথা মনে পড়িয়ে দিত। একটির ওপরে আরেকটি, এমনিভাবে তৈরি করা সাতটি

গম্বুজ ছিল আকাশ-মুখী বিশাল এক সোপানের সাতটি ধাপের মতো—সাতটি ধাপ যেন আকাশের সাতটি 'গ্রহ'। ফটকের কাছে থাকত মার্বেলের চৌবাচ্চা ভর্তি জল। তা দিয়ে বোঝানো হতো সেই জলময় পরিখা যা থেকে জগৎ উঠে এসেছে—বাবিলনের ধর্ম বিশ্বাসে তাই মনে করা হতো। সারি সারি থাম ও উঁচু উঁচু দেয়ালের পিছনে ছিল গবেষণাগার, বিদ্যালয়, গ্রন্হাগার ও দপ্তরখানা।

সেখানে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কুশলী লিপিকররা শুকানো কাদা-মাটির ফলকে কীলকাকার চিহ্ন এঁকে চলত। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, এই সমস্ত ফলকের স্তূপ গ্রন্হাগারে ও দপ্তরখানায় ক্রমেই আরো উঁচু হয়ে উঠেছিল। তাতে লেখা থাকত হাজার হাজার বছর ধরে আহরিত জ্ঞানের কথা। একটি ফলকের লেখা এই বলে শুরু : 'এনুমা এলিশ' তার মানে, 'যখন উপরে'। তাতে বলা হয়েছে 'উপরের স্বর্গ ও নিচের পৃথিবী নামাঙ্কিত হবার আগে' অবস্হা কেমন ছিল। তারপরে বলা হয়েছে জগতের সৃষ্টির কাহিনী।

অপর একটি কাদামাটির ফলকে বলা হয়েছে রাশিচক্রের তারামণ্ডলীর কথা, যাদের মধ্যে দিয়ে সূর্য পরিক্রমা করে। বলা হয়েছে কেমনভাবে বছরের দিন ও মাস গণনা করতে হয়। বলা হয়েছে বৃহৎ গ্রহগুলির কথা, আসন্ন গ্রহণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার কথা, গ্রহ ও তারা থেকে চন্দ্রের দূরত্বের কথা। গণিত বিষয়ক ফলকও ছিল। তাতে বলা হয়েছে গুণ ও ভাগ করার কথা, ভগ্নাংশের কথা, সংখ্যার বর্গমূল করার কথা।

ছিল দেশের, পর্বতের ও নদীর তালিকা। ছিল অভিধান, সংকলন ও ব্যাকরণ। ছিল ভেষজ সম্পর্কে আকর-গ্রন্হ ও প্রথম মানচিত্র। এই মানচিত্রে পৃথিবীর আকার একটি বৃত্তের মতো, নদী ও সাগর দিয়ে চারভাগে ভাগ করা ও মহাসাগর দিয়ে ঘেরা।

তাহলে, এটা কি বিজ্ঞান নয়?

এখনো পর্যন্ত বছরকে আমরা ভাগ করি বারোটি মাসে, রাশিচক্রের বারোটি তারামণ্ডল অনুসারে। এখনো পর্যন্ত সপ্তাহ হয় সাত দিনে—কারণ, বাবিলনীয়রা আকাশের সাতটি বস্তু চিনত আর তাদের তারা বলত 'গ্রহ' বা 'পর্যটক'। এই সাতটি 'গ্রহের' যে-নাম তারা দিয়েছিল সেই নাম থেকেই সপ্তাহের দিনগুলির নাম। সোমবার নাম হয়েছে সোম বা চন্দ্র থেকে। মঙ্গলবার মঙ্গলগ্রহ থেকে। বুধবার বুধগ্রহ থেকে। বৃহস্পতিবার বৃহস্পতিগ্রহ থেকে। শুক্রবার শুক্রগ্রহ থেকে। শনিবার শনিগ্রহ থেকে। রবিবার রবি বা সূর্য থেকে।

ঘড়ির দিকে যখন তাকাই, দেখতে পাই চিহ্ন ও দাগ দিয়ে সেটিকে বারো ঘন্টায় ভাগ করা হয়েছে, প্রতি ঘন্টাকে ষাট মিনিটে, প্রতি মিনিটকে ষাট সেকেণ্ডে। বাবিলনীয়রা ঠিক তাই করেছিল। বৃত্তকে আমরা ভাগ করি ৩৬০ ডিগ্রীতে—বাবিলনীয়রা তাই করেছিল।

তাহলে কেন বলব না যে বিজ্ঞানের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল বাবিলনে? এমনকি প্রাচীনরাও বাবিলনকে বলত 'জগতের প্রবেশ-দ্বার'।

তাহলে, বিজ্ঞানের শুরু প্রকৃতপক্ষে কোথায়—বাবিলনে, না মাইলেটাসে? বাবিলনীয়রা নিজেরাই এই প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য এগিয়ে আসুক।

আরো একবার তাদের কাদামাটির ফলকগুলো হাতে নেওয়া যাক, খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখা যাক।

এই কীলকাকার চিহ্নগুলি আমাদের অক্ষরের মতো নয়। কাদামাটির এই ফলকগুলি আমাদের বইয়ের মতো একেবারেই নয়। এমনকি যখন ফলকগুলির পাঠোদ্ধার করতে শিখি তখনো তার অর্থ ধারণায় আনতে পারি না। অর্থাৎ, এই যে মানুষগুলি হাজার হাজার বছর আগে বাস করত তারা চিন্তা করত আমরা যেমনভাবে করি তেমনভাবে নয়। আমাদের অনুবাদ করতে হয় শুধু এক ভাষা থেকে অপর এক ভাষায় নয়, চিন্তা করার এক ধরন থেকে অপর এক ধরনেও।

'এনুমা এলিশ।' 'যখন উপরের আকাশের নাম হয়নি, নিচের পৃথিবীরও নয়, আপ্সু, যিনি আদি যিনি স্রষ্টা এবং তিয়ামাত, যিনি সকলকে বহন করেছেন, তাঁদের জল মিশ্রিত করলেন। মন্দির নির্মিত হয়নি, জলাভূমি দৃশ্যমান নয়, তখনো পর্যন্ত কোনো দেবতার আবির্ভাব ঘটেনি, কোনো নাম প্রাপ্ত হয়নি, নির্দিষ্ট ভবিতব্য বলে কোনো কিছু নেই। তারপরে দেবতারা সৃষ্ট হলো...

ফলকে তারপরে বলা হয়েছে, দেবতা আপ্সু ও তাঁর পত্নী তিয়ামাত কি-ভাবে নিজের সন্তানদের সংগে লড়াই করেছিলেন। দেবতা এয়া আপ্সুকে হত্যা করেন এবং দেবতা মারদুক তিয়ামাতকে একটা খোসার মতো ছিঁড়ে দু-টুকরো করে ফেলেন, এক অর্ধেককে করে তোলেন আকাশ, অন্য অর্ধেককে পৃথিবী।

এই কি বিজ্ঞান?

না, নয়। যে-সব মানুষ এমনভাবে লিখেছে তারা তখনো পর্যন্ত আমরা যেমনভাবে চিন্তা করি তেমনভাবে চিন্তা করতে শেখেনি। তারা ভাবেনি মহান শূন্যতা বা বিশৃংখলার কথা, যা থেকে সবকিছুর সৃষ্টি। তারা এর নাম দিয়েছিল দেবী মাতা তিয়ামাত। নিজেদের তারা এই প্রশ্ন করেনি : কেমন করে ও কিসের থেকে সবকিছু অস্তিত্ব লাভ করল। প্রশ্নটা ভিন্নভাবে উপস্থিত করেছিল : কার থেকে সবকিছু এসেছে? কোন্ জনক থেকে এবং কোন্ জননী থেকে? হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ সবসময়ে ভেবে এসেছে, জনক-জননী থেকে সন্তানদের মাধ্যমে যে বংশধারা চলে আসে, সরাসরি তা থেকেই প্রত্যেকে উদ্ভূত হয়। এবং বহুকাল পর্যন্ত তাদের মধ্যে এই চিন্তা বজায় ছিল যে জনক-জননীর সঙ্গে সন্তানদের যে সম্পর্ক, জন্মসূত্রে তেমনি সম্পর্ক বস্তুর সংগে বস্তুর।

এমনকি আজকের দিনেও আমরা কি কখনো কখনো 'জননী বসুন্ধরার' কথা বলি না?

বাবিলনীয়রাও জানত কি-ভাবে গ্রহণের সঠিক সময় হিসেব করতে হয়। তবুও তারা গ্রহণকে মনে করে চলত দেবতাদের কাছ থেকে আসা পূর্বলক্ষণ, বিপর্যয় সম্পর্কে তাদের সতর্ক করার জন্য—প্রাকৃতিক কোনো ব্যাপার নয়।

তাদের মধ্যে বহুকাল এই বিশ্বাস অটুট ছিল। তাদের দপ্তরখানা ও গ্রন্থাগারগুলো ভর্তি ছিল পঞ্জী ও তালিকা সমন্বিত কাদামাটির ফলকে। তাতে তথ্য থাকত প্রচুর, কিন্তু বিজ্ঞান নয়। যাদু ও কুহক মন্ত্রে ভরা থাকত এই সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থ। চক-খড়ি মেশানো আলকাতরা মুখে দেবার আগে

লম্বা একটি মন্ত্র পড়তে হতো। মন্ত্রে বলা হতো ঈশ্বর কেমনভাবে আকাশ সৃষ্টি করেছেন, আকাশ সৃষ্টি করেছে পৃথিবী, পৃথিবী সৃষ্টি করেছে নদী, নদী সৃষ্টি করেছে নালা, নালা সৃষ্টি করেছে পোকা, এই পোকা দাঁতে ঢুকে গিয়েছে। মন্ত্রের শেষে পোকাকে উদ্দেশ করে বলা হতো, 'ঈশ্বর তাঁর পরাক্রান্ত হাত দিয়ে তোমাকে ধ্বংস করুক।'

বিজ্ঞান সৃষ্টি করার আগে মানুষকে নতুনভাবে চিন্তা করার শিক্ষা নিতে হতো। কিন্তু হাজার বছরের প্রাচীন মন্দিরের গম্বুজের নিচে কখনো নতুন সাহসী চিন্তা মানুষের কাছে ধরা দেয় না।

বিজ্ঞানের লালনাগারের খোঁজে বেরিয়ে আমরা হয়তো আরো কোনো একটা পথ ধরতে পারতাম। কিন্তু সে-পথ পুবের দিকে বা বাবিলনের দিকে নয়, কিংবা দক্ষিণের দিকে বা মিশরের দিকে নয়। সে-পথ বরং পশ্চিমের দিকে, গ্রীসের দিকে। এটি হচ্ছে সেই স্থান যেখান থেকে মাইলেটাসের মানুষ এসেছে।

তাদের আদি দেশ থেকে বা গ্রীসভূমি থেকে কী নিয়ে এসেছিল তারা? ভাষা, বিশ্বাস ও রীতিনীতি।

মাইলেটাস ও গ্রীস উভয় স্থানেই মানুষ বিশ্বাস করত একই দেবতায়, গাইত একই গান। উপকথা থেকে জানা যায়, এই গানগুলি সবই প্রাচীন কবি হোমারের রচনা। হোমারের গানে ধর্ম বিজ্ঞান ও কাব্য সবই মিলেমিশে একাকার হয়ে রয়েছে। সেগুলি তখনো পর্যন্ত মানুষের চিন্তায় তিনটি পৃথক শাখা হয়ে ওঠেনি।

'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি'তে হোমার কর্মের সঙ্গে যুক্ত করেছেন ধর্ম। যখন তিনি অস্ত্র তৈরির কামারশালের গান গাইছেন এবং আকিলেসের জন্য বর্ম পেটাই করছে যে পরাক্রান্ত কামার তার বর্ণনা দিচ্ছেন, তখন কিন্তু সেই কামার আর সাধারণ একজন মরণশীল মানুষ থাকছে না, হয়ে উঠছে দেবতা হেফায়েস্টাস। সে-সময়ের নৌবিদ্যা-সম্বন্ধীয় সমস্ত বিজ্ঞান 'ওডিসি'তে পাওয়া যেতে পারে। হোমার এত নিখুঁতভাবে ঝড়ের বর্ণনা দিয়েছেন যে আজকের দিনে তা থেকে আমরা একটা আবহ-মানচিত্র খাড়া করতে পারি এবং ওডিসিয়ুসের জাহাজ তোলপাড় করেছিল যে ঘূর্ণিঝড় ও বাতাস তার হদিস নিতে পারি। তবুও হোমার কিন্তু ঝড়বাতাসকে ঝড়বাতাস হিসেবে উপস্থিত করেননি, করেছেন দেবতা হিসেবে।

দেবতাদের গান গেয়েছেন হেসয়েডও। কিন্তু তিনি ছিলেন ভিন্ন ধরনের কবি। বাস করতেন গ্রীসের অন্তর্ভুক্ত বোয়েসিয়া পর্বতে আস্ক্রা নামে একটি ছোট গ্রামে। গান গাইতেন রাজা ও অভিজাতদের ভোজসভায় নয়, গ্রামের সমাবেশে। উপকথায় বলা হয়েছে, হেসয়েডের দেশ হচ্ছে মিউজদের জন্মস্থান। তারা বাস করত তাঁর গ্রামের ওপরে মাউন্ট হেলিকোনের ঢালুতে।

শীতের দিনে যখন কিছু করার থাকত না তখন আস্ক্রার মানুষরা এসে জড়ো হতো পর্বতের রোদ-ঝলমলে ঢালুতে। আর হেসয়েড বীণা বাজাতেন না, হাতে নিতেন গাঁটওলা একটা লম্বা লাঠি। সেই লাঠি দিয়ে মাটিতে তাল ঠুকতে ঠুকতে গাইতেন নিজের জানা সমস্ত বিষয়ে তাঁর গান। বলতেন, কৃত্তিকা যখন দিগন্তের ওপরে উঠে আসে, সেই হচ্ছে শস্য মাড়াই

করার সময়। আর কৃত্তিকা যখন অদৃশ্য হয়ে যেতে শুরু করে, সেই হচ্ছে লাঙল দেবার সময়। গ্রামের লোকদের বলে দিতেন মাল-বোঝাই জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে পাড়ি দেবার সবচেয়ে ভালো সময় কোনটা। তাদের উপদেশ দিতেন, তীরে লাগানো জাহাজকে ঢেউ এসে যাতে ভাসিয়ে নিতে না পারে সেজন্য তারা যেন জাহাজের ধার বরাবর ভারী পাথর রাখে। আর দাঁড়-গুলোকে যেন আগুনের ওপরে ঝুলিয়ে রাখে যাতে সেগুলো আরো ভালোভাবে শুকোয়। তারপরেই তাড়াতাড়ি সুর পালটে শুরু করে দিতেন দেবতাদের বিষয়ে কাহিনী। বলতেন, কেমনভাবে বিশৃঙ্খলা থেকে জন্ম নিয়েছিল আলো ও অন্ধকার, পৃথিবী ও আকাশ। আর কেমনভাবে পৃথিবী ও আকাশের বিবাহ থেকে জন্ম নিয়েছিল দৈত্যরা, টাইটানরা ও সাইক্লোপরা। তিনি গাইতেন প্রকৃতির শক্তির গান, কিন্তু তাঁর গানে প্রকৃতির উপাদানগুলো লাভ করত দেবতাদের লক্ষণ।

হেসয়েডের দেবতারা ও টাইটানরা হোমারের মতো ততোটা মানবিক ছিল না। সবচেয়ে বড়ো কথা, তাদের তখনো ছিল স্বকীয় নাম—যেমন, পৃথিবী, আলো, দিবস, উত্তর বায়ু, বৃদ্ধ বয়স, পরিচর্যা, প্রবঞ্চনা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা কিন্তু প্রাণবান জীব নয়, তারা অনেকটা যেন ধারণা বা প্রাকৃতিক শক্তি। হেসয়েডের সমস্ত দেবতা একই রকমের। প্রত্যেক দেবীকে তিনি বলেছেন 'মনোহর পদ বিশিষ্ট'। বোঝা যাচ্ছে, তাদের আলাদা করে দেখাতে তিনি বড়ো একটা পারেননি—এতই আবছায়া ছিল তাঁর দেব ও দেবীরা। হোমারে কিন্তু এই দেব ও দেবীদের পূর্ণ ব্যক্তিগত জীবন পাওয়া যায়। আর দেবতাদের মূর্তি যতোই বেশি বেশি আবছায়া হতে লাগল ততোই বেশি বেশি স্পষ্টভাবে প্রকৃতিকে দেখতে শুরু করল মানুষ।

মানুষ নতুন ভাবনায় ভাবিত হতে শিক্ষা পাচ্ছিল। আর যদিও দূর বোয়েশিয়ার কোনো এক গ্রামে একজন কৃষক তখনো বিভোর হয়ে হেসয়েডের গান গাইছিল, ব্যবসাবাণিজ্যের ব্যস্তসমস্ত বন্দরে গাওয়া হচ্ছিল সাহসী কথা দিয়ে রচিত নতুন নতুন গান।

৪। প্রথম কথা শুরু করে কী বলেছিল বিজ্ঞান

অতএব আমরা মাইলেটাসে ফিরে যাই—মাইলেটাসের কোলাহল মুখর আর জনাকীর্ণ চৌমাথায়।

এই সমস্ত মানুষের জটলার মধ্যে যখন যাই তখন শুনতে পাই তারা নানা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলছে। ভিন্ন ভিন্ন তাদের আচার-আচরণ, তাদের ধর্ম। চারদিকের গোলমাল ও কলরবের মধ্যে শোনা যায় বাঁশির সুর—ফিনিসীয় নাবিকরা তাদের দেবতা মেলকার্ট-এর পুজো করছে। বাঁশির সুরে তারা নাচে, লাফিয়ে বেড়ায়, সটান শুয়ে পড়ে মাটির ওপরে। তাদের ঠিক পাশটিতেই রয়েছে গ্রীকরা, যারা এসেছে ঈজিয়ান সাগরের দূর-দূর দ্বীপ থেকে। তারা তাদের জাহাজগুলোকে তীরের ওপরে টেনে এনেছে, সমুদ্রের দেবতা পোসেইডনের উদ্দেশে প্রজ্বলিত আহুতি দেবার জন্য আগুন জ্বালিয়েছে।

প্রাচীন কালে মানুষ সারাটা জীবন কাটাত তার বাপ-মা যেখানে বাস করে গিয়েছে একেবারে সেই জায়গাটিতেই। পূর্বপুরুষদের সমস্ত বিশ্বাস তারা একান্তভাবে আঁকড়ে থাকত। কিন্তু যে নাকি সারা দুনিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে তার কি দেখতে ও শুনতে কিছু বাকি থাকে? শুনতে হয় দেবতা-দের সম্পর্কে কত রকমের কাহিনী—ইথিওপিয়ায় দেবতাদের চামড়া ঘোরবর্ণ, আর থ্রেস-এ দেবতাদের মাথা লাল ও চোখ নীল। এমনি অবস্থায় কী করে ভাবা চলে যে একমাত্র গ্রীকরাই ঠিক, থ্রেসীয় ও ইথিওপীয়রা ভুল?

মাইলেটাসের অধিবাসীরা ছিল কারিগর, বণিক ও নাবিক। অনেক আগে থেকেই তারা দেবতাদের ও বীরদের কাহিনী অবিশ্বাস করতে শুরু করেছিল। প্রাচীন চারণরা যে-সব উপাখ্যান গাইত সেগুলো বিশ্বাস করতে হলে ধরে নিতে হয় যে অভিজাতরা হচ্ছে দেবতাদের সরাসরি বংশধর। তাই যদি হবে তাহলে মাইলেসীয় বণিক তাঁতী নাবিক ও খালাসীদের সঙ্গে যখন লড়াই বেধে গিয়েছিল তখন দেবতারা কেন অভিজাতদের উদ্ধার করতে এল না?

হেকাটিয়াস নামে মাইলেটাসের এক অধিবাসী সারা দেশে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, পর্বতে উঠেছিলেন, গুহার ভিতরে ঢুকেছিলেন। তরুণ বয়সে তিনি শুনেছিলেন যে পরলোকে যাবার ফটক আছে দুটি—একটি লিউকাডিয়ার চুড়োর উত্তরে, অপরটি টেনারাম অন্তরীপের দক্ষিণে। তিনি তখন একটা মশাল হাতে নিয়ে টেনারাম অন্তরীপের গুহায় অনুসন্ধান চালালেন। তিনি শুনেছিলেন, পরলোকের ফটকে পাহারা দেয় সেরবেরাস—সাপের লেজবিশিষ্ট তিনমাথাওলা একটা কুকুর। কথাটা তাঁর বিশ্বাস হয়নি। তাই গুহার মধ্যে ঢুকে আঁতিপাতি করে খুঁজলেন। তাঁর মশালের আলোয় দূর হয়ে গেল পুরনো এক কুসংস্কার।

ফিরে এসে সঙ্গীসাথীদের জানালেন যে গুহার ভিতরে সাপ ও বাদুড় ছাড়া আর কিছুই তাঁর চোখে পড়েনি। বললেন, মানুষ হয়তো এই সমস্ত সাপ দেখে ভয় পেয়ে যেত আর তাই সাপের লেজবিশিষ্ট দানবের কথা বানিয়ে বলেছিল।

এমনিভাবে মানুষ প্রাচীন কাহিনীকে ধ্বংস করেছিল সন্দেহ দিয়ে, তরবারি দিয়ে নয়। 'গ্রীকরা কত কিছু বিশ্বাস করে, কিন্তু আমার কাছে সেগুলো সবই উদ্ভট মনে হয়।' সাহসী এই কথাগুলো দিয়ে হেকাটিয়াস তাঁর বই শুরু করেছিলেন। তবে তিনি একা ছিলেন না। এমনকি তাঁর জন্মেরও আগে মাইলেটাসে এমন মানুষ ছিলেন যাঁদের সাহস ছিল দেখার এবং নতুনভাবে চিন্তা করার।

তাঁরাই প্রথম জ্ঞানী মানুষ—থালেস ও আনাক্সিমানদের।

কী শিক্ষা দিয়েছিলেন তাঁরা? এ-প্রশ্নের জবাব খুব সহজেই দেওয়া যায় যদি আমরা তাঁদের লেখা বইগুলোর সাহায্য নিই এবং আগাগোড়া সেগুলো পড়ি। কিন্তু মুশকিল এই যে এই সমস্ত বইয়ের অতি অল্প কয়েকটা টুকরো ও বাক্যমাত্র আমাদের হাতে এসেছে।

সমস্ত প্রাচীন বিজ্ঞানের এই ভবিতব্য। ওই সব প্রাচীন বইয়ের কিছু যদি থেকে গিয়ে থাকে তা খুঁজে পাওয়া কোনো পড়ুয়ার পক্ষে বড়ো একটা সম্ভব নয়। টুকরোগুলো আছে অতি খারাপ সংসর্গে—তারা যে টিকে

আছে সেজন্য তাদের উচ্চমূল্য দিতে হয়, কেননা তাদের উদ্ধৃত করা হয় কেবল তাদের ওপরে আক্রমণ চালাবার জন্য। অতএব দেখা যাচ্ছে, একজন মানুষের সারা জীবনের কর্মের মধ্যে থেকে যায় অল্প কয়েকটা পৃষ্ঠা মাত্র। প্রাচীন বৈজ্ঞানিক বইয়ের এই টুকরোগুলো অনেকটা যেন ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ির ভাঙা টুকরোর মতো। এই টুকরোগুলোকে জোড়া লাগিয়ে কিছু একটা দাঁড় করানো খুবই শক্ত। অনেক কিছুই চিরকালের মতো হারিয়ে গিয়েছে। তা নিয়ে আমরা এখন অনুমান করতে পারি মাত্র।

বইগুলো লেখা হতো গোল করে পাকানো প্যাপিরাসের ওপরে। এই প্যাপিরাস যথেষ্ট টেকসই জিনিস নয়, আর আড়াই-হাজার বছর সময়টাও যথেষ্ট দীর্ঘ। তা সত্ত্বেও প্যাপিরাসের ওপরে লেখা এই বইগুলো টিকিয়ে রাখা যেত। আরো অনেক পুরনো কালে লেখা এমনি ধরনের মিশরীয় বই আমাদের হাতে আছে।

ধ্বংসকার্য সাধনে কে সাহায্য করেছিল সময়কে? মানুষের হাত। কারণ এই সমস্ত বই ছিল পুরনো বিশ্বাস ও ধর্মের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জে পরিপূর্ণ, আর প্রাচীন কখনো বিনা লড়াইয়ে নবীনের কাছে হার স্বীকার করে না। কাজেই এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটেছিল যে পুরনো বিশ্বাসের ধ্বজাধারীরা তাদের আক্রমণকারী বইগুলো পুড়িয়ে ফেলেছিল।

থালেস সম্পর্কে আমরা যা-কিছু জানি সবই অল্প কয়েকটি পৃষ্ঠা থেকে পাওয়া। আমরা পড়ি যে তাঁর নাম ছিল থালেস। আরো পড়ি, জন্মসূত্রে স্পষ্টতই তিনি ফিনিসীয় এবং প্রাচীনরা তাঁকে 'সাতজন জ্ঞানী ব্যক্তির' অন্যতম মনে করত!

থালেসের কণ্ঠস্বর আমরা আদৌ শুনতে পাই না, কিন্তু স্পষ্ট শুনতে পাই তাঁর নিন্দাকারীদের কণ্ঠস্বর। তারা অনেক সব কাহিনী বলেছে। যেমন, একটি কাহিনী এই রকম যে তিনি তারা দেখার জন্য সবসময় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন আর নিজের ঠিক সামনে একটি কুয়োর মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। আসল কথাটা এই, বৈজ্ঞানিক শিক্ষালাভের একেবারে গোড়া থেকেই অন্যমনস্ক অধ্যাপকদের সম্পর্কে এ-ধরনের গল্প চিরকাল বলা হয়ে এসেছে।

প্রাচীন কালে ধারণা ছিল কাজ করাটা দাস কারিগর ও কৃষকদের ব্যাপার, আর ব্যবসা করাটা বণিকদের ব্যাপার। বিজ্ঞানীদের কথা যদি বলতে হয়, তাঁদের মনে করা হতো এই জগতের বাইরের মানুষ। এই কারণেই থালেস, ডিমোক্রিটাস, আর্কিমিডিস ও অন্যান্য বিজ্ঞানীকে সবসময়েই অন্যমনস্ক ও নিস্পৃহ দেখানো হতো।

কিন্তু থালেস মস্ত বিজ্ঞানী ছিলেন বিশেষ করে এই কারণে যে তিনি নিজের চারপাশের জগতকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। পৃথিবীতে কী ঘটছে তা যেমন দেখতে পেতেন তেমনি দেখতে পেতেন তারার জগতে কী ঘটছে। তিনি ছিলেন একাধারে বণিক নাবিক ও ইঞ্জিনিয়ার। সমুদ্রপথে মিশর গিয়েছিলেন লবণ আনবার জন্য। পুল নির্মাণ করেছিলেন ও খাল খনন করেছিলেন। ব্যবসার ক্ষেত্রে কতখানি যে বুদ্ধিমান ছিলেন তাই নিয়ে মজার

গল্প আছে। এক বছর আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন জলপাইয়ের ফলন খুব ভালো হতে চলেছে। তখন করলেন কি, সমস্ত জলপাই কিনে নিলেন— আধুনিক ভাষায়, 'সমস্ত জলপাই কব্জা করে নিলেন'। বলা বাহুল্য, তাঁর অনুমান সঠিক ছিল এবং সে-বছর মোটা পয়সা কামিয়ে নিতে পেরেছিলেন। এ থেকে প্রমাণ হয়, দার্শনিক যদি চান তাহলে পয়সাও আয় করতে পারেন। তবে দার্শনিক মনে করতেন, পয়সা আয় করবার কোনো সার্থকতা নেই।

তাহলে দেখা যাক, থালেস এমন কী আবিষ্কার করেছিলেন যা নতুন ছিল? কেন আমরা বলি থালেস হচ্ছেন প্রথম বিজ্ঞানী?

তাঁর সম্পর্কে যা কিছু জানা যায় সমস্ত একত্রিত করা যাক। যেমন, তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, ৩৬৫ দিনে বছরের মাপ তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। আসলে, বছরের এই মাপ মিশরে আগে থেকেই জানা ছিল, তিনি সেখানে গিয়ে সেটা জেনেছিলেন। তিনি ওয়াগন বা লিটল ডিপার তারামণ্ডলটি নির্দেশ করেছিলেন। কিন্তু ফিনিসীয় নাবিকরা এই তারামণ্ডলটির কথা জানত এবং জাহাজ চালাবার সময়ে এটি দেখে দিক ঠিক করত। তিনি হিসেব করেছিলেন, সূর্যের একটি ব্যাস আকাশের বৃত্তের সাতশো কুড়ি ভাগের এক ভাগ। কিন্তু এই হিসেবও বাবিলনীয় পুরোহিতদের জানা ছিল। সেখান থেকে সহজেই মাইলেটাসে পৌঁছে গিয়েছে, কেননা মাইলেটাসের অবস্থান ছিল যোগাযোগের এমন এক কেন্দ্রে যেখানে দুনিয়ার সমস্ত খবর শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যেত।

থালেস ছিলেন প্রথম গ্রীক যিনি জ্যামিতি অধ্যয়ন করেছিলেন। পিরামিডের ছায়া কতখানি লম্বা হয়ে পড়ছে সেই মাপ থেকে তিনি পিরামিডের উচ্চতা নির্ধারণ করেছিলেন। কিন্তু জ্যামিতি অধ্যয়ন করেছিল মিশরীয়রাও। থালেস তাদের কাছ থেকে জ্যামিতি শিখতে পারতেন।

তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন এই জগৎ একটা গোল সমতল কাঠের ভেলার মতো জলের ওপরে ভাসছে। এই ভেলায় পাশ থেকে দুলুনি হলে ভূমিকম্প হয়। কিন্তু এই একই কথা তিনি বলার আগেই বাবিলনীয়রা বলেছিল।

তিনি ভাবতেন, সবকিছু এসেছে জল থেকে। কিন্তু বাবিলনীয় পুরোহিতরাও বলতেন, জগৎ এসেছে জননী তিয়ামাত থেকে—জননী তিয়ামাত হচ্ছে জলময় এক উপসাগর। মিশরীয়রাও বলত সবকিছুর শুরু বুড়ো নান্ বা জল থেকে।

তাহলে নতুন কী করেছিলেন থালেস?

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মিশরে, বাবিলনে ও ফিনিসিয়ায় যতো জ্ঞান ও বিদ্যা সংগৃহীত হয়েছিল সবই তিনি সংগ্রহ করেছিলেন ও নিজের দেশে ফিরিয়ে এনেছিলেন। কাজটি ভালোই করেছিলেন, কিন্তু যদি শুধু এইটুকুই করতেন তাহলে আমরা তাঁকে প্রথম দার্শনিক বলতাম না। তিনি যে শুধু বিদ্যা সংগ্রহ করেছিলেন তাই নয়, নতুন নতুন জিনিসেরও সন্ধান পেয়েছিলেন। জিনিসকে নতুনভাবে দেখতে পারতেন তিনি। আর এটাই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড়ো কাজ। বাবিলনীয় পুরোহিতরা যেখানে দেখত বিরাট জলময় উপসাগরের দেবী তিয়ামাত, থালেস দেখেছিলেন, একটি মৌলিক উপাদান—জল।

যেখানে তারা দেখত অতল গহ্বরের দেবতা আপ্‌সু, থালেস উপস্থিত করেছিলেন মহাশূন্যের ধারণা।

মিশরীয়রা যখন আকাশ ও পৃথিবীর ছবি আঁকত, তারা আসলে আঁকত দেবতাদের ছবি। তাদের ছবিতে নিচে থাকত পৃথিবী, তার ওপরে বায়ুর দেবতা, তার মাথার ওপরে তার দু-হাতের ওপরে ভর দিয়ে স্বর্গের দেবতা। বায়ুর দেবতার গা বরাবর ঝিকমিক করত তারা আর ভেসে বেড়াত চাঁদ ও সূর্য। থালেস ছিলেন মিশরীয় পুরোহিতদের শিষ্য, কিন্তু এই সমস্তই তিনি নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। সূর্যকে তিনি আদৌ দেবতা মনে করতেন না। বলেছিলেন, যে উপকরণে পৃথিবী গঠিত সেই উপকরণেই সূর্য গঠিত—এবং চাঁদও। বলেছিলেন, চাঁদ যদি সিধে রেখায় সূর্যকে পার হয় তাহলে সূর্যগ্রহণ হয়ে থাকে। গোড়ায় মনে হতে পারে, এটা আর এমন কী বড়ো পরিবর্তন—'কে' শব্দের বদলে বসানো হচ্ছে 'কী' শব্দটি, এবং যেখানে জিজ্ঞেস করা হতো 'কে ঘটিয়েছে পৃথিবীর উদ্ভব?' সেখানে প্রশ্নটা ভিন্নভাবে করা হচ্ছে—'কী থেকে পৃথিবী এসেছে?'

সংশোধন সামান্য, কিন্তু এই হচ্ছে বিজ্ঞানের শুরু।

থালেস বলেছিলেন, সবকিছুর শুরুতে রয়েছে জল, পৃথিবী এসেছে জল থেকে আর জলের ওপরে একটা নৌকোর মতো পৃথিবী ভাসছে।

কথাটা আমাদের কাছে অদ্ভুত মনে হয়। কিন্তু যদি আমরা তুলনা করে দেখি আরও আগে মানুষ কী বলত তাহলে বুঝতে পারি, থালেস যে-ভাবে জিনিসকে দেখতেন সেটা আমাদের দেখার চেয়ে খুব বেশি ভিন্ন ছিল না।

থালেস বলেছিলেন, জল হচ্ছে সেই মৌলিক পদার্থ যা থেকে সবকিছুর উদ্ভব এবং যাতে সবকিছুর প্রত্যাবর্তন। শূন্য থেকে জিনিসের উদ্ভব হতে পারে না আর বস্তু ধ্বংস হয় না।

অবাক হয়ে আমরা দেখি, বিজ্ঞানের প্রথম উক্তি আর বিজ্ঞানের শেষতম উক্তি অভিন্ন—কেননা, এই হচ্ছে বস্তু ও শক্তির অভিন্নতার সূত্র। আমরা এখনো এই ধারণা পোষণ করি যে বস্তুর উদ্ভব শূন্য থেকে হয় না এবং বস্তু ধ্বংস হয় না।

মিশর ও বাবিলনিয়ার মন্দিরগুলোতে যে দেবতাদের স্থান হয়েছিল তারা ছিল নিশ্চল ও অলস। কিন্তু যোগাযোগের এই কেন্দ্রে, যেখানে সমস্ত ভাষা ও বিশ্বাস ও রীতিনীতির মিলন ও মিশ্রণ ঘটেছিল, সেখানেই অবশেষে আমরা খুঁজে পাই বিজ্ঞানের লালনাগার।

থালেসের শিক্ষা পুরনো বিশ্বাসের মূলে আঘাত করেছিল, যে পুরনো বিশ্বাসে স্মরণাতীত কাল থেকে মঞ্জুর ছিল অভিজাতদের শাসন। তিনি ছিলেন নতুন মানুষদের একজন—বণিক ও সমুদ্রচারীরা, যাদের জন্ম মানুষ থেকে নয়, অথচ যাদের আছে বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত দাস ও অর্থ। নতুন এই মানুষরা যুক্তি দেখাল, সাধারণ নাবিকদের বংশধররা যতোখানি দেবত্ব-সম্পন্ন, অভিজাতদের বংশধররা তার চেয়ে বেশি নয়। জগতের উদ্‌গম দেবতাদের থেকে নয়, বরং সবকিছু উদ্ভূত হয়েছে একই বস্তু থেকে। একই রাষ্ট্রের নাগরিকরা সবাই সমান, যেমন সমুদ্রের সমস্ত জলের ফোঁটা।

৫। দেয়ালগুলি আরো দূরে ঠেলে দেয় বিজ্ঞান

বিজ্ঞানের উন্নতি হবার পরে দেখা গেল পুরনো জগতের মধ্যে বিজ্ঞান কোণঠাসা হয়ে আছে। এই ছোট জগতে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে, পুরনো দেয়াল তাকে চেপে ধরেছে। তাই, এই সমস্ত দেয়াল চূর্ণ করাটাই হলো বিজ্ঞানের কাজ।

বহু বছর ধরে মানুষ ভেবে এসেছিল যে আকাশ একটা ওলটানো বাটির মতো পৃথিবীকে ঢেকে আছে। এখন তারা দেখতে শুরু করল যে মাউন্ট অলিম্পাসের চূড়োর ওপরে স্বর্গ স্থাপিত নয়, পৃথিবী ও আকাশের কিনারা দিগন্তের কাছে মিলিত হয়নি, মানুষের পায়ের নিচে হাডিজের পাতাল রাজ্যের কোনো স্থান নেই।

আকাশের দেয়ালগুলো দূর থেকে আরও দূরে সরে যেতে লাগল, যেতে যেতে আর কোনো দেয়ালই রইল না, আকাশ হয়ে উঠল অসীম। আর এই অসীম শূন্যের মধ্যে বিশ্ব উড্ডীন। বিশ্বের এই চিত্রই পাওয়া যায় আড়াই হাজার বছর আগে বিশ্বের প্রথম বৈজ্ঞানিক বইয়ে। বইটির নাম 'প্রকৃতি বিষয়ে', লেখক থালেসের শিষ্য আনাক্সিমান্দের।

গুরুর চেয়ে শিষ্য আরও দূরে অগ্রসর হয়ে গেল। থালেস ভাবতেন পৃথিবী হচ্ছে একটা গোল কাঠের ভেলার মতো, যেটা বিশাল জলের সমুদ্রের ওপরে ভাসমান। আনাক্সিমান্দের ভাবতেন, সীমাহীন শূন্যে পৃথিবীটা শুধুই ঝুলে আছে। তখনো জানতেন না পৃথিবী হচ্ছে একটা গোলক। ভেবেছিলেন, পৃথিবী একটা নলের অংশ, পৃথিবীকে ভারী একটা অবয়ব দেবার প্রয়োজনে এমনি ভাবতে হয়েছিল। কিন্তু নলের এই অংশটির ওপরে স্বর্গের ভর ছিল না, তার নিজেরও ভর ছিল না কোনো ভিত্তির ওপরে।

অনন্ত!

অনন্ত মহাকাশের ধারণা করা আমাদের পক্ষে শক্ত। আমরা এখনো 'আকাশের গম্বুজ' কথাটা ব্যবহার করি, যেন আকাশটা হচ্ছে আমাদের মাথার ওপরে একটা ছাদ।

কিন্তু আড়াই হাজার বছর আগে মানুষ শুধু যে কথায় ওইভাবে বলত তাই নয়, ওইভাবে ভাবতও। কতখানি সাহস থাকলে তবেই প্রত্যেকে যা নিজের চোখে দেখছে তা উলটিয়ে দেওয়া যায়, আর জোরগলায় বলা চলে এই বিশ্ব অসীম, তার শুরু নেই শেষ নেই, আর মহাশূন্য বা সময় সীমা-হীন। আমরা এখনো তাই ভাবি। কিন্তু আনাক্সিমান্দেরের সময়ের মানুষরা যখন অতীতের দিকে তাকাত তারা ভাবত—দেবতারা যখন জগৎ সৃষ্টি করেছিল তখন থেকে তাদের সময় পর্যন্ত মাত্র কয়েক-শো বছর কেটেছে।

এমনকি পর্যটক হেকাতিউস—যিনি সবকিছু পরখ করে দেখতেন—তিনিও ভাবতেন, প্রায় পনেরো পুরুষ আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিল ঐশ্বরিক। পনেরো পুরুষ—আরো প্রায় ছ'শো বছর পিছিয়ে গেলে সেই

সময়ে পেঁছনো যাবে যখন নশ্বর শিশুরা অবিনশ্বর দেবতাদের থেকে প্রথম উদ্ভূত হয়েছিল।

আনাক্সিমান্দেরও অতীতের দিকে তাকিয়েছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও তিনি অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি দূর পর্যন্ত দেখতে পেয়েছিলেন। পেছন ফিরে তিনি এমন এক সময়ের দিকে তাকিয়েছিলেন যখন মানুষ উদ্ভূত হচ্ছে অবিনশ্বর দেবতাদের থেকে নয়, বরং অন্যান্য জীবন্ত জীব থেকে। বলেছিলেন, শুরুতে মানুষ ছিল মাছের মতো। সমুদ্রের তলদেশে কাদার ভিতর থেকে সে বেরিয়ে এসেছিল। মাছের মতো তার সারা শরীর ঢাকা ছিল আঁশে। শুকনো জমির ওপরে যখন সে বেরিয়ে আসে তার আঁশগুলো শুকিয়ে ঝরে পড়ে। তার চেহারা বদলে যায়। বদলে যায় তার জীবনযাত্রার ধরনও।

কিন্তু কাদা ও শুকনো জমি এল কোত্থেকে? কি ভাবে সৃষ্টি হলো পৃথিবী? আনাক্সিমান্দের গভীরভাবে ভেবেছিলেন ও অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পেয়েছিলেন। অতীত থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল যে দেয়ালগুলি তা ভেঙে পড়তে থাকে। এমন একটা সময় ছিল যখন পৃথিবীতে মানুষ ছিল না ; শুধু তাই নয়, পৃথিবীও ছিল না।

তাই যদি হয়, কী ছিল তাহলে তখন?

ছিল 'অনন্ত', যা সবকিছুর ভিত্তি। অনন্ত বস্তুতে ভরে আছে অনন্ত মহাকাশ, তিনি ভেবেছিলেন—ঠিক যেমন আমরা আজকাল ভাবি। এবং আনাক্সিমান্দের ধারণা করেছিলেন—যেমন আমরা আজকাল করি—এই বস্তু নিশ্চল বা মৃত নয়, বরং পরিপূর্ণ। তারই মধ্যে জগতের আবির্ভাব। অনন্ত বস্তু দুই অংশে বিভক্ত—উত্তাপ থেকে পৃথক হয়ে ঠাণ্ডা, ভিজে থেকে শুকনো। পৃথিবীকে ঘিরে আছে আগুনের একটি গোলক। সেটি বলয়ে বিভক্ত। আকাশের বস্তুগুলো এই সব আগুনের বলয় থেকে বেরিয়ে আসে। এই ছিল বিশ্ব সম্পর্কে আনাক্সিমান্দেরের ধারণা—জগৎ সবসময়ে অদৃশ্য হচ্ছে, অন্য জগৎ উদ্ভূত হচ্ছে।

তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রকৃতির এই চিরন্তন সৃষ্টিশীলতা মুহূর্তের জন্যও থামে না। যে বস্তু দিয়ে সৃষ্টি হয় তা কখনো নিঃশেষিত হয় না। থালেস বলতেন, জল হচ্ছে সবকিছুর শুরু, গুরুর এই মত আনাক্সিমান্দের মানেননি। না, তিনি বলেছিলেন, জল কখনো সবকিছুর অনন্ত শুরু হতে পারে না, কেননা, এমনকি মহাসাগরেরও আছে তীর। কিন্তু যে বস্তু দিয়ে মহাসাগর তৈরি তার কোনো সীমানা নেই।

আনাক্সিমান্দের নিজের চারদিকে তাকিয়ে নিজেকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'এমন কিছু কি আছে যা অনন্ত? মানুষ জন্মায় ও মরে, রাজ্য ওঠে ও পড়ে, জগৎ আবির্ভূত ও অদৃশ্য হয়। একটি মাত্র জিনিস আছে যা চিরন্তন —তা হচ্ছে গতি। গতির না আছে শুরু, না শেষ। অতএব দেখা যাচ্ছে, একেবারে সেই গোড়ার কালেই সময় ও মহাশূন্যের সীমাবদ্ধতা বিজ্ঞান দূর করেছিল। কিন্তু গোড়ার দিকের সেই অনুমান থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তায় পেঁছতে দীর্ঘ পথ পার হতে হয়েছে!

দৃষ্টির এই স্বচ্ছতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। এমনকি আনাক্সিমান্দেরের যারা প্রথম শিষ্য তারাও বিভ্রান্ত হতে শুরু করল। যে দেয়ালগুলি সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার কিছু কিছু তারা আবার ফিরিয়ে আনল। ডিম ফুটে বেরিয়ে আসা নতুন ছানা আবার খোলার ভিতরে ঢুকতে চেষ্টা করল।

তারপরে আবার পৃথিবীকে ঘিরে দেখা দিল নিরেট স্বর্গীয় গম্বুজ—বিরাট এক স্ফটিকের গোলক, যার মধ্যে তারাগুলি বসানো রয়েছে সোনালী পেরেকের মতো। মাথার ওপরে গোল টুপি যেমন এঁটে থাকে তেমনি রয়েছে এই গোলক পৃথিবীর চারদিকে। আর তার উপরিতলে শরৎকালের পাতার মতো ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশ ও পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহ।

বিশ্বজগতের এই চিত্র উপস্থিত করলেন আনাক্সিমান্দেরের শিষ্য আনাক্সিমেনেস।

এতে এক-পা পিছিয়ে যাওয়া হলো, তবে পুরো এক-পা নয়। পৃথিবী আবার দেখা দিল একটা খোলের মধ্যে। তবে এই খোলটির ভর পৃথিবীর কিনারের ওপরে নয়—তা থেকে অনেক দূরে।

একটি ক্ষেত্রে আনাক্সিমেনেস গুরুকে ছাড়িয়ে গেলেন! আনাক্সিমান্দের গ্রহ ও তারার মধ্যে তফাৎ করতে পারেননি। কিন্তু আনাক্সিমেনেস জানতেন তারা ও গ্রহ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। গ্রহগুলি রয়েছে পৃথিবীর আরো কাছে, এবং মহাশূন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। তারাগুলি রয়েছে আরো অনেক দূরে এবং আকাশের গায়ে পেরেকের মতো শক্তভাবে আঁটা। তাই তারাগুলি ঘুরে বেড়ায় না। আনাক্সিমেনেস আকাশের দিকে তাকালেন। দেখলেন, কেমনভাবে মেঘ তৈরি হয়, কেমনভাবে রামধনু আকাশে জ্বলজ্বল করে, কেমনভাবে সূর্যের কিরণ ঘন কালো মেঘে আটকে যায়। শুনলেন, পাখি যতো দ্রুত উড়তে পারে তার চেয়েও দ্রুত বয়ে যাওয়া বাতাসের শব্দ। সিদ্ধান্ত করলেন, সবকিছুর শুরু জল হতে পারে না। তার কারণ, যা থেকে সবকিছুর সৃষ্টি সেটার নিশ্চয়ই সমস্ত মহাশূন্য ভরে থাকা উচিত। অথচ দেখা যাচ্ছে, জলের আছে তীর। জল আগুন নেবায়।

তাহলে, সবকিছুর শুরু কী হতে পারে?

অনন্ত? কিন্তু অনন্ত কী? এমনকি আনাক্সিমান্দের পর্যন্ত অনন্তর সংজ্ঞা দিতে পারেননি।

শিষ্য চেয়েছিলেন গুরুকে ছাড়িয়ে যেতে। আনাক্সিমেনেস প্রকৃতির মধ্যে এমন কিছুর সন্ধান করছিলেন যা সমস্ত জগৎ ভরে আছে. যা সবকিছুর শুরু।

বাতাস কী হতে পারে?

বাতাস যখন আরো ঘন হয়, সেটা হয়ে ওঠে মেঘ। মেঘ যখন আরো ঘন হয়, সেটা বৃষ্টি হয়ে পড়ে। বৃষ্টির ফোঁটা যখন জমাট বাঁধে, সেটা শিলা হয়ে নামে। আর মেঘ নিজেই যদি জমাট বাঁধে তাহলে তুষারপাত হয়। তারপরে, আনাক্সিমেনেস ভাবলেন, সেটা যদি আরো আরো ঘন হয় তাহলে হয়ে উঠতে পারে মাটি ও পাথর। তারপরে সেই মাটিতে গাছ জন্মায়, পৃথিবীতে জীবের আবির্ভাব ঘটে।

অতএব তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, প্রাথমিক পদার্থ হচ্ছে বাতাস। এই বাতাস থেকে সবকিছু এসেছে, এই বাতাসে সবকিছু ফিরে যায়। জল পরিণত হয় কুয়াশায়, কাঠ পোড়ে এবং পরিণত হয় ধোঁয়ায়।

বাতাসের অদৃশ্য কণিকাগুলি কখনো দূরে সরে যাচ্ছে, কখনো কাছাকাছি ঘন হচ্ছে। এই গতির ফলে উৎপন্ন হয়েছে পৃথিবী সূর্য ও বাতাস।

একসময়ে মানুষ ভাবত, বালুর দানা হচ্ছে জগতের ক্ষুদ্রতম কণিকা। এখন তারা ধারণা করতে পারল, এমন ছোট কণিকাও আছে যা চোখে দেখা যায় না।

ছোট জিনিসের জগতে মানুষ অনুসন্ধান চালাল বৃহৎ জগতের চাবিকাঠির সন্ধান পাবার জন্য। চেষ্টা করল চোখে দেখা যায় না এমন ছোট কণিকার গতি দিয়ে বৃহৎ জগৎকে বা বিশ্বকে ব্যাখ্যা করতে। এই ব্যাখ্যা ভুল ছিল, কিন্তু এই ছিল সঠিক ধরনের ব্যাখ্যা—সেটাই আসল কথা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সীমান্তে লড়াই

১। নতুন গান গেয়েছিল এমন এক বৃদ্ধ চারণ সম্পর্কে

বিজ্ঞানের সামনে বিশাল এক জগৎ খুলে গেল। সবকিছুই তার কাছে নতুন। সূর্য যদিও ভোরেই উঠছিল, কিন্তু সূর্য তখন আর রথে চেপে আকাশ-পথে চলা ভাস্বর দেবতা হিসেবে গণ্য নয়। সূর্য হয়ে উঠেছিল আকাশের এক জ্বলন্ত বস্তু। আকাশে রামধনু জ্বলজ্বল করত, কিন্তু রামধনু তখন আর নানা রঙের পোশাক পরা দেবী ছিল না। রামধনু হয়ে উঠেছিল সূর্যের কিরণে লাল হয়ে ওঠা মেঘ।

যে স্বর্গীয় আবাসগুলিতে বহু শতাব্দী ধরে দেবতারা বাস করত তা মিলিয়ে গেল। যেখানে দেবতারা ভোজে বসত, যেখানে হিবী সোনালী পানপাত্রে সুগন্ধী অমৃত পরিবেশন করত, সেখানে থেকে গেল শুধু মাউন্ট অলিম্পাসের চির-তুষার-ঢাকা খোলা শিলাময় শিখর।

রূপকথা ও বীরগাথা সরে গিয়ে আশ্রয় নিল লোক-কাহিনীর পৃষ্ঠায়, যদিও চারণরা তখনো সেগুলি গাইত। প্রাচীন কবি হেসয়েডের 'দেবকুলজি'— যাতে দেবতাদের জন্মতত্ত্ব বলা হয়েছিল—তা নিয়ে তরুণরা হাসাহাসি করত। এমনকি হোমার পর্যন্ত পুরনো দিনের মতো সম্মানিত ছিলেন না।

হেসয়েডের সময় থেকে পুরো একশো বছর পার হয়েছে। আর হেসয়েডের কবিতা তারও আগে রচিত। ইতিমধ্যে জগতের সবকিছু বদলে গিয়েছে।

হোমারের কবিতায় জিউস-এর বংশধর অভিজাতদের গুণগান করা হয়েছিল। আর সাধারণ মানুষদের কথা বলা হয়েছিল ঘৃণার সঙ্গে। কিন্তু ঘটনা দাঁড়াল এই যে, সাধারণ মানুষরা—অর্থাৎ বণিকরা, যারা ধনী হয়ে উঠেছিল—তারাই সর্বত্র অভিজাতদের উৎখাত করল।

নতুন সময়ের জন্য প্রয়োজন ছিল নতুন গানের।...

চারণ জেনোফানেস গ্রীসের রাজপথে এ-মাথা ও-মাথা ঘুরে বেড়াত। মানুষটা গরিব, দুনিয়ায় বিষয়সম্পত্তি বলতে তার ছিল একটি তারের বাদ্যযন্ত্র ও একটি দাস। এই দাস তার বিছানাটি পিঠে করে বয়ে নিয়ে যেত। সে যতোটা-না দাস, তার চেয়ে বেশি ছিল সংগী ও বন্ধু। দুজনে একসংগে গ্রীসের রাস্তায় রাস্তায় চষে বেড়াত। শীতের সময়ে একসংগে

ঠাণ্ডায় জমে যেত, গ্রীষ্মের সময়ে গরমে ছটফট করত। কে যে প্রভু আর কে যে দাস বোঝা যেত না।

কোনো ছোট শহরে যখন তারা এসে পৌঁছত, তাদের ঘিরে ময়দানে ভিড় জমে যেত। অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন কোনো ব্যক্তি গায়ককে ও তার বন্ধুকে অতিথি হিসেবে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যেত। ভ্রাম্যমাণ চারণের কথা শুনতে সবাই আগ্রহী।

বাড়িতে অতিথি হবার পরে কী হতো সেটা অনুমানের বিষয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তার কোনো দরকার নেই। জেনোফানেস নিজেই এ-বিষয়ে আমাদের বলে গিয়েছেন। কবিতাটির কিছু অংশ আমাদের হাতে এসে গিয়েছে।

শীতকালে, আহার শেষ করার পরে আগুনের সামনে আরাম কেদারার ওপরে বিশ্রাম নিতে নিতে, বাদাম ও মিষ্টি সুরা হাতে নিয়ে গৃহকর্তা জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কী ধরনের মানুষ বলো তো, কোত্থেকে আসছ তুমি? তোমার বয়েস কত, আর কবে থেকে তুমি দেশের চারদিকে এভাবে ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছ?'

গায়ক জবাব দেয়, 'আচ্ছা, আমি যেমনটি বুঝেছি বলি। প্রায় সাতষট্টি বছর হতে চলল সারা গ্রীসের মানুষকে আমি আমার কথা শোনাচ্ছি। আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, যখন শুরু করি আমার বয়স ছিল পঁচিশ বছরের সামান্য বেশি।'

গৃহকর্তার আমন্ত্রণ পেয়ে বৃদ্ধ তার বাদ্যযন্ত্রটি মাথার ওপরে একটি পেরেকে ঝুলিয়ে রাখে, তারপরে টেবিলের কাছে যায়। দাসীরা তার কাছে তোয়ালে নিয়ে আসে খাওয়ার আগে হাত ধুইয়ে দেবার জন্য, রুটি সাজিয়ে দেয় ও পাত্রভর্তি সুরা ঢালে। আকণ্ঠ পানাহার করার পরে বৃদ্ধ বাদ্যযন্ত্রটি নামিয়ে নিয়ে গাইতে শুরু করে। এবারে তার নিজের কথাতেই শোনা যাক :

'মেঝে পরিষ্কার, অতিথির হাত ও পানপাত্র পরিষ্কার। জনকয়েক অতিথি মালা পরছে, অন্যরা পাত্রে সুগন্ধী তেল ঢালছে। একটি ঘড়া সুরায় ভর্তি, যাতে ভোজনের আনন্দ। মাটির জালাগুলিতে প্রচুর সুরা রয়েছে, তাতে ফুলের সুগন্ধ। সুগন্ধী ধুপের সৌরভে বাতাস ভরে আছে। আমাদের সামনে টেবিলের ওপরে বাদামী রুটি, পনির ও মধু সাজানো। সেগুলির ভারে টেবিলের প্রায় ভেঙে পড়ার অবস্থা। ঘরের মধ্যিখানে একটি ফুলে ঢাকা বেদী। ঘর ভরে আছে গানে, নাচে, উল্লাসে। অতিথিরা প্রথমে সুরা ঢালে দেবতাদের উদ্দেশে নিবেদন করার জন্য। প্রার্থনা জানায় পানাহার করার সময়ে দেবতারা যেন তাদের আশীর্বাদ করে। এতে কোনো লজ্জা নেই, বয়স যদি খুব বেশি না হয় তাহলে অবশ্যই এত বেশি পান করা যেতে পারে যে দাসের সাহায্য নিয়ে বাড়ি ফিরতে হয়। সুরা পান করতে করতে যে অতিথি মজার মজার গল্প বলতে পারে তার খুবই কদর।

'আমরা গান গাইব হিংস্র লড়াই নিয়ে নয়, আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রাচীন কাহিনীতে যে-সব অসুর দানব ও আধা-মানুষ আধা-ঘোড়ার কথা আছে তাদের যুদ্ধ নিয়ে নয়।...'

কী ধরনের গান গায় জেনোফানেস সুরাপান করার পরে?

ভ্রাম্যমাণ অন্য চারণরা যেখানে বারেবারে গাইত হোমার ও হেসয়েডের কাহিনী সেখানে সে অন্যরকম। হোমার ও হেসয়েড দু'জনকেই সে ঘৃণা

করত। বলত, হোমার ও হেসিয়েড দেবতাদের দিয়ে এমন সমস্ত পাপ করিয়েছে যা মানুষে করলেও লজ্জার ব্যাপার হতো। তারা দেখিয়েছে দেবতারা কতখানি যথেচ্ছাচারী, দেবতারা কেমনভাবে একে অপরকে ঠকায় ও প্রতারণা করে।

অতিথিরা এই সমস্ত কথা অবাক হয়ে শোনে। তাহলে কি এই পাকা-মাথা গায়ক দেবতাদের ভয় পায় না?

আশ্বাস দিয়ে সে বলে, সে নাস্তিক নয়, দেবতাদের প্রতি তার বিশ্বাস আছে, তবে দেবতাদের সম্পর্কে তার ধারণা অধিকাংশ মানুষের ধারণা থেকে আলাদা। বলে, 'হ্যাঁ, ঠিক কথা, দেবতাদের ভক্তি করা উচিত। কিন্তু কী পরিচয় এই দেবতাদের? আমরা তাদের দেখি আমাদেরই মতো মরণশীল হিসেবে। তাদের সাজপোশাক আমাদের মতো, কথাবার্তা আমাদের মতো, শরীর আমাদের মতো। কিন্তু এভাবে দেখাটা উচিত নয়। দেবতাদের প্রতি সঠিক মনোভাব এটা নয়। কেননা, এই মনোভাবের অর্থ দাঁড়ায়, দেবতারা অমর নয়, এমন সময়ও ছিল যখন দেবতাদের অস্তিত্ব ছিল না। আপনারা ভাবেন দেবতারা আমাদের মতো। ঘোড়া ও গোরুর যদি হাত থাকত আর তারা যদি তাদের দেবতাদের ছবি আঁকতে পারত, তাহলে দেখা যেত ঘোড়ার দেবতারা ঘোড়ার মতো, গোরুর দেবতারা গোরুর মতো।'

এ-ধরনের কথা শুনলে একসময়ে শ্রোতারা শিউরে উঠত। কিন্তু পুরনো সংস্কার ভেঙে পড়তে শুরু করেছে। তাই লোকে জেনোফানেসের কথা আগ্রহের সঙ্গে শোনে। তাঁকে জিজ্ঞেস করে, তাহলে সত্য কী? দেবতাদের কী পরিচয়?

জেনোফানেস বলে, 'দেবতাদের পরিচয় বুঝতে পারার মতো মানুষ আগে কখনো ছিল না, পরে কখনো থাকবে না।'

বলে, আসলে কী হয়, কোনো মানুষ যদি সত্যকথা বলেও, সে নিজে কিন্তু সে-বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারে না। সে যা বলেছে তাতে শুধুই অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। দেবতারা কখনোই মরণশীল মানুষদের কাছে নিজেদের প্রকাশ করেনি। মরণশীলরা সত্যের দিকে অগ্রসর হয়েছে ক্রমে-ক্রমে, একটু একটু করে।

তারের বাদ্যযন্ত্র তুলে নিয়ে জেনোফানেস গাইতে থাকে :

'দেবতা আছেন একজন। তিনি সকল দেবতা ও সকল মানুষের চেয়ে বড়ো। তাঁর সঙ্গে মানুষের কোনো মিল নেই—না শরীরে, না মনে। তিনি সবকিছু দেখেন, সবকিছু চিন্তা করেন, সবকিছু শোনেন। জগতের সবকিছু পরিচালনা করেন। তিনি সবসময়ে এক জায়গায় রয়েছেন এবং অনড় হয়ে থাকেন। কেননা, তিনি চলেফিরে বেড়াবেন, এটা মোটেই সঙ্গত নয়।'

জেনোফানেস গায় নতুন এক দেবতার কথা, এক চিরন্তন দেবতা, অনন্ত মহাশূন্যের মতো অনড়। তিনি একক, কারণ প্রকৃতি একক। তিনি সবকিছু —চিরন্তন, অনন্ত, অসীম মহাশূন্য।

'জিনিসের চেহারা বদলায়। মেঘে আগুন ধরে আর পুড়ে যায়। লোকে এগুলিকে বলে স্বর্গীয় বস্তু। জীবন্ত জীব দেখা দেয়—মাটি থেকে সৃষ্টি হয়, আবার ফিরে যায় মাটিতে। বাতাস ও কুয়াশা ওঠে বিরাট সমুদ্র থেকে,

মেঘ নামে বৃষ্টি হয়ে, বৃষ্টি আবার ফিরে যায় মহাসাগরে নদী দিয়ে, নদী সঙ্গে নিয়ে আসে মাটি থেকে লবণ। এই কারণেই মহাসাগর লবণাক্ত। ধীরে ধীরে, চোখে পড়ে না এমন শ্লথ গতিতে শুষ্ক জমি গঠিত হয় মহাসাগর থেকে। আমরা এখনো দেখতে পাই পর্বতের চুড়োয় ঝিনুক, আর পাথরের খনির নিচে মাছের ছাপ। এই শুষ্ক জমি আবার সমুদ্রে ঢাকা পড়ে, মানুষ-জন বন্যায় ডুবে যায়। সবকিছু বদলায়, কিন্তু বিশ্ব থেকে যায়। একমাত্র এই বিশ্ব না হয় আবির্ভূত, না হয় বিলীন...'

এমনিভাবে জগতের পরিবর্তমান বহুবর্ণ আবরণের নিচে জেনোফানেস খুঁজেছিল তার অনড় অনন্ত ভিত্তি।

পরদিন জেনোফানেস ও তার সঙ্গী এই আতিথ্যপূর্ণ আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। বুড়ো দাস খুবই খুশি, কেননা মূল্যবান সব উপহারে তার থলে বোঝাই। জেনোফানেসও খুশি, কেননা লোকে তার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনেছে—যেমন শোনে শিক্ষকের কথা তার ছাত্ররা।

কিন্তু ব্যাপারটা সবসময়ে এমনি হতো না। হোমার ও হেসয়েড নিয়ে বুড়ো চারণের তামাসা সবাই যে পছন্দ করত তা নয়। এমন প্রায়ই হতো যে গৃহকর্তা কোনো দেবতা বা বীরের বংশধর—তখন যদি বুড়ো চারণ এই দেবত্ব-সম্পন্ন পূর্বপুরুষদের নিয়ে তামাসা করত তাহলে তাকে কী নিগ্রহ যে ভোগ করতে হতো!

জেনোফানেস ঘৃণা করে এই উদ্ধত অভিজাতদের, দামী হীরাজহরৎ ও শৌখিন কেশবিন্যাস নিয়ে যাদের এত গর্ব।

মিষ্টি একপাত্র সুরা হাতে নিয়ে তারা যতো সব তামাসা চালিয়ে যাবে এই গরিব বুড়ো চারণকে নিয়ে, যার মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। তারা বলবে, 'মৃত্যুর পরেও হোমার ছিল হাজার হাজার গাইয়ের অবলম্বন। কিন্তু এই গাইয়ের বড়োই খারাপ সময়—নিজেরটা ও একটা মাত্র গরিব বুড়ো দাসের চলতে চায় না।'

কিন্তু ও যে এত গরিব সেজন্য কি তারা দোষী নয়? পুরস্কারের জন্য লড়াই করে যে জেতে তাকে শিরোপা দিতে তাদের ভুল হয় না। কিন্তু এটুকু বোঝার ক্ষমতা নেই যে কব্জির জোরের চেয়ে যুক্তির জোর অনেক অনেক বেশি।

জেনোফানেস পাহাড়ী পথে চলতে থাকে। মানুষজনের যেখানে ভিড় সেখান থেকে ক্রমেই দূরে চলে যায়। যে উঁচু জায়গায় সে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখান থেকে তাদের ঘরবাড়িগুলি কত ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ দেখায়। আর যে-সব কাজ নিয়ে তারা থাকে সেগুলি বা কত অকিঞ্চিৎকর! কী এক সংকীর্ণ জগতেই না তারা বাস করে!

এই জগতের মানুষ আর সে নয়, কেননা সে থাকে উঁচুতে। নিজের দেশ সে হারিয়েছে, তার বদলে হয়ে উঠেছে সারা বিশ্বের মানুষ। প্রকৃতির মধ্যে

থাকতে সে ভালবাসে। প্রকৃতি কখনো ক্লান্ত হয় না, কখনো বুড়ো হয় না, কখনো মরে না। ক্লান্ত বৃদ্ধ এখানে বিশ্রাম পায়—অনুভব করতে পারে মহাসাগরের মধ্যে বিন্দুর মতো তার আত্মা, বিরাট সমগ্রের একটি অংশ মাত্র।

২। পুরনো ব্যবস্থার ধ্বজাধারীরা বিজ্ঞানকে নিজেদের পক্ষে পেতে চেষ্টা করে

এমনিভাবে নতুন চিন্তার হাতুড়ির ঘায়ে অজ্ঞ কুসংস্কারের পুরনো দেয়ালগুলি ভেঙে পড়ল। ধ্বংসাবশেষ থেকে জন্ম নিল এক মহান নতুন জগৎ, যার সঙ্গে পুরনো জগতের কোনো মিল নেই।

পুরনো ব্যবস্থার ধ্বজাধারীরা দেখল বিজ্ঞানের একটানা অগ্রগতির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা খুবই শক্ত। তখন তারা বিজ্ঞানকে নিজেদের পক্ষে টেনে আনতে চেষ্টা করল।

তারা শুরু করল সামোস-এ। এটি একটি দ্বীপ, মাইলেটাস থেকে দূরে নয়। দেবতারা এখানে অনেক আগে থেকেই নতুন এক দেবতার কাছে তাদের প্রতিপত্তি খুইয়ে বসেছে। এই নতুন দেবতা হচ্ছে রূপো ও সোনার গোল গোল টুকরো। আগেকার কালে মুদ্রা বলতে একমাত্র ছিল বিশাল বিশাল বাবিলনীয় টালেন্ট, ওজনে প্রায় বাহাত্তর পাউন্ড। অর্থের এই অতিকায় টুকরোগুলি পুরুষানুক্রমে পড়ে থাকত কোনো ধনী ব্যক্তির গৃহে। চালু থাকা অর্থ বলে কোনো কিছু তখন ছিল না। কিন্তু এখন কিছুকাল হলো নতুন রুপোর ও সোনার মুদ্রা চালু হতে শুরু করেছে—ব্যবসা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা বাড়ে। যে মানুষদের হাতে এই মুদ্রাগুলি প্রচুর পরিমাণে থাকে তাদের আর দেবতাদের সাহায্য দরকার হয় না। যা-কিছু তারা চায় অর্থ দিয়েই পেয়ে যায়।

যেমন, পলিক্রাটিসের কথা ধরা যাক। এই লোকটির পরিবার ছিল না, গোষ্ঠী ছিল না, সে খুলে বসল একটা কারখানা। সেখানে সে ডজনখানেক দাস লাগিয়ে দিল ভোর থেকে সন্ধে পর্যন্ত কাজ করার জন্য। তৈরি হতে লাগল ধনীদের জন্য সুন্দর সুন্দর আসবাব—ভোজন ঘরের কেদারা ইত্যাদি। বাণিজ্য ভালো চলছিল। অলস ধনীদের পেলব হাত থেকে প্রচুর অর্থ চলে এলো এই আলমারি প্রস্তুতকারকের কড়া পড়া কর্কশ হাতে। নিজের ব্যবসা সে আরো বাড়িয়ে তুলল, জাহাজ তৈরি করতে শুরু করল, জাহাজের কাজে নিযুক্ত করল অভিজ্ঞ সাহসী নাবিকদের। তাদের পাঠিয়ে দিল সমুদ্রে, দ্বীপ থেকে দ্বীপে ঢুঁড়ে বেড়াবার জন্য। সেখানে গিয়ে তাদের দিয়ে যা করাতে চাওয়া হয়েছিল তাই তারা করল—পুরুষদের হত্যা করল, নারী ও শিশুদের পাকড়াও করল, নিজেদের কালো জাহাজগুলি সোনা ও মহামূল্য বস্ত্র দিয়ে বোঝাই করল। পলিক্রাটিস দেখল, চারদিক থেকে সে প্রচুর অর্থ পেয়ে যাচ্ছে। তাই নিয়ে তার এমন সামর্থ্য হলো যে যা চায় তাই পেয়ে যায়। এমনি চলতে চলতে পেয়ে গেল যা সে সবচেয়ে বেশি করে চেয়েছিল—স্বদেশবাসীদের ওপরে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ।

ব্যবসায়ী, কারিগর ও দাসপ্রভু, সকলেই পলিক্রাটিসের নতুন সরকার নিয়ে খুবই সন্তুষ্ট। এই সরকারের আমলে তারা সমৃদ্ধি লাভ করছে। কিন্তু ধনী অভিজাতরা এই সরকারকে আদৌ পছন্দ করল না যখন তারা দেখল যে ভুঁইফোঁড়গুলো নিজেদের জন্য কী চমৎকার চমৎকার প্রাসাদ বানাচ্ছে। এও কি সম্ভব যে দেবতারা এই নবাগতদের রক্ষা করে চলছে? এ-ধরনের ব্যাপার নিশ্চয়ই দীর্ঘকাল ধরে চলতে পারে না।

একটা গুজব ছিল যে পলিক্রাটিস নাকি ঈর্ষান্বিত ভাগ্যকে প্রসন্ন করার জন্য তার সবচেয়ে দামী আংটিটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছিল। এই সমুদ্রই তো পলিক্রাটিসকে প্রচুর অর্থ দিয়েছে, কিন্তু এখন তার পরিবর্তে কিছু গ্রহণ করতে অসম্মত হলো। আংটিটি ফিরিয়ে দিল পলিক্রাটিসকে। আংটিটি ছিল প্রকান্ড একটি মাছের পেটে আর সেই মাছ পলিক্রাটিসকে বিক্রি করেছিল একজন জেলে।

কিন্তু দেবতারা তো মাউন্ট অলিম্পাস থেকে সবকিছু জানতে পারে, সবকিছু দেখতে পায়। কাজেই, সাধারণ মানুষরা সম্পদ ও সম্মান ভোগ করবে আর দেবতাদের আপন বংশধররা গরিব ও অবজ্ঞাত থাকবে—এমন হতেই পারে না, দেবতারা দীর্ঘকাল এ-অবস্থা চলতে দিতে পারে না।

অনেকে তাই ভেবেছিল। অনেকে আবার এ-ধরনের কথাবার্তা শুনে তিক্ত হাসি হেসেছিল। অলিম্পিয়ান দেবতারা কোথায়? পুরনো বিশ্বাসে লোকের আর আস্থা থাকল না। সেই শক্তি কোথায় যে এই গোরুভেড়াগুলিকে নিজের জায়গায় ফিরিয়ে আনবে, উঁচু আসন থেকে টেনে নামিয়ে আনবে আর তাদের ঘাড়ের ওপরে স্থাপন করবে দাসত্বের ভারী জোয়াল?

প্রাচীন বীরদের বংশধররা আগেকার সমস্ত সাহস খুইয়েছিল এবং অত্যাচারী পলিক্রাটিসের নাম শুনলেই ভয়ে কাঁপত। নতুন চেতনার ছোঁয়াচ লাগতে শুরু করেছিল তাদের নিজেদের মধ্যেই। কোন্‌টা যে ঠিক আর কোন্‌টা যে ভুল তা তারা ধরতে পারত না।

কোথায় তারা তাকাতে পারত সাহায্যের জন্য? কার কাছে যেতে পারত নেতৃত্ব দিয়ে তাদের পথ দেখাবার জন্য?

কানাকানি শোনা যেতে লাগল যে এমন একজন মানুষ আছেন যিনি পুণ্যবান ও জ্ঞানী, যিনি তাদের সাহায্য করতে পারেন। সেজন্য তাদের দীর্ঘকাল ধরে বৈরাগ্য পালন করার মধ্যে দিয়ে পৌঁছতে হবে পবিত্রতা ও শুচিতার অবস্থায়। যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে কোনো কিছুর বিচার বন্ধ করতে হবে। অনুগত ও মৌন হতে হবে। মানুষ জানে না কোনটা তার পক্ষে ভালো, জানে শুধু দেবতারা, অর্ধদেবতারা ও বীররা।

তাদের মধ্যে এই অর্ধ-দেবতা ও অর্ধ-মানবটি হচ্ছেন পিথাগোরাস। কেউ কেউ বলে, তিনি পাথর-খোদাইকর নেসারকাসের পুত্র। কিন্তু এমনও শোনা যায় তিনি আসলে হারমিসের পুত্র, হয়তো-বা এমনকি অ্যাপোলোরও। একবার তাঁর গায়ের আলখাল্লা বাতাসে সরে গিয়েছিল আর লোকে তখন অবাক হয়ে দেখেছিল যে তার গা সোনার মতো ঝকঝকে। তিনি অলৌকিক কান্ড ঘটান, দেবতাদের সঙ্গে কথা বলেন, একবার এমনকি হাদিজের কাছে নেমে গিয়েছিলেন এবং প্রাচীন চারণকবি অরফিউসের মতো দিনকয়েক সেখানে ছিলেন।

অভিজাত পরিবারগুলি থেকে তরুণরা এই পিথাগোরাসের কাছে ভিড় করতে লাগল। তিনি তাদের যা শেখালেন তা গোপন রাখা হলো। কিন্তু এই সমস্ত গোপন কথাবার্তার খবর পলিক্রাটিসের কানে গেল। পলিক্রাটিস তার অনুগামীদের হুকুম দিল তারা যেন এই মানুষটির পেছনে লেগে থাকে। খুব সম্ভবত এই গোপন দলগুলো পিথাগোরাসের বিরুদ্ধে কোনো এক ধরনের ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলছিল। পিথাগোরাস তাই সামোস ছেড়ে চলে গেলেন। একজন শিষ্যকে তিনি বলেছিলেন, 'অত্যাচারী এতই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে এই যথেচ্ছাচারিতার আওতায় কোনো স্বাধীন মানুষ বাস করতে পারে না।' কিছুকালের জন্য তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। শোনা গেল তিনি রয়েছেন মিশর ও বাবিলনের আদিবাসীদের মধ্যে এবং আদিবাসীদের পুরোহিতদের কাছ থেকে নিগূঢ় বিষয় জেনে নিচ্ছেন। শেষপর্যন্ত তিনি দেখা দিলেন জগতের অন্যদিকে, ইতালিতে, সমুদ্রতীরের বন্দর-শহর ক্রোটোনায়।

ইতালিতে তখন অভিজাতদের পার্টি ও জনসাধারণের মধ্যে যুদ্ধ চলছে—কখনো এ-পক্ষ সুবিধাজনক অবস্থায়, কখনো ও-পক্ষ। অভিজাতদের পক্ষে লড়াই করছে একজন ব্যায়ামবীর। হারকিউলিসের মতো সেও সিংহের চামড়া পরে, হাতে রাখে লাঠি। যুদ্ধক্ষেত্রে তার আবির্ভাব ঘটলে তার বিরোধীরা ভয়ে পালায়। কিন্তু মাইলনকে জ্ঞানীব্যক্তি বলা চলে না। তার চিন্তা দর্শন নিয়ে যতোটা, লড়াই করে পুরস্কার জেতা নিয়ে তার চেয়ে বেশি।

ক্রোটোনার অভিজাতদের নেতা ছিল, কিন্তু শিক্ষক ছিল না।

আর এই সময়ে এলেন পিথাগোরাস। তরুণদের সঙ্গে তিনি দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা চালালেন।

পিথাগোরাস তাদের বললেন, 'হে যুবকগণ, আমি তোমাদের যা বলতে চাই, তদগত হয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে তা শোনো। নিজেদের চারদিকে তাকিয়ে দেখ। জগতের সর্বত্র তোমরা দেখতে পাবে কড়াকড়ি শৃঙ্খলা। সবকিছুই সামঞ্জস্য মাপ ও সংখ্যার অধীন। এমনকি শব্দও।'

একটা পাটাতনের ওপরে টান করে তার বাঁধলেন পিথাগোরাস, তারপরে সেই তারে টংকার দিলেন। তারটাকে আরো লম্বা করলেন সুর হয়ে উঠল আরো মিহি। তারটাকে আরো ছোট করলেন, সুর হয়ে উঠল আরো চড়া। তার ছোট বা বড়ো করা হচ্ছে, সেইমতো তারের সুর বদলাচ্ছে একটা কড়াকাড়ি নিয়ম মেনে চলে—সিঁড়ির ধাপে ধাপে পা ফেলে ওঠা বা নামার মতো।

লোকের ধারণা ছিল, কান খুব সজাগ হলে তবে সুর থেকে সুরের বিরতি ধরা সম্ভব। পিথাগোরাস দেখালেন, যে-কেউ একটা বাদ্যযন্ত্রকে সুরে বাঁধতে পারে, কেননা সুর নির্ধারিত হয় তার কতখানি লম্বা তাই দিয়ে।

তারপরে তিনি বালির ওপরে একটি সমকোণী ত্রিভুজ আঁকলেন। দেখালেন, এই ত্রিভুজের দুটি বাহুর মাপ যদি নেওয়া যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সমকোণের বিপরীত বাহু অতিভুজের দৈর্ঘ্য বলা যেতে পারে।

সংখ্যা, রেখা, মাপ—এগুলি বিশৃঙ্খলা থেকে জগৎকে বার করে এনেছে, আকারহীনকে দিয়েছে আকার, সীমাহীনকে সীমা।

রাত্রিবেলা পিথাগোরাস তাঁর শিষ্যদের নিয়ে বাইরে আসতেন, আকাশের তারা দেখাতেন তাদের। সেখানেও আধিপত্য করছে সংখ্যা, মাপ ও ছন্দ।

তারাগুলি উদিত হয় ও অস্ত যায় নির্দিষ্ট সময়ে, নির্ধারিত যাত্রাপথ সম্পূর্ণ করার পরে। জগতের মধ্যিখানে জ্বলছে একটি আগুন, ঠিক যেন একটি বেদীর ওপরে। সেই আলো সবকিছুকে আলোকিত ও উষ্ণ করছে। তাকে ঘিরে রয়েছে দশটি স্ফটিক গোলক, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহসমূহ ও নক্ষত্রসমূহ। পৃথিবীকে মেনে চলতে হয় সেই একই শৃঙ্খলার নিয়ম। পৃথিবী অনড় নয়, আগুনের এই জগতের চারদিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছন্দোবন্ধ নৃত্যে অন্যান্য গোলকের সঙ্গে পৃথিবীও যুক্ত রয়েছে। গোলকগুলি আস্তে আস্তে ঘুরছে, প্রত্যেকেই সুর তুলছে, বিশ্বের এই দশ-তারের বীণায় প্রত্যেকেরই আছে নিজস্ব সুর।

সবকিছু কড়াকাড়ি শৃঙ্খলার অধীন। সবকিছু সংখ্যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

কতকগুলো পবিত্র সংখ্যা আছে : ১, ৩, ৪, ১০। প্রথম চারটি সংখ্যা ধরা যাক—১, ২, ৩, ৪। এই চারটি সংখ্যা যোগ করলে দাঁড়ায় ১০। অতএব ১০ হচ্ছে নিখুঁত সংখ্যা।

নিজের এই আবিষ্কারে পিথাগোরাস নিজেও হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নিজে একটা কিছু আবিষ্কার করেছিলেন আর ভেবেছিলেন সেটাই সবকিছু, সমগ্র সত্য। যেহেতু তিনি দেখেছিলেন যে সবকিছু গণনা করা যায়, সবকিছুর মাপ নেওয়া যায়, তিনি ভাবলেন যে সবকিছুর সমাধানও হচ্ছে সংখ্যা। তিনি পেয়ে গিয়েছেন সেই চাবিকাঠি যা তাঁর কাছে উন্মুক্ত করছে শব্দ, সংখ্যা ও স্বর্গীয় বস্তুর চলাচলের রহস্য। জগতের অন্য রহস্য-গুলি কি এই চাবিকাঠি দিয়ে তাঁর কাছে উন্মোচিত হবে না?

হবে, জবাব দিলেন পিথাগোরাস। সংখ্যাই হচ্ছে চাবিকাঠি—সুখের ও অ-সুখের, সাফল্যের ও ব্যর্থতার। সংখ্যা হতে পারে সৌভাগ্যজনক বা দুর্ভাগ্যজনক। জগতের সর্বত্র আধিপত্য করছে সংখ্যা, মাপ ও সামঞ্জস্য। দেবতারা এই জগতে কড়াকাড়ি শৃঙ্খলা স্থাপন করেছেন, তারারা তা মেনে চলে, মানুষ কি করে তা মেনে চলতে অস্বীকার করতে পারে? সেই নগর ক্লিষ্ট হোক যেখানে বিশৃঙ্খলার রাজত্ব চলেছে, যেখানে সবকিছু নির্ধারণ করেছে জনতা, যেখানে দেবতাদের দ্বারা অনন্তকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলা মানুষ মানেনি।

পিথাগোরাস যখন তাঁর শিষ্যদের কাছে নিজের নিগূঢ় বিষয়গুলি জানাতেন তখন এমনিভাবে কথা বলতেন। এগুলি পুরনো দিনের রূপকথা নয়, যাতে কারও আর এখন বিশ্বাস নেই। এই হচ্ছে পুরনো দেবতাদের সমর্থনে নতুন বিজ্ঞান।

পিথাগোরাসের শিষ্য-সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে লাগল। তারা হয়ে উঠল একটি সম্মিলিত ভ্রাতৃদল—পিথাগোরীয় ইউনিয়ন। তারা দিন কাটাতে লাগল গণিত, ব্যায়াম ও সংগীত অনুশীলন করে। ব্যায়াম হচ্ছে শরীরের ছন্দ। শরীর যদি ছন্দ না মানে তাহলে আত্মায় শৃঙ্খলা থাকতে পারে না। সংগীত সবকিছু সুরে বেঁধে দেয়। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, অর্থাৎ গণিত, আত্মাকে শুদ্ধ করে।

তাদের বিজ্ঞান ছিল আধা-ধর্ম। অনেক নিয়ম ও বিধিনিষেধ তাদের মেনে চলতে হতো যা দলের বাইরের লোকেরা বুঝতে পারত না। যেমন, ভেড়ার মাংস তারা খেতে পারত, কিন্তু অন্য কোনো মাংস নয়। শিম খাওয়া

তাদের বারণ ছিল। চটি পরতে হতো ডান পায়ে প্রথম। হাত ধুতে হতো বাঁ-হাত প্রথম। পথ হাঁটতে হতো সবসময়ে বড়ো রাস্তা দিয়ে।

দলের লোকেরা জানত না কেন তাদের এসব করতে হচ্ছে। জানতে চাওয়াটাও তারা যুক্তিযুক্ত মনে করত না। 'তিনি নিজে একথা বলেছেন।' তাদের যেটুকু করা দরকার তা হচ্ছে মেনে চলা।

পিথাগোরীয়দের পলকের মধ্যে চিনে নেওয়া যেত—থিয়েটারেই হোক বা বাজারেই হোক বা ময়দানেই হোক। সাধারণ লোক থেকে তারা আলাদা হয়ে থাকত। দলের বাইরের অজ্ঞ লোকদের তারা অবজ্ঞার চোখে দেখত। এই লোকগুলোর বিধিলিপি হচ্ছে জ্যেষ্ঠদের, শ্রেয়তরদের—অর্থাৎ, ভ্রাতৃদলের অন্তর্ভুক্তদের অন্ধভাবে মেনে চলা।

মাইলন—হারকিউলিসের মতো যার মাংসপেশী, বৃষস্কন্ধের ওপরে যার ছোট মাথা—সে ছিল একজন ভ্রাতা।

নিয়মানুগত্য, শৃঙ্খলা, বাধ্যতা—এগুলি থাকলে যা হবার তা হয়েছিল। বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি দূর হয়েছিল। পিথাগোরীয় ইউনিয়নের ভাবনার বিষয় ছিল কেবলমাত্র বিশুদ্ধ বিজ্ঞান নয়, ক্রোটোনায় রাজনৈতিক ক্ষমতাও ইউনিয়নের হস্তগত ছিল। পিথাগোরীয়রা চাইত সবকিছুর মধ্যে সামঞ্জস্য থাকুক। কিন্তু 'সামঞ্জস্য' ও শৃঙ্খলা বলতে তারা যা বুঝত তা হচ্ছে বেশির ভাগ মানুষের ওপরে শীর্ষস্থানীয় অল্প কয়েকজনের শাসন। সামঞ্জস্য ও শান্তি নিয়ে তারা প্রচুর কথা বলত, কিন্তু এই শান্তি তারা আরোপ করতে চাইছিল তলোয়ার চালিয়ে, জোর-জবরদস্তি করে। এমনিভাবেই তারা তাদের বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করতে যাচ্ছিল।

এটা করার জন্য একটা ওজর তারা পেয়ে গিয়েছিল। প্রতিবেশী নগর সাইবারিস থেকে কিছুসংখ্যক শরণার্থী পালিয়ে এসেছিল ক্রোটোনায় এবং আশ্রয় প্রার্থনা করেছিল। এই শরণার্থীরা ছিল অভিজাত। স্বদেশ ছেড়ে তারা পালিয়ে এসেছিল এ-কারণে যে স্বদেশের শাসন চলে গিয়েছিল জনগণের হাতে। সাইবারিসের লোকেরা দাবি করেছিল যে শরণার্থীদের ফিরিয়ে দেওয়া হোক। ক্রোটোনীয়রা এই দাবি মানতে রাজী নয়। সকলেই জানত রাজী না হওয়া মানেই যুদ্ধ। কিন্তু ক্রোটোনার লোকেরা প্রতিবেশীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিল। অনেকদিন থেকেই তাদের লোভী দৃষ্টি পড়েছিল সাইবারিসের সম্পদের ওপরে। সেখানে ছিল মাইলেটাস থেকে আসা গাদা গাদা পশম এবং এত প্রচুর পরিমাণ সুরা যে সেই সুরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবার জন্য মাটির নিচে খাল খুঁড়তে হয়েছিল।

সাইবারিসের এই চতুর ব্যবসায়ীরা ছিল সুরা ও অন্যান্য বিলাসদ্রব্যের সমঝদার। আর ক্রোটোনার মানুষরা ছিল শুধুই কৃষক ও ধীবর।

ক্রোটোনার কৃষক ও ধীবররা ব্যায়ামবীর মাইলনের নেতৃত্বে আক্রমণ করতে এগিয়ে গেল। মাইলন সাজপোশাক করেছিল হারকিউলিসের মতো, তার মাথায় জড়িয়েছিল অলিম্পিক মালা। তার পিছনে ছিল অভিজাতরা, সুশিক্ষিত ভাড়াটে সৈন্যরা, অনুগত পিথাগোরীয়রা। সাইবারিসের অধঃপতিত লোকেরা তাদের চেয়ে সেরা শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারল না।

লড়াই বেশিকাল ধরে হয়নি। পিথাগোরীয়রা বিজয়ী হলো এবং

সাইবারিসে শৃঙ্খলা স্থাপন করতে গেল। পুরুষরা নিহত হলো, নারী ও শিশুদের তুলে নেওয়া হলো দাস হিসেবে, নগরকে পুড়িয়ে ধূলিসাৎ করা হলো। 'সেরা মানুষরা' লুটপাটের মাল ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিল নিজেদের মধ্যে। কৃষক ও ধীবররা ফিরে গেল নিজেদের ফুটো নৌকোতে ও ধোঁয়াভরা কুঁড়েতে।

সাইবারিসে বিরাজ করতে লাগল শান্তি ও সামঞ্জস্য। কিন্তু ক্রোটোনায় অতখানি শান্তি ছিল না। ধীবররা ও কৃষকরা গণ্ডগোল পাকাতে লাগল আর তাদের লুটের ভাগ দাবি করল।

যারা অসন্তোষ দেখাচ্ছিল তাদের মধ্যে ছিল নতুন ধনী হওয়া মানুষও, যারা কিছুকাল আগেও ছিল কুমোর বা কামার। তারাও তাদের লুটের ভাগ দাবি করল। এমন লোকও ছিল যারা পিথাগোরীয়দের দল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। হিপ্পাস নামে পিথাগোরাসের একজন সেরা শিষ্য চলে গিয়েছিল জনগণের দিকে। সংগঠনের কিছু গোপন কথা প্রকাশ করেছিল বলে সে ইউনিয়ন থেকে বহিষ্কৃত হয়। নিজের বইতে সে লিখেছে যে পিথাগোরাসের গণিত-ব্যবস্থা সবসময়ে কাজের নয়। সে দেখিয়েছে যে 'অযৌক্তিক' সংখ্যাও থেকে গিয়েছে যাদের শুরু একক বা এক নয়।

অতএব পিথাগোরাস কর্তৃক হিপ্পাস বহিষ্কৃত হয়। হিপ্পাসের নামে তারা স্মৃতিস্তম্ভ তোলে, যেন সে মারা গিয়েছে। কিন্তু সে মারা যায়নি, জনসভায় সে আসতে লাগল আর দাবি তুলল যে পিথাগোরীয়দের বহিষ্কার করা হোক। পিথাগোরাসের পুণ্য-বাণী সে পড়ে শোনাতে লাগল, যাতে ছিল পিথাগোরীয়দের নিজেদের মুখ থেকেই নিজেদের নিন্দা।

ক্রোটোনা নগর থেকে পিথাগোরাস পালিয়ে গেলেন। তাঁর অনুগামীরা বলে বেড়াতে লাগল, এ হচ্ছে দেবতাদের অলৌকিক কাণ্ড-কারখানা ও সংকেত। যখন তিনি একটা নদী পার হচ্ছিলেন, একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'এই যে, পিথাগোরাস'। পিথাগোরাস ততোক্ষণে চলে গিয়েছেন অনেক দূরে, প্রোপোনটাস-এ। কিন্তু হঠাৎ আবার তাকে দেখা গেল ক্রোটোনায়।

বোঝা গেল, সবকিছু শেষ হয়ে গিয়েছে তা নয়। দেবতারা কখনোই 'সেরা মানুষদের' ওপরে জনতার জয় ঘটতে দিতে পারে না। পিথাগোরাস তাঁর শিষ্যদের বলতেন 'সেরা মানুষ'।

পিথাগোরীয়রা রাত্রিবেলা এসে জড়ো হতো তাদের নেতা মাইলনের বাড়িতে। কিন্তু শত্রুরা এই সভার আঁচ পেয়ে গেল এবং জ্বলন্ত মশাল হাতে চারদিক থেকে তাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আগুন লাগিয়ে দিল বাড়িতে। পিথাগোরীয়রা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। তারা বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতে গিয়ে আরো গোলমালের মধ্যে পড়ে গেল যেন। তাদের মধ্যে দুজন ছিল যারা খুব ভালো দৌড়তে পারত, তারা পালিয়ে যেতে পেরেছিল—আর সকলেই হারিয়ে গেল। পিথাগোরাস যে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও শৃঙ্খলাপূর্ণ জগতের আশ্বাস দিতেন তার সঙ্গে এ-ব্যাপারটাকে কিছুতেই মেলানো যায় না।

নগরের পাথরের দেয়ালগুলি চূর্ণ করে ফেলা হলো। দাসত্বের নবীন ব্যবস্থা ও অভিজাতদের প্রাচীন গোষ্ঠী ব্যবস্থার মধ্যে যে সর্বাত্মক যুদ্ধ

চলছিল তারই মধ্যে ভেঙে পড়ল ও ধ্বংস হয়ে গেল প্রাচীন বিশ্বাস ও কুসংস্কারের দেয়াল।

আমরা যখন শব্দবিজ্ঞান ও অমূলদ রাশি সম্পর্কে পিথাগোরীয় উপপাদ্য অনুশীলন করি তখন ধারণা করতে পারি না এইসব অকাট্য সত্য নিয়ে কী প্রচণ্ড লড়াই হয়ে গিয়েছে। পণ্ডিতরা এমনকি সন্দেহ পোষণ করেন যে সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ সম্পর্কিত বিখ্যাত পিথাগোরীয় উপপাদ্যটির আবিষ্কারক পিথাগোরাস নিজে ছিলেন কিনা। এ-বিষয়েও তাঁরা নিশ্চিত নন যে পৃথিবী গোল এবং পৃথিবীর অবস্থান বিশ্বের কেন্দ্রে নয়, এই আবিষ্কার পিথাগোরাস নিজে করেছিলেন। সম্ভবত এই সমস্ত বিরাট আবিষ্কার পিথাগোরাসের নিজের নয়, তাঁর শিষ্যদের। তবে যাই হোক না কেন, তাঁদের কাজ বিস্মৃত হয়নি।

বছর থেকে বছরে বিজ্ঞান আরও শক্তিশালী হয়ে উঠল। অভিজাতবর্গ ও জনগণ উভয় পক্ষই চেষ্টা করতে লাগল নিজেদের সংগ্রামে বিজ্ঞানকে মিত্র হিসেবে পেতে। কেউ কেউ বিজ্ঞানের পোষকতা করল এই আশা নিয়ে যে বিজ্ঞান হয়ে উঠবে প্রাচীন পথ ও বিশ্বাসের রক্ষক। তার বদলে বিজ্ঞান আরও বড়ো হয়ে উঠে রক্ষা করার বদলে আবদ্ধকারী দেয়ালগুলিকেই ছাপিয়ে উঠল। পিথাগোরীয়রা চেষ্টা করেছিল তাদের আবিষ্কারগুলিকে আড়াল করে রাখতে—যেন একটা দুর্গের দেয়ালের পিছনে বিজ্ঞানকে আড়াল করে রাখা সম্ভব!

পিথাগোরীয়রা চেয়েছিল বিজ্ঞানকে তাদের দাস করে তুলতে, তার বদলে বিজ্ঞান তাদের করে তুলল নিজের দাস।

৩। এক খিটখিটে বুড়ো সন্ন্যাসী সম্পর্কে— যিনি মানুষকে চিন্তা করতে শিখিয়েছিলেন

প্রত্যেক মানুষের জীবনে এমন সময় আসে যখন প্রতিটি দিন একই রকম। তখন জীবনের প্রবাহ এতই স্তিমিত যে বোঝা যায় না কোন্ দিকে সেটি যাচ্ছে। মাসের পর মাস আসে, পাতা খসে পড়ে ক্যালেণ্ডার থেকে পাতা খসে পড়ে গাছ থেকে। প্রত্যেকটি শীতকে মনে হয় ঠিক আগের শীতের মতো। প্রত্যেকটি বসন্ত আসে ঠিক আগের বসন্তের আনন্দ নিয়ে। এক প্রজন্ম বৃদ্ধ হয়, তার স্থানে নেয় অন্য প্রজন্ম। নবীনদের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধরা তাদের শৈশবকাল স্মরণ করে। বাড়িগুলি আস্তে আস্তে ভেঙে পড়ে, আবার একই রকমে তৈরি হয়। নতুন বাড়ির জীবনও পুরনো বাড়ির জীবনের মতো। শান্তভাবে পার হয়ে যায় বছরের পর বছর।

তারপর আচমকা কোথা থেকে যেন ঝড় নেমে আসে আর পৃথিবীর ওপর দিয়ে প্রচণ্ড বেগে বয়ে যায়। চারদিকে তাকিয়ে তখন চোখে পড়ে পুরনো জীবনের কোনো চিহ্নই আর অবশিষ্ট নেই। জীবনের নদীর প্রবাহ এখন ধীর ও শান্ত নয়, দুরন্ত তার গতি, যা-কিছু সামনে পড়ে ওলোট-পালোট করে দিয়ে যায়। সবকিছুই অন্যরকম—দিনে দিনে শুধু নয়, ঘন্টায় ঘন্টায়। কোনো একটি পাথরও খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। একশো বছরে

জগতের যে পরিবর্তন হয় তা তার আগের হাজার বছরের পরিবর্তনের চেয়ে বেশি।

চব্বিশ-শো বছর আগে সময় ছিল ঠিক এইরকম। শতকের পর শতক ধরে খাড়া দাঁড়িয়েছিল যে-সব দেয়াল সেগুলি ভেঙে পড়ছে। দেবতারা চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে-সব পুরনো আচার, পুরনো বিশ্বাস, পুরনো বিধি, সেগুলো ধসে পড়ছে। গতকাল যা ছিল বৈধ, আজ তা অবৈধ। যা মন্দ তা ভালো, যা ভালো তা মন্দ। গতকাল যে মানুষটার কিছুই ছিল না, সে হঠাৎ ধনী। গতকাল যে ছিল ধনী আজ সে ভিখিরি। গতকালের দীনেরা আজ সম্মানিত, অন্যদিকে রাজার বংশধররা আজ হা-ঘরে।

ঘটেছিল কী? কখন তা শেষ হবে? পূর্বপুরুষদের সেই চমৎকার পুরনো দিনগুলিতে কখন আবার ফিরতে পারবে মানুষ?

সমকালের জ্ঞানী মানুষদের কাছে গিয়ে মানুষ এ-সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিল। জ্ঞানী মানুষরা ভিন্ন ভিন্ন জবাব দিয়েছিলেন।

পিথাগোরাস বলতেন জগতের সামঞ্জস্যের কথা, শত শত বছর ধরে প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলার কথা। তিনি বলতেন, এই শৃঙ্খলা অবশ্যই ফিরিয়ে আনতে হবে।

কিন্তু আরো একজন জ্ঞানী মানুষ ছিলেন, তাঁর নাম হেরাক্লিটাস। তিনি একেবারে উলটো জবাব দিয়েছিলেন।

হেরাক্লিটাসকে দেখতে হলে গভীর অরণ্যে যেতে হতো, মানুষজন থেকে লুকিয়ে যেখানে তিনি ছিলেন। তাঁর স্বদেশ এফেসাস নগর ছেড়ে এসেছিলেন তিনি, যে-এফেসাসে রাজত্ব করেছিল তাঁর বংশ। তিনি সরে এসেছিলেন সমুদ্রের ওপরে উঁচু পর্বতের মধ্যে, শিকারের দেবী আর্টেমিসের মন্দিরের কাছে। ভিনদেশীরা আসত এবং এক কোপণস্বভাব বৃদ্ধ সাধুর গল্প করত। বলত, এই সাধু মানুষজনকে আদৌ বরদাস্ত করেন না এবং প্রচন্ড ঘৃণা করেন। তাদের ভয় ছিল যে তিনি হয়তো তাদের তিরস্কার করবেন ও দূর করে তাড়িয়ে দেবেন। কুপিত এই মানুষটির কাছ থেকে আনন্দের কথা কিছু শোনা যাবে না। তাই তারা তাঁর নাম দিয়েছিল কাঁদুনে হেরাক্লিটাস। মানুষটিকে সহজে বোঝা যেত না। তিনি কথা বলতেন অন্ধকারের মধ্যে, ডেলফি নগরের দৈববাণীর মতো অস্পষ্টভাবে। তাই তাঁর আরো একটি নাম তৈরি হয়ে গিয়েছিল—অন্ধকার হেরাক্লিটাস।

কিন্তু তাঁর মন্দ স্বভাব সম্পর্কে যতোই গল্প ছড়াক, তার চেয়ে বেশি ছড়িয়েছিল তাঁর খ্যাতি। মানুষজন তাঁর কাছে আসত ভয়ে ভয়ে, কাঁপতে কাঁপতে। কিন্তু তবুও তারা আসত।

হেরাক্লিটাস বলতেন, 'চলে এসো ভিতরে, দেবতারা এখানেও আছেন।'

তারপরে শুরু হতো কথাবার্তা। আগন্তুকদের কাছ থেকে বৃদ্ধ জানতে চাইতেন এফেসাসের খবর। স্বদেশবাসীদের প্রতি তাঁর কোনো সহানুভূতি ছিল না। তাদের নতুন ব্যবস্থা নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করতেন, যে নতুন ব্যবস্থার নাম 'সমতা' আর যা নিয়ে নিজেদের সম্পর্কে তাদের এত গর্ব।

'ওদের ঘটে এতটুকু বুদ্ধি নেই। অজ্ঞ জনতা ওদের শাসন করছে। ওরা জানে না ভালো লোক থাকে অল্প কয়েকজন, খারাপ লোক বহু।' আমার কথা এই—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একজন মানুষের দাম হাজার মানুষের

চেয়ে বেশি, যদি সেই মানুষ অন্যদের চেয়ে সেরা হয়। ওরা সেরা মানুষদের এই বলে তাড়িয়ে দিচ্ছে, 'আমরা চাই না আমাদের মধ্যে সেরা মানুষ থাকুক। যদি এমন মানুষ থেকে থাকে তাহলে সে অন্য কোথাও চলে যাক। আমরা তাকে চাই না।' 'আমার উপদেশ যদি শুনতে চাও তো বলি, বুড়োগুলোকে সব খুন করে ফেল, নগরে থাকুক শুধু শিশুরা। হয়তো ওই শিশুদেরই কিছুটা বুদ্ধি থেকে থাকবে।'

আগন্তুকরা এ-ধরনের কথা শুনত আর ভয় পেয়ে যেত। তখন তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলাতে চাইত, আগেকার কালের মানুষদের রীতিনীতি নিয়ে কথা তুলত। কিন্তু সেই খিটখিটে বৃদ্ধ যতোখানি ঘৃণা নিয়ে সমকালীনদের দেখতেন, ততোখানি ঘৃণা নিয়েই দেখতেন আগেকার কালের মানুষদের। হোমার ও হেসয়েড সম্পর্কে তাঁর আপত্তি ছিল। বলতেন, হেসয়েডের ধারণা ছিল যে সে অন্য সব মানুষের চেয়ে বেশি বোঝে। কিন্তু সে এটুকুও জানত না যে দিন ও রাত্রি একই জিনিস।

দেবতাদেরও আক্রমণ করতেন হেরাক্লিটাস। রাজা ও পুরোহিতদের এই বংশধরটি থাকতেন আর্টেমিসের মন্দিরের পাশে, কিন্তু পুরনো দিনের দেবতাদের বিশ্বাস করতেন না। বলতেন, 'লোকে মূর্তির কাছে প্রার্থনা করে। তাহলে তো পাথরের দেয়ালের সঙ্গেও কথা বলা যেতে পারে।' সাধারণ ধাঁচের মানুষদের ওপর যেমন তিনি ক্ষেপা, তেমনি ক্ষেপা দার্শনিকদের ওপরেও। থালেস ছিলেন একমাত্র দার্শনিক যাঁর কিছুটা সার্থকতা তাঁর কাছে ছিল। পিথাগোরাসকে তিনি নিতান্তই তুচ্ছজ্ঞান করতেন। বলতেন, 'পিথাগোরাস মনে করে সে জ্ঞানী, কেননা সে কিছু বিজ্ঞান জানে। ওই ধরনের জ্ঞান তোমাদের কোনো কাজেই লাগবে না। তাই যদি হতো তাহলে হেসয়েড ও পিথাগোরাস ও হেকাটিয়াস ও জেনোফানেস কিছুটা শিখতে পারত।'

'তাহলে কার কাছ থেকে আমরা শিখব?' ভিনদেশীরা জিজ্ঞেস করত।

হেরাক্লিটাস বলতেন, 'আমার শিক্ষক আমার নিজের চোখ ও কান। যদি কিছু শিখতে চাও তাহলে কান পেতে শোনো আর নিজের চারদিকে তাকিয়ে দেখ। যদি সমস্ত জিনিস ধোঁয়ায় পরিণত হয় তাহলে আমরা তাদের আলাদা আলাদা করে চিনতে পারি আমাদের নাক দিয়ে। প্রকৃতির স্বর অবশ্যই আমাদের শুনতে হবে, শুধু শোনা নয়, বুঝতেও হবে। আত্মা যদি না বোঝে তাহলে সাক্ষী হিসেবে চোখ ও কান মন্দ হয়ে যায়। চোখ হচ্ছে কানের চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য সাক্ষী। কিন্তু আমরা সবসময়ে চোখকেও বিশ্বাস করতে পারি না। প্রকৃতি চায় লুকিয়ে রাখতে, অতএব আমাদের অবশ্যই প্রকৃতির রহস্য ভেদ করতে হবে। প্রকৃতির স্বর শোনো। কিন্তু মনে রেখ, বিশ্বের মতো প্রকৃতিও এক অনন্ত জগৎ। আত্মার কোনো সীমানা নেই, চারদিকে সন্ধান করেও পাওয়া যাবে না।'

সমাগত অতিথিরা দার্শনিকের প্রতিটি কথা মন দিয়ে শুনত। 'নিজের চারদিকে তাকিয়ে দেখ', তিনি বলে যেতেন, 'আর তখন তোমরা দেখতে পাবে সবকিছু চলছে, সবকিছু প্রবাহিত হচ্ছে। একই নদীতে দু-বার পা ফেলা যায় না, কেননা তাজা জল সবসময়েই বয়ে চলে যাচ্ছে। এমনকি সূর্য পর্যন্ত প্রতিদিন নতুন। এই জগতে কোথাও বিশ্রাম বা শান্তি বলে কিছু

নেই। সর্বত্রই সংগ্রাম ও যুদ্ধ। তারই ফলে কিছু লোক হয়ে যায় দাস, কিছু লোক মুক্ত। হোমার যখন বলেছিলেন, 'এমন যদি হতো যে দেবতারা ও মরণশীলরা তাদের সংগ্রাম বন্ধ করছে!' তিনি ভুল বলেছিলেন। তাই যদি হতো তাহলে সবকিছু মিলিয়ে যেত। কেননা সবকিছু আবির্ভূত হয় ও মিলিয়ে যায় সংগ্রামের জন্য। সংগ্রাম আছে বলেই জিনিসের সার্থকতা। একজনের কাছে যা মৃত্যু, অন্যজনের কাছে তা জীবন। যখন কাঠ পোড়ানো হয়, সেটা কাঠের পক্ষে মৃত্যু কিন্তু আগুনের পক্ষে জীবন।'

ঘরের ভিতরকার আগুনে হেরাক্লিটাসের মুখ জ্বলজ্বল করে উঠত। দেখা যেত তার কপালের ঘন কুঞ্চন, শক্তভাবে চেপে রাখা কঠোর ঠোঁট, কোঁকড়ানো সাদা দাড়ি।

দ্রষ্টা ও ঋষি আবার বলতেন, 'এই জগৎ দেবতার সৃষ্টি নয়, মানুষেরও নয়। এই জগৎ চিরকাল ছিল, চিরকাল আছে, চিরকাল হয়ে থাকবে এক চির-প্রজ্বলন্ত আগুন, এই জ্বলে উঠছে, এই নিবে যাচ্ছে—কড়াকড়ি এক শৃঙ্খলা অনুযায়ী। আগুন প্রথমে রূপান্তরিত হয় সমুদ্রে, তারপরে বাতাসে ও মাটিতে। তারপরে আবার সবকিছু পরিণত হয় আগুনে। এই হচ্ছে জন্ম ও মৃত্যু। এমনিভাবে সংগ্রামশীল উপাদানগুলো জগতের সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে। জগৎ হচ্ছে বীণার তারের মতো। আমরা যখন বীণা বাজাই তখন বীণার তার একবার টেনে ধরি, একবার আলগা করে দিই। এই টেনে ধরা ও আলগা করে দেওয়ার মধ্যে আমরা পাই সামঞ্জস্য। জগৎ বিশৃঙ্খলা নয়, জগৎ সামঞ্জস্য। যা দেখে মনে হয় বিশৃঙ্খলা তা আসলে কড়াকড়ি শৃঙ্খলা। সবকিছু চালনা করে প্রয়োজন। প্রয়োজনের তাড়নায় পশু হাজির হয় খাদ্যের কাছে। সূর্য পর্যন্ত তার নির্দিষ্ট পথ থেকে বাইরে আসতে পারে না।...'

ইতিমধ্যে সূর্য পশ্চিমে অস্ত যাচ্ছিল। অতিথিরা বিদায় নিল। তারা সঙ্গে নিয়ে চলেছে এমন একটি দান যার ওজন কিছু নয়, কিন্তু ভারী সোনার চেয়েও যা মূল্যবান। এই দান নতুন চিন্তার, নতুন উপলব্ধির। তাদের জিজ্ঞেস করতে হয়নি, তার আগেই তারা তাদের প্রশ্নের জবাব শুনেছে। পুরনো ধরনের চিন্তায় আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। বিদায় নিয়ে যখন তারা বেরিয়ে আসছিল, নতুন একদল অতিথি সবে পৌঁছেছে— কলকল করতে করতে একদল ছেলেমেয়ে। ওরা এসেছে হেরাক্লিটাসের সঙ্গে গুলি খেলতে, আগের দিনও এসেছিল। বৃদ্ধ ওদের সাদরে ডেকে নিলেন, কেননা শিশুদের তিনি ভালোবাসতেন। বলতেন, শিশুরা হচ্ছে জগতের আশা, চিরন্তন হয়ে-ওঠা, জগতের ভবিষ্যৎ শাসক।

অতএব, এখানে এই অরণ্যে, জনবসতি থেকে দূরে, নতুন এক শিক্ষা পরিণতি লাভ করছিল। পুরনো ধারণাকে উৎখাত করবে এই নতুন চিন্তা। জগৎ চালিত হয় অমোঘ প্রয়োজনের দ্বারা। নতুন এই শাসককে কী নাম দেবে মানুষ? জিউস বলা যায় কি? না, ওই নাম দিলে একেবারে সেই পুরনো চিন্তাতেই, সেই পুরনো দেবতাতেই ফিরে যেতে হবে।

উপযুক্ত একটা নাম ভাববার চেষ্টা করলেন হেরাক্লিটাস। 'কসমস' (ব্রহ্মাণ্ড) নাম দিলে কেমন হয়—যার অর্থ 'জগৎ ব্যবস্থা' বা 'লোগোস', 'বিধি', 'শব্দ' ও 'যুক্তি'?

পুরনো শব্দে নতুন চিন্তা প্রকাশ করা শক্ত। হেরাক্লিটাস শেষপর্যন্ত স্হির করলেন নতুন ব্যবস্হার নাম 'লোগোস' হলেই সবচেয়ে ভালো হয়, যে নতুন ব্যবস্হা পাওয়া গিয়েছে যুক্তির মধ্যে দিয়ে, যে নতুন ব্যবস্হার কাছে মানুষের যুক্তি ও প্রকৃতি দুই-ই গৌণ। পুরনো এক কাহিনীতে বলা হয়েছে প্রমিথিউস কেমনভাবে দেবতাদের কাছ থেকে আগুন চুরি করে এনে মানুষকে দিয়েছিল এবং জিউস সেজন্য তাকে ককেসাসের একটা শিলার সঙ্গে পাথর দিয়ে বেঁধে রেখেছিল। কিন্তু তাই বলে প্রমিথিউস হতাশ হয়নি। সে জানত জিউসকেও প্রতিফল পেতে হবে, এই জগতে শবাশ্বত বলে কিছু নেই। জিউসের সঙ্গে সমুদ্রের দেবীর বিয়ে হতে চলেছে। তাদের একটি পুত্র হবে এবং এই পুত্র বড়ো হয়ে তার পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করবে।

এই ছিল প্রাচীন ঐতিহ্য এবং সময় আসছে যখন তা পূর্ণতা লাভ করবে। সমুদ্রের তীরে, মাইলেটাস ও এফেসাসের কোলাহলমুখর বন্দরের একেবারে পাশটিতেই, সেই শক্তির উদয় হচ্ছে যে জিউসকে উৎখাত করবে। তার নাম 'লোগোস'। তার পুরোহিতদের নাম 'দার্শনিক', যার অর্থ 'জ্ঞান-অনুরাগী'।

দিনের পর দিন হেরাক্লিটাস তাঁর চিন্তাগুলি লিখে রেখেছিলেন এবং গোল করে পাকানো লেখার পাতাগুলি লুকিয়ে রেখেছিলেন আর্টেমিসের মন্দিরে। ওই পাতাগুলি ওখানেই থাকুক। ওখানে থাকলে শুধু যারা দলে এসেছে তাদেরই হাতে পড়বে। সাধারণ লোকের কাছে ওগুলি মনে হবে অন্ধকার, যদিও ওগুলি দিনের মতোই স্বচ্ছ। জ্ঞানের এই ভান্ডার সাধারণ মানুষদের জন্য নয়। ওরা জ্ঞান চায় না। ওরা বলে, এসব লেখা নিয়ে আমাদের কী দরকার? গাধার মতো, সোনার চেয়ে খড় ওদের বেশি পছন্দ।

'ওরা সমস্ত কিছু ভাগ করে নেয় এবং নির্দিষ্ট একটি নিয়মে রেখে দেয়—সিন্দুকের মধ্যে তুলে রাখা জিনিসের মতো। সবকিছুকে ভাগ করে নিচ্ছে—এটা ভালো এটা মন্দ, এটা অন্ধকার এটা আলো। কিন্তু কে না জানে, নোনা জল মাছের পক্ষে ভালো, মানুষের পক্ষে নয়। শুয়োর কাদায় গড়াগড়ি দেয়, শুয়োরের কাছে কাদা নোংরা নয়। সবচেয়ে সুন্দর যে বানর, মানুষের সঙ্গে তুলনা করলে সে কুৎসিত। স্বাধীন মানুষের কাছে যা শুভ, দাসের কাছে তা অশুভ। লোকে এখনো এটা বোঝে না। ওদের এই উপলব্ধি নেই যে আলো যদি না থাকে তাহলে অন্ধকার সম্পর্কে আমরা ধারণাই করতে পারি না। মিথ্যা যদি না থাকে তো সত্য থাকতে পারে না। স্বাস্হ্য বলতে আমরা কী বুঝি সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই থাকত না যদি-না অসুখ থাকত। বৃত্তের পরিধিতে যেখানে শেষ সেখানেই শুরু, যেখানে শুরু সেখানেই শেষ। আগুনের মৃত্যু হলে জলের জন্ম হয়, জলের মৃত্যু হলে বাষ্পের জন্ম হয়। আমরা আছি এবং আমরা নেই। প্রতি মুহূর্তে আমরা অন্য কেউ।'

হেরাক্লিটাস এমনি ভাবতেন। কিন্তু তিনি জানতেন সাধারণ লোক তাঁর কথা বুঝবে না। ওরা বড়ো হয়েছে এক ক্ষুদ্র সংকীর্ণ জগতে। যদিও জগৎ আরো বড়ো হয়ে গিয়েছে কিন্তু ওদের আত্মা থেকে গিয়েছে আগেকার মতোই সংকীর্ণ। মনের পরিবর্তন ঘটাতে ওরা অসমর্থ। ওরা শুধু জানে ওদের নিজেদের সত্য এবং কখনো সন্দেহ করে না যে সবকিছু অন্য দিক

থেকে দেখা যেতে পারে। কাজেই ওদের কাছে এমন সব কথা বলে লাভ কি, যখন ওরা জানেই না কী নিয়ে কথা হচ্ছে। আর বাস্তবিকপক্ষে এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করলে ওরা কিছুই লাভ করতে পারবে না। ওদের আগ্রহ শুধু এই বিষয়ে যে কী-ভাবে পেট ভরানো যায়।

তাই এই বৃদ্ধ সাধু গালিগালাজ করতেন মানুষদের। তা সত্ত্বেও একথা বলতে হয়, মানবজাতির প্রতি বাহ্যত এই ঘৃণা সত্ত্বেও তাঁর ছিল মানবজাতির প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা। মানবজাতির জন্যই যদি না হবে তাহলে কার জন্য সত্যের সন্ধান করছিলেন? কয়েক শতাব্দী লেগে যাবে মানুষের এই ধারণা লাভ করতে এবং তিনি যে মাঝেমাঝে অসংগত ভর্ৎসনা করতেন তা অনুধাবন ও উপেক্ষা করতে।

৪। যে লরেল-মুকুট সময়ের আগেই দেওয়া হয়েছিল

এমনি ছিল হেরাক্লিটাসের জীবন—যেন জগতের আর সবাই অন্ধ, একমাত্র তিনি দেখতে পান।

কিন্তু আরো সব দার্শনিক ছিলেন যাঁরা লোকজনের মধ্যে থাকতেন এবং তাদের জ্ঞান দেবার জন্য নিজেদের সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করতেন।

এমনি একজন মানুষ ছিলেন এম্‌পিডোক্লিস।

যেমন হেরাক্লিটাসের, তেমনি তাঁরও পূর্বপুরুষরা রাজবংশের। সিসিলির অ্যাগিজেন্‌টাম নগরে তাঁরা রাজত্ব করতেন। সেখানে সমুদ্রের অনেক ওপরে একটা দুর্গের মধ্যে তাঁরা রাজদরবার বসাতেন ও হুকুম চালাতেন। রক্তবেগুনী রঙের পোশাক পরে ও রাজদণ্ড হাতে নিয়ে তাঁরা দেবতাদের কাছে পুজো দিতেন।

এই দুর্গের দেয়ালের পিছনে এম্‌পিডোক্লিস জন্মেছিলেন ও বড়ো হয়েছিলেন। কিন্তু রাজদণ্ড তিনি গ্রহণ করেননি। ভীষণ অপছন্দ করতেন দুর্গের উঁচু উঁচু দেয়ালগুলিকে। এই দেয়ালগুলি থাকার জন্যই দুর্গ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল নগরের হাটবাজার থেকে, কোলাহলমুখর এলাকা থেকে—যেখানে শোনা যায় কামারশালার হাপরের গুনগুন আর ছুতোরের হাতুড়ির ঠুকঠুক। তিনি চাইতেন নগরদুর্গে রাজত্ব করুক রাজারা নয়—সাধারণ মানুষরা ও শ্রমিকরা। আর বাস্তবিকপক্ষে রাজাদের সেই আগেকার কালের ক্ষমতা তখন মিথ্যে হয়ে গিয়েছিল, কেননা শাসনক্ষমতা চলে গিয়েছিল গোটাকতক ধনী পরিবারের হাতে।

এই উন্নাসিক অভিজাতদের এম্‌পিডোক্লিস ঘৃণা করতেন। তিনি চাইতেন সকল স্বাধীন নাগরিকের সমতা। তাঁর জীবনকালেই এই সমতা অর্জিত হয়েছিল। দীর্ঘ সংগ্রামের পরে অভিজাতদের পরাস্ত করে জনগণ বিজয়ী হয়েছিল। এই সমতা যাতে খোয়া না যায় সেটা নিশ্চিত করার জন্য তিনি নজর রেখেছিলেন। একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি ক্ষমতা দখল করে একনায়ক হবার চেষ্টা করেছিল। তাতে তিনি দাবি তুললেন যে লোকটিকে এবং যারা তার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক।

প্রকাশ্য সমাবেশে ভাষণ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, সেই মানুষ অতি নিকৃষ্ট যে ভাবে অন্য মানুষের চেয়ে সে সেরা।

নিজের সমস্ত প্রতিভা তিনি নিয়োজিত করেছিলেন জনসাধারণের সেবায়।

লোকের মুখে তাঁর সম্পর্কে ছোট একটি কাহিনী শোনা যেত, সেটি এই : নদীর জল দূষিত হওয়ার দরুন একবার সেলিনান্টা নগরে প্লেগের প্রকোপ হয়েছিল। এম্পিডোক্লিস করলেন কি, কাছাকাছি অন্য দুটি নদীর জল এই নদীতে ঘুরিয়ে এই নদীর জল শোধন করার কাজে লেগে পড়লেন। ফলে জল আবার স্বাস্থ্যকর হয়ে উঠল এবং প্লেগ দূর হলো। প্লেগ দূর হওয়ার জন্য সেলিনুন্টার মানুষরা যখন নদীর তীরে উৎসব করছিল ঘটনাক্রমে এম্পিডোক্লিসও সেখানে এসেছিলেন। সমস্ত মানুষ নতজানু হয়ে তাঁকে দেবতা হিসেবে পুজো করল।

তাঁর সম্পর্কে আরো একটি গল্প আছে। গল্পে বলা হয়েছে, সমুদ্র থেকে খারাপ বাতাস আসছিল, সেই বাতাস তিনি কেমনভাবে বন্ধ করেছিলেন। খারাপ বাতাস বাগানের সর্বনাশ করছিল, আর যে রাস্তা দিয়ে সেই বাতাস বয়ে যাচ্ছিল সেই রাস্তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। সবাইকে তিনি বললেন তারা যেন গাধার চামড়া দিয়ে বড়ো বড়ো পর্দা তৈরি করে দেয়। সেই পর্দাগুলি তিনি বেঁধে দিলেন পাহাড়ের মাথায় ও উঁচু উঁচু পর্বতের চুড়োয়। এমনিভাবে খারাপ বাতাস বন্ধ করে দিলেন। এই গল্পের অন্য একটি ভাষ্য আছে, তাতে বলা হয়েছে—দক্ষিণের বাতাস যে-রাস্তা দিয়ে বয়ে যেত সেই রাস্তায় দেয়াল তুলে তিনি বাতাস আটক করেছিলেন। গল্প যাই হোক, এম্পিডোক্লিস এমন কিছু করেছিলেন যাতে ক্ষেতের ফসল বেঁচেছিল। তারপর থেকে তাঁর নাম হয়ে গেল 'বায়ুপ্রভু'।

আরো বলা হতো যে স্বয়ং মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াই করার সাহস তিনি দেখিয়েছিলেন এবং পাতালে নেমে গিয়েছিলেন ও পাতালের ছায়াদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে আবার ফিরে এসেছিলেন। এক ধরনের রোগ ছিল যাতে রোগী দিনের পর দিন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকত, এমনকি তার নিশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যেত, তার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থাকত না। অ্যাগিজেন্টামের একটি স্ত্রীলোককে এই রোগে ধরেছিল। তিরিশ দিন ধরে তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে ছিল। এম্পিডোক্লিস তার জীবন ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন।

নগর থেকে নগরে তিনি ঘুরে বেড়াতেন। সর্বত্রই তাঁকে ঘিরে লোকের ভিড় জমে যেত, সবাই সাহায্য চাইত তাঁর কাছে—কেউ রোগে ভুগছে, কেউ সত্যের পথের সন্ধান চাইছে।

তাঁর পরনে থাকত রাজকীয় পোশাক, সোনালী কটিবন্ধসহ রক্তবর্ণ আঙরাখা। পায়ে থাকত তামার পাদুকা। মাথায় থাকত পাতায় গাঁথা বিজয়-মুকুট।

তিনি ছিলেন নেতা, কিন্তু সৈন্যদলের নেতা নন। মূক দুঃখভোগীর দল তাঁকে ঘিরে থাকত। অ্যাগিজেন্টামের দুর্গের চকচকে আঙিনায় তাঁকে দেখা যেত না। দেখা যেত গরিবের কুঁড়েঘরে, নগরের উপকণ্ঠে ধুলোভরা রাস্তায়।

তিনি ছিলেন বিজয়ী—তাঁর পূর্বপুরুষদের মতো মল্লভূমিতে নয়,

অন্য রাজ্যের নগরের ভিতরে রক্তাক্ত লড়াইয়ে নয়। তাঁর জয়লাভ ঝড় ও ঝঞ্ঝার বিরুদ্ধে, নদীর খরস্রোতের বিরুদ্ধে, প্লেগের অদৃশ্য বিষের বিরুদ্ধে, মৃত্যুর গূঢ় শক্তির বিরুদ্ধে। সাধারণ মানুষের কাছে তিনি ছিলেন মানুষ নন, দেবতা। তিনি জানতেন অন্য সকল শক্তির চেয়ে বড়ো শক্তি হচ্ছে যুক্তি। কিন্তু কখনো গর্ব করতেন না যে তাঁর জ্ঞান অনেক বেশি। বলতেন, 'এইসব হতভাগ্যরা, যারা পায়ে পায়ে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের মুখোমুখি হচ্ছে, তাদের চেয়ে আমি যে অনেক উন্নত সেটা আমার পক্ষে গর্বের বিষয় নয়।'

তিনি ছিলেন ঋষি। 'প্রকৃতি সম্পর্কে' একটি কবিতা লিখেছিলেন।

তিনি তাঁর জ্ঞান গোপন করেননি, বরং চেষ্টা করেছিলেন তাঁর জ্ঞানের ভাগ সবাইকে দিতে।

শোনা যেত, তরুণ বয়সে তিনি নাকি পিথাগোরীয় ইউনিয়ন থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন, কিছু গোপন কথা প্রকাশ করার জন্য।

তিনি বলতেন, 'মানুষের মাথায় নতুন ধারণা ঢোকানো শক্ত।' কিন্তু হাল ছেড়ে দেননি। মানুষের সঙ্গে থাকতেন, মানুষকে শেখাতে চেষ্টা করতেন—যাতে বিজ্ঞানের প্রসার হয়।

কী শেখাতেন তিনি?

থালেস, আনাক্সিমান্দের, আনাক্সিমেনেস ও হেরাক্লিটাসের শিক্ষার ধারাকে বজায় রেখেছিলেন তিনি।

তিনি বলতেন, 'চারটি মূল বা চারটি উপাদান আছে যা থেকে সবকিছুর সৃষ্টি। এই চারটি মূল বা উপাদান হচ্ছে আগুন, জল, মাটি ও বাতাস। এই চারটি থেকেই সবকিছু গড়ে ওঠে, কোনো একটির সঙ্গে আরেকটি যুক্ত হয়ে বা বিচ্ছিন্ন হয়ে। যুক্ত হলে সৃষ্টি হয়, বিচ্ছিন্ন হলে ধ্বংস হয়। সবকিছু—যা ছিল, যা আছে, যা হবে—এইভাবে সৃষ্ট। কোনো কিছু কখনো ধ্বংস হয় না, কোনোকিছুর শূন্য থেকে সৃষ্টি করতে পারে না। লোকে যাকে জন্ম ও মৃত্যু বলে তা যুক্ত হওয়া বা বিচ্ছিন্ন হওয়া ছাড়া কিছু নয়।

'চিরকাল এমনি হয়ে এসেছে—এই যখন বহু থেকে বেরিয়ে সংযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, এই আবার বহুর মধ্যে গিয়ে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। এমন একটা সময় ছিল যখন সূর্যের জ্বলন্ত মুখ দেখা যেত না। দেখা যেত না পৃথিবীর লোমশ গা বা বিশাল ঢেউ তোলা সমুদ্র। ঘৃণার তাড়নায় সবকিছু বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ছিল না ভালোবাসা, না এমন কিছু যা দিয়ে জিনিসকে একসঙ্গে এ'টে ধরা যেতে পারে।

'কিন্তু ভালোবাসা ঘৃণার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যায়। ভালোবাসা পৃথক পৃথক উপাদানকে সংযুক্ত করে বস্তুর আকার দেয়। যেমন একজন শিল্পী তার রঙ দিয়ে সম্পূর্ণ একটি জগৎ সৃষ্টি করে থাকে, যে জগতে আছে মানুষ, গাছ, পাখি ও মাছ। এমনিভাবেই সৃষ্টি হয়েছিল জ্বলন্ত সূর্য, ম্লান চন্দ্র যা থেকে সূর্যের কিরণ প্রতিফলিত হয়, বিরাট আকাশ ও মাটির ওপরে বাষ্প হয়ে উবে যাওয়া সমুদ্র। সকল জীবন্ত জিনিসও সৃষ্টি হয়েছে এই চারটি উপাদান যুক্ত হয়ে। গোড়ার দিকে চারদিকে ছড়ানো ছিটানো ছিল প্রচুর ধড়বিহীন আলগা আলগা মাথা। তারপরে দেখা গেল নানা রকমের অদ্ভুত অদ্ভুত জোড়—মানুষের ধড়ের ওপরে ষাঁড়ের মাথা, ষাঁড়ের ধড়ের

ওপরে মানুষের মাথা। কিন্তু এই দানবগুলি বিলীন হয়ে গেল। টিকে থাকল শুধু তারাই যারা ছিল টিকে থাকার উপযোগী।

'জগৎ তৈরি হয়েছে উপাদান দিয়ে, যেমন গৃহ তৈরি হয়েছে ইঁট দিয়ে। সময় আসবে যখন ঘৃণা আবার জয় করে নেবে ভালোবাসাকে। এবং সমস্ত উপাদান ছড়িয়ে দেবে। সমস্ত কাঠামো ভেঙে পড়বে। সবকিছু আবার শুরু হবে শুরু থেকে। এমনি চলতে থাকবে চিরকাল। এই এখন ভালোবাসা উপাদানগুলিকে যুক্ত করছে। এই আবার ঘৃণার উপাদানগুলিকে সকল দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে।'

এম্‌পিডোক্লিসের কথা লোকে শুনত কিন্তু ঠিকমতো বুঝতে পারত না। তারা ভাবতে অভ্যস্ত ছিল যে দেবতারা সৃষ্টি করেছে এই পৃথিবী, এই আকাশ এবং তার মধ্যে আর যা কিছু আছে সব। সৃষ্টি করেছে জীবও। এম্‌পিডোক্লিস বললেন, সবকিছু ঘটছে প্রয়োজন অনুযায়ী, দেবতাদের ইচ্ছা অনুযায়ী নয়। ঘটছে নিজের থেকেই, উপাদানগুলির সংযোগ ঘটার ফলে।

এম্‌পিডোক্লিস মারা যাবার বহুকাল পরেও লোকে বিশ্বাস করত না যে তিনি মারা গিয়েছেন। তাঁর শেষ সময় সম্পর্কে অ্যাগিজেন্‌টামে লোকে যে কাহিনী বলত তা এই : একদিন সন্ধেবেলা তিনি বন্ধুদের নিয়ে টেবিলের সামনে বসে আছেন, এমন সময়ে আচমকা সবাই দেখল আকাশে একটা আলো আর মশালের শিখা। তারা শুনতে পেল বিরাট এক কণ্ঠস্বর এম্‌পিডোক্লিসকে ডাকছে। তারপরে অন্ধকার হয়ে গেল ও আর কিছু শোনা গেল না। কিন্তু এম্‌পিডোক্লিস একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন তারা সিদ্ধান্ত করল যে এম্‌পিডোক্লিস নিশ্চয়ই দেবোপম, অতএব দেবতাদের বেলায় যেমন করা হয় তেমনি তাঁকেও পুজো করা দরকার ও তাঁর কাছে প্রার্থনা করা দরকার।

তাঁর সম্পর্কে আরো একটি কাহিনী আছে। যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর সময় এসে গিয়েছে, তিনি মাউন্ট এট্‌নায় ঝাঁপ দিলেন ও আগ্নেয়-গিরির আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন। এই কাহিনী প্রচলিত হয়েছিল এই কারণে যে তাঁর একটি তামার পাদুকা আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

কিন্তু আসলে কী হয়েছিল? এম্‌পিডোক্লিসকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল এবং দেশের বাইরে তিনি মারা গিয়েছিলেন। অভিজাতদের দল আবার মাথা তুলেছিল ও জনসাধারণের কাঁধের ওপরে ভারী জোয়াল চাপিয়েছিল। এম্‌পিডোক্লিসকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল নগরের বাইরে। পেলোপোনেসাসের অচেনা পর্বতে আধা-বর্বর মেষপালকদের মধ্যে তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন।

জীবনের শেষদিকে কয়েকটি বিষাদভরা গান গেয়েছিলেন তিনি : 'এত বেশি সম্মান ও এত বেশি সুখের পরে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি মৃত্যুর দুর্লক্ষণ চিহ্নিত প্রান্তরে এবং দেখছি অনেক হত্যা ও পীড়া ও প্লেগ, যা এই অভাগা দেশকে ছেয়ে আছে। দেখে দুঃখ পাচ্ছি।'

একটা সময় ছিল যখন তিনি ভাবতেন যে এই সমস্ত পীড়া চিরকালের মতো দূর করা হয়েছে। বাতাসকে বশে রাখতেন, মৃত্যু ছিল তাঁর পদানত।

সে-সব কী সুখের ও গর্বের দিন গিয়েছে! দেশের মানুষকে কত-কি আশ্বাস দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'পীড়া ও বার্ধক্যের নিরাময় এই জগতে আছে, তোমরা সমস্তই জানতে পারবে। সে-সম্পর্কে আমি তোমাদের বলব। আমি তোমাদের জ্ঞান দেব কি-ভাবে প্রয়োজন অনুযায়ী আবহাওয়া বদলানো যায়, খরা বন্ধ করা যায়, ক্ষেতে সেচ করা যায়, আর পাতাল থেকে মৃতদের আত্মা ডেকে ফিরিয়ে আনা যায়।' তাঁর ছিল কবির ও দ্রষ্টার চোখ, তিনি আগে থেকেই দেখতে পেয়েছিলেন প্রকৃতির ওপরে মানুষের বিজয় এবং ভাবতেন যে এই বিজয় নিকট ভবিষ্যতেই ঘটতে চলেছে।

বিজয়ীর জয়মাল্য তিনি পরেছিলেন। লোকে তাঁর কাছে নতজানু হতো —যেমন হতো দেবতার কাছে। তবুও এই বিজয় নিয়ে উৎসব করার সময় এখনো আসেনি। নির্বাসনের অন্ধকার দিনগুলিতে এম্‌পিডোক্লিস কথাটা বুঝতে পেরেছিলেন।

মৃত্যুর সময়ে কয়েকটি মর্মভেদী কথা বেরিয়ে এসেছিল তাঁর মুখ থেকে : 'তোমরা নিপাত যাও, তোমরা মরো, হতভাগার দল! কী কলহ আর যন্ত্রণা থেকেই না তোমাদের জন্ম!

এম্‌পিডোক্লিস যা-কিছু শিখিয়েছিলেন, বস্তুতপক্ষে তার জন্ম হয়েছিল পুরনো ও নতুনের মধ্যে সংঘর্ষ ও সংগ্রামের মধ্যে থেকে। এই সংগ্রাম চলেছিল তাঁর নিজের মনের মধ্যে, তাঁর নিজের নগরে, সারা গ্রীসে। তাই তাঁর বইগুলিতে নতুন বিজ্ঞান মিশে গিয়েছে প্রাচীন কুহকবিদ্যার সঙ্গে। বিজ্ঞানের উদ্দেশে তিনি নিবেদন করেছিলেন একটি কবিতা : 'প্রকৃতি সম্পর্কে'। যাদুর উদ্দেশে আরেকটি কবিতা : 'শুদ্ধীকরণ'। দেবতাদের বর্জন করেছিলেন, কিন্তু তাঁর কবিতায় আমরা জিউস ও হিরার নাম পাই। দেবতাদের নামে উপাদানগুলির নাম দিয়েছিলেন।

প্রকৃত বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি বিশ্বাস করতেন যে আমাদের বোধ ও তার সহায়ক মন দিয়ে যে জগতকে আমরা অবলোকন করি তা বাস্তব জগৎ। কিন্তু তিনি বিজ্ঞানকে বর্জন করেছিলেন যখন পিথাগোরাসকে অনুসরণ করে এই শিক্ষা দিয়েছিলেন যে আত্মার অবস্থান অন্য এক উৎকৃষ্টতর জগতে, এই পৃথিবী এক নিরানন্দ বিদেশ যেখানে আত্মা পূর্ববর্তী জীবনে কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে।

এমনি মানুষ ছিলেন এম্‌পিডোক্লিস। তিনি ছিলেন রাজার বংশধর কিন্তু হয়ে উঠেছিলেন অভিজাতদের শত্রু। ছিলেন যাদুকর কিন্তু হয়ে উঠেছিলেন বিজ্ঞানী। ছিলেন পিথাগোরাসের দলভুক্ত কিন্তু হয়ে উঠেছিলেন থালেস ও হেরাক্লিটাসের অনুগামী।

তাঁর সমকালীনরা ভাবত এম্‌পিডোক্লিস অন্য সকলের চেয়ে বড়ো, যেমন বড়ো মানুষের কাছে দেবতা। কিন্তু তিনি ছিলেন মানুষ, এমন এক সময়ের মানুষ যখন বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সংগ্রাম ক্রমেই তীব্রতর হয়ে উঠছিল। বিজ্ঞান ও যাদুর মধ্যে কোনো একটিকে তিনি নির্দিষ্টভাবে বেছে নিয়েছিলেন তা নয়। তবুও আমরা তাঁকে স্মরণ করি একজন বিজ্ঞানী হিসেবে। কেননা মানুষ অনেক দূরের তত্ত্বের দিকে এক পা এগিয়ে যেতে পেরেছিল যখন এম্‌পিডোক্লিস তাঁর এই তত্ত্ব গড়ে তুলেছিলেন যে সবকিছু তৈরি হয় উপাদান থেকে, সবকিছু ভাগ হয়ে যায় উপাদানের মধ্যে।

তৃতীয় অধ্যায়

জয় ও পরাজয়

১। পর্যটক হিরোডোটাসের সঙ্গে পাঠকের দেখা হচ্ছে এবং বন্দরে-প্রত্যাগত নাবিকদের কাহিনী শোনা যাচ্ছে

মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যায় প্রথম বিজ্ঞানীদের ও প্রথম দার্শনিকদের যেখানে জন্ম সেই নগরগুলি একে অপরের কত কাছাকাছি।

মাইলেটাসের কাছেই ছিল হালিকারনেসাস। এখানেই ঐতিহাসিক হিরোডোটাসের জন্ম। তার ঠিক পাশটিতেই ছিল সামোস দ্বীপ যেখানে পিথাগোরাসের জন্ম। সামোস থেকে অল্প কিছুটা দূরে, উপসাগর পেরিয়ে, ছিল এফিসাস। সেখানে আর্টেমিস কুঞ্জে বাস করতেন হেরাক্লিটাস। এফিসাস থেকে মাত্র তিনঘন্টার হাঁটাপথ দূরে ছিল কোলোফোন যেখানে ভ্রাম্যমাণ চারণকবি জেনোফানেস বাস করতেন। কোলোফোন থেকে অল্প দূরেই ছিল ক্লাজোমেন। সেখানে বাস করতেন দার্শনিক আনাক্সাগোরাস।

এঁরা ছিলেন সমসাময়িক। থালেস ও আনাক্সিমান্দের-এর জীবনের সেরা বছরগুলি কেটেছিল খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। আনাক্সিমানেস ছিলেন আনাক্সিমান্দেরের শিষ্য। তিনি পিথাগোরাস ও থালেসের পৌত্র হতে পারতেন। এঁরা সবাই খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর। আমাদের পরিচিত ঋষি হেরাক্লিটাস তখনো শিশু যখন পিথাগোরাস একেবারেই বৃদ্ধ। আনাক্সোগোরাস ও হিরোডোটাসের বয়সও তখন খুব বেশি নয়। তাঁরা খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর মানুষ।

এঁরা সকলেই বাস করতেন পৃথিবীর ছোট একটি অংশে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁরা সেই ছোট অংশটুকুকে সবচেয়ে বেশি মর্যাদামণ্ডিত করেছিলেন।

বিজ্ঞানের শুরু এখানে। দুই শতাব্দী ও বহু দেশের মিলনস্থলে পরস্পরের সংস্পর্শে এসেছিল বিভিন্ন রীতিনীতি ও বিশ্বাস। বিনিময় করা হয়েছিল শুধু জিনিস নয়, চিন্তাও। কিন্তু সময়টা ছিল বড়ো কঠোর।

পূব থেকে আক্রমণকারীদের বিরাট বাহিনী দেশকে গ্রাস করেছিল। ঠিক যখন খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দীর মিলন হয় তখন 'রাজাদের রাজা' পারস্যের রাজা এশিয়া মাইনরকে যুদ্ধে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। নগরের পর নগর আক্রমণকারীদের দখলে চলে গেল। যে সব সমুদ্র-পথ দিয়ে আওনীয় নগরগুলির সঙ্গে তাদের উপনিবেশগুলির যোগাযোগ থাকত সেগুলি ভেঙে দেওয়া হলো। পারসিকদের মিত্র ছিল ফিনিসীয়রা, তারা এই

নগরগুলি শাসন করত আর গ্রীকরা অনেক আগে থেকেই এই নগরগুলিকে তাদের বলে মনে করত। পারসিকদের হাতে প্রাণ হারালেন পলিক্রাটিস। তারা তাঁকে দাসের মতো ক্রুশবিদ্ধ করেছিল। মাইলেটাস চেষ্টা করেছিল এই বন্যাকে রোধ করতে। কিন্তু পরিকল্পনাটি ধরা পড়ে যায়। পরিকল্পনা-কারীদের শাস্তি দেওয়া হয় ও বিদ্রোহ দমন করা হয়। মাইলেটাসকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলা হয়েছিল।

শরণার্থীদের স্রোত পালিয়ে যায় পশ্চিমের দিকে—এথেন্সে, সিসিলিতে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের পাণ্ডুলিপি, পরিকল্পনা ও মানচিত্র, এবং সবচেয়ে যা মূল্যবান, তাঁদের বিজ্ঞান।

বর্বররা ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল এশিয়া মাইনরকে, ইউরোপ পর্যন্ত। পথের সমস্ত বাধা চূর্ণ করেছিল। আরেকটু এগিয়ে গেলেই এই জগৎ বহু শতাব্দী পিছিয়ে যেত। কিন্তু তাদের পথরোধ করে দাঁড়াল এথেন্স। শত্রুর নৌবহরকে যারা ডুবিয়ে দিয়েছিল তাদের নেতা ছিল এথেন্স। জমিতে যখন যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তখন সেখানকার নেতা ছিল এথেন্স। গ্রীসের স্বাধীনতা বাঁচিয়েছিল এথেন্স।...

জয়লাভ করার ফলে এথেন্সে সমৃদ্ধি এসেছিল। বিদেশী মালে বোঝাই হয়ে জাহাজগুলি এসে লাগত এথেন্সে, মাইলেটাসে নয়। এথেন্সের জাহাজ-ঘাটায়, কারখানাগুলিতে ও বন্দরে কাজ কখনো বন্ধ হতো না। এখানেই বাস করত সবচেয়ে দক্ষ কারিগর, কুমোর, তাঁতী, অস্ত্রনির্মাতারা। আইওনীয় নগরগুলি থেকে পালিয়ে আসার পরে বিজ্ঞানও এখানে পেল নতুন আশ্রয়। এখানেই ছিলেন হিরোডোটাস যিনি বহু দূর-দূর দেশ ভ্রমণ করেছিলেন—ফিনিসীয় বন্দর থেকে মিশরীয় পিরামিড পর্যন্ত এবং 'রাজাদের রাজা' পারস্যের রাজার রাজধানী পর্যন্ত। হিরোডোটাস নীলনদ ধরে গিয়েছিলেন। বহুকাল বাস করেছিলেন কৃষ্ণসাগরের তীরে যেখানে সিদীয় তাঁবুর সোনালী চুড়োর পাশেই দেখা যেত গ্রীক মন্দির। মন্দিরের পুরোহিতদের সঙ্গে কথা বলতেন, বন্দরের সর্দারদের কাছে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করতেন। নিজের দেশ এথেন্সে থাকার সময়ে প্রচুর সময় কাটাতেন পিরুয়াসে। সেখানে নানা দূর দূর বন্দর থেকে জাহাজ এসে নোঙর করত। বন্দরে সবসময়ে ব্যস্ততা থাকত। সিদিয়া থেকে শস্য বোঝাই হয়ে জাহাজ আসত আর মাইলেটাস থেকে পশমের কাপড় বোঝাই হয়ে ফিরে যেত। পায়ে পায়ে দেখা হয়ে যেত বিদেশীদের সঙ্গে। তাদের মিলিয়ে মিশিয়ে দিত সমুদ্র। সেই সময় পার হয়ে গিয়েছিল যখন মানুষ একই জায়গায় জীবন কাটিয়ে দিত জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও আত্মীয়পরিজনের সঙ্গে, যখন যাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হতো তাদের সম্পর্কে সবকিছু জানা থাকত, যখন কোনো পরিচিত জন না থাকলে একজন বিদেশীকে প্রাণ বাঁচাবার জন্য রক্ষাকর্তা খুঁজে বার করতে হতো।

একটা সময় ছিল যখন শহর ও গ্রামের মধ্যে কোনো তফাত ছিল না। এখন নগর দেখা দিয়েছে, নগরের কেন্দ্রস্থলের দুর্গ থেকে রাস্তা ছড়িয়েছে চারদিকে। এই নগরের সঙ্গে গ্রামের কোনো মিলই নেই।

সমুদ্র মিলিয়ে মিশিয়ে দিয়েছিল যেমন মানুষকে তেমনি জিনিসকে। আগেকার কালে কুমোররা পাত্র তৈরি করত শুধুমাত্র স্থানীয় মানুষদের

জন্য, দাসরা আঙরাখা বুনত শুধুমাত্র তাদের প্রভুদের জন্য, কামাররা তলোয়ার বানাত শুধুমাত্র নিজেদের গোষ্ঠীর যোদ্ধাদের জন্য।

এখন পেয়ালা তৈরি হচ্ছে এক নগরে আর সেটি ব্যবহার করা হচ্ছে অন্য এক নগরে। আঙরাখা বোনা হচ্ছে এথেন্সে আর সেটি পরা হচ্ছে দূর সিসিলিতে। এথেন্সে তৈরি হওয়া তলোয়ার ঝলসে উঠছে সিরিয়া বা পারস্যের কোনো এক জায়গার যোদ্ধাদের হাতে। এমন সময় ছিল যখন শাস্তির ভয় না করেই রক্ষীবিহীন বণিককে যে-কেউ অপমান করতে পারত। এখন সেই বণিককে রক্ষা করে আইন। কোনো বিদেশী যদি দাস, জাহাজ ও সোনার মালিক হয় তাহলে সে আর অপাংক্তেয় থাকে না, নগরের সেরা মানুষের সম্মান পায়। আগেকার কালে বণিকদের সবাই অবজ্ঞার চোখে দেখত। এখন অভিজাতদের বংশধররা নিজেদের জাহাজ বানাতে লজ্জা পায় না, জাহাজে মাল বোঝাই করে এবং জাহাজ ভাসিয়ে সমুদ্র পেরিয়ে বাণিজ্য করতে যায়। অভিজাতদের শাসন এথেন্সে অনেক কাল আগে থেকেই উৎখাত হয়েছে। নগরের কেন্দ্রস্থলে আগে যেখানে দাঁড়িয়ে থাকত অভিজাতদের দুর্গ, এখন সেখানে মন্দিরের মধ্যে শুধু থাকে দেবতারা।

সবকিছুর সিদ্ধান্ত হতো লোকসভায়। বণিক, তাঁতী, কুমোর ও চর্মশ্রমিকদের নিয়ে লোকসভা গঠিত হতো।

ভোর হলেই লোকে ছুটত বাজারের দিকে সর্বশেষ খবর শোনার জন্য। নাপিতের দোকানে লোকে আলোচনা করত আগের দিন সন্ধ্যায় কোনো একজন বাগ্মী লোকসভায় যে ভাষণ দিয়েছেন তাই নিয়ে। ততোক্ষণ নাপিত তার ক্ষুরে ধার দিচ্ছিল। এমনি চলত দুপুর পর্যন্ত। তারপরে তাপ থেকে বাঁচবার জন্য লোকে কোনো একটা ছাউনির নিচে ছায়ায় আশ্রয় নিত। এই ভিড়ের মধ্যে থাকতেন হিরোডোটাস। একটা বেঞ্চির ওপরে বসে তিনি কথা বলতেন দূরের কোনো দেশ থেকে সদ্য ফিরে আসা কোনো সর্দারের সঙ্গে। যা শুনতেন বাড়ি ফিরে গিয়ে লিখে রাখতেন। এই সমস্ত লেখা ও মন্তব্য রেখে দিয়েছিলেন এবং ক্রমে সেগুলি বই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর বই পড়লে খুব ভালোভাবে জানা যায় ফিরে-আসা নাবিকরা কী নিয়ে কথা বলত। জগতের দুয়ার খুলে গিয়েছিল, অন্যান্য দেশ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেতে শুরু করেছিল লোকে, কিন্তু সেই ধারণা তখনো পর্যন্ত ছিল অস্পষ্ট। আরো একটি কথা এই যে, এই নাবিকরা যে-সমস্ত কথার জাল বুনত তা ঘটনার বাস্তব বর্ণনা না হয়ে অনেক সময়েই হয়ে দাঁড়াত রূপকথার মতো।...

তারা বলত কেমনভাবে বাস করে দূর লিবিয়ায় কালো চামড়ার একদল মানুষ—ইথিওপীয়রা। বলত বিশাল বিশাল হাতির কথা, পাকে পাকে জড়িয়ে পেষণ করে এমন সব অজগরের কথা। বলত শিং-ওলা গাধার কথা, আর এমন সব মহিষের কথা যাদের শিং সামনের দিকে ঘুরে গিয়েছে ও মাটি স্পর্শ করেছে। এই মহিষগুলি যখন চরে বেড়ায় তখন পিছনের দিকে হাঁটতে হয় যাতে মাটির মধ্যে শিং আটকে না যায়। বলত মাউন্ট অ্যাটলাসের কথা, যেটি এত উঁচু যে তার চুড়ো দেখা যায় না। মাউন্ট অ্যাটলাস হচ্ছে স্তম্ভ যার ওপরে আকাশের ভর রয়েছে। এই স্তম্ভ না থাকলে আকাশ অনেক আগেই ভেঙে পড়ত।

আরও দূরে গেলে দেখা যেত এমন মানুষ যাদের মাথা কুকুরের মতো, আর এমন মানুষ যাদের আদৌ কোনো মাথা নেই। তারা কিন্তু অন্ধ নয়, তাদের চোখগুলি রয়েছে তাদের বুকে। পূবের দেশে দেখা যেত বিশাল বিশাল জলের জীব ও পাখি। মরুভূমিতে দেখা যেত কুকুরের মতো প্রকাণ্ড সোনালী পিঁপড়ে। এই পিঁপড়েগুলি মাটির নিচে লুকিয়ে থাকে ও ঘুমোয়। আর সেটাই হচ্ছে মরুভূমির অধিবাসী মানুষদের কাজ করার সময়। তারা তাদের দ্রুতগামী উটের পিঠে লাফিয়ে উঠে পড়ে এবং উট ছুটিয়ে মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ায়। যেখানে যতো সোনার সন্ধান পায় কুড়িয়ে নেয়, উটে বোঝাই করে ও তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। বাজে সময় নষ্ট করে না। করলেই পিঁপড়েগুলি লুকানো জায়গা থেকে বেরিয়ে আসবে ও তাদের আক্রমণ করবে।

উত্তরের দিকে আরও আশ্চর্য একটি দেশ ছিল। সেখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাদা পাখি চারদিকে উড়ে বেড়াত। তাদের সাদা পালকগুলি মাটিতে পড়ত আর সমস্ত রাস্তা সেই পালকে ছেয়ে যেত। সেখানে এমন লোক ছিল যারা বছরের মধ্যে ছ-মাস ঘুমিয়ে থাকত। আর এমন লোক ছিল যারা বছরে তিনবার নেকড়ে বাঘ হয়ে যেত।...

হিরোডোটাস ছিলেন বিজ্ঞানী, তিনি কি এসব কথা সত্যিই বিশ্বাস করতেন?

না। তিনি শুধু যা কিছু শুনতেন লিখে রাখতেন, কিন্তু সবকিছু বিশ্বাস করতেন না।

যেমন, তিনি ঘোরতর সন্দেহ পোষণ করতেন যে এক-চোখওলা মানুষের বা নেকড়ে-বাঘে রূপান্তরিত হতে পারে এমন মানুষের অস্তিত্ব আছে কিনা সে-বিষয়ে।

'এই সৈনিকগুলি বড়ো বেশি মিথ্যে বলে আর ঘটনাকে গল্প দিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে তুলতে চায়। এই অচেনা দেশগুলিতে যারা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে তাদের কথাই বিশ্বাস করা চলে না। কি করে বোঝা যাবে কোন্‌টা সত্যি আর কোন্‌টা মিথ্যে, বিশেষ করে যখন বিবরণ দেওয়া হচ্ছে দূর দেশ সম্পর্কে আর এমন সব উপজাতি সম্পর্কে যারা বাস করে পৃথিবীর শেষপ্রান্তে। লিবিয়ায় বা ভারতবর্ষে খুব কম লোকই গিয়েছে। তাই যখন কোনো নাবিক বা ওই সব দেশ ঘুরে এসেছে এমন কোনো লোক—একজন ফিনিসীয়—এই সমস্ত বিবরণ দেয় তখন তার ধারণা হয় যে লোকে তার কথা গিলছে।

কিন্তু হিরোডোটাস এমন সরল মনের লোক ছিলেন না। তিনি ছিলেন এক নতুন ধরনের মানুষ যিনি সবকিছু অবিশ্বাস করতেন। সাধ্যমতো অনুসন্ধান করে দেখতেন। আরবিয়াতে গিয়েছিলেন শুধু দেখতে যে ওখানে ডানাওলা সাপ আছে কিনা। আছে বলে তিনি শুনেছিলেন। অথচ একটিও দেখতে পাননি। এমনিভাবে মানুষের যুক্তির কাছে একটি উদ্ভট দানব মারা পড়ল। যখন তিনি বাড়িতে বসে তাঁর বিপুল পরিমাণ লেখা ও স্তূপ পরিমাণ প্যাপিরাস পাতার মোড়কের দিকে তাকিয়ে দেখতেন তখন তাঁর মন সন্দেহে ভরে যেত। তখন ভাবতেন এই লেখাগুলি থেকে একটি বই তৈরি করা ঠিক হবে কিনা। যদি করেন তাহলে কি একরাশ মিথ্যের

ওপরে নিজের ছাপ বসাচ্ছেন না? কিন্তু কোনো কিছু বাদ দেয়াটাও লজ্জার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। অতএব ছুঁচলো করে তোলা খাগের কাঠি কালিতে ডুবিয়ে নিয়ে লেখার কাজ শুরু করে দিলেন।

তাঁর নিজের মনে যে-সব সন্দেহ ছিল তা পাঠকদের কাছেও উপস্থিত করেছিলেন : 'আমি নিজে জানি না ব্যাপারটা ঠিক কেমন। তবু বলা দরকার, অন্যদের কাছে আমি যা শুনেছি তা এই।'

যেখানেই সম্ভব তিনি চেষ্টা করেছিলেন এইসব অসংগত কাহিনীর পক্ষে সংগত কিছু ব্যাখ্যা খুঁজে বার করতে।

যখন তিনি সেই পায়রার গল্প বলতেন যেটি দোদোনায় উড়ে গিয়েছিল আর ঘোষণা করতেন, 'এখানে একটি মন্দির গড়ে তোলা দরকার', তখন সংগে সংগে আরো বলতেন, 'এটি মনে হয় একটি স্ত্রীলোক যে অজানা ভাষায় কথা বলত আর তাই শুনে মনে হতো পাখি কথা বলছে।'

তিনি বিশ্বাস করতেন না যে দূর-উত্তরে ছ-মাস ধরে রাত্রি চলে। কিন্তু দৈত্যাকার পিঁপড়ের কাহিনী বিশ্বাস করতেন, যে পিঁপড়ে ভারতবর্ষে সোনা মজুদ করত। তাঁর মাথার মধ্যে পুরনো চিন্তা নতুন চিন্তার সংগে লড়াই করছিল আর মাঝে মাঝে পুরনো চিন্তার জয় হচ্ছিল। দার্শনিকরা ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছিলেন যে সূর্যের কিরণে নদীর জল বাষ্পীভূত হয়। কিন্তু হিরোডোটাস তখনো বিশ্বাস করতেন যে সূর্য হচ্ছে দেবতা এবং আকাশ-পথে যাবার সময়ে এই দেবতা তৃষ্ণার্ত হয় ও নদীর জল পান করে। আনাক্সিমান্দের, আনাক্সিমেনেস ও পিথাগোরাস ইতিমধ্যেই বুঝে গিয়েছিলেন আকাশের বস্তুগুলি কোন্ নিয়মের দ্বারা চালিত হয়। কিন্তু হিরোডোটাস তখনো বিশ্বাস করতেন যে ঠান্ডা একটা বাতাস সূর্যকে তার পরিক্রমার পথ থেকে উড়িয়ে নিয়ে যায় আর তার ফলেই সৃষ্টি হয় শীতকাল ও ঠান্ডা আবহাওয়া। এম্পিডোক্লিস ধারণা করতে পেরেছিলেন যে আকাশে বস্তু আছে। তবুও হিরোডোটাস তখনো ভাবতেন ওগুলি স্বগীর্য় আত্মা ও দেবত্বসম্পন্ন।

কিন্তু বিজ্ঞান তার নিজের কাজ করে চলেছিল। আরও বেশি বেশি সংখ্যক গ্রীক নতুন চোখে বস্তুর দিকে তাকিয়েছিল এবং যা দেখেছিল তা বুঝতে পেরেছিল। হিরোডোটাস তাঁর বই থেকে পড়তেন আর এথেন্সের মানুষরা ভিড় করে শুনতে আসত। তারা এ-ব্যাপারটি তারিফ করত যে বৈজ্ঞানিক রচনাটি শুনতে বড়ো মধুর। নতুন বিজ্ঞানে ভরা এই সমস্ত কাহিনী লোকে যখন শুনত তখন দেবতা ও বীরদের পুরনো কাহিনীগুলি ভুলে যেত। সর্বত্রই এই আলোচনা চলত—তা সে বিদ্যালয়েই হোক বা কুস্তির আখড়াতেই হোক বা বন্ধুবান্ধবের সংগে ভোজের টেবিলে বসে থাকা অবস্থাতেই হোক। তারা আলোচনা তুলত নক্ষত্র নিয়ে আর তর্ক তুলত চন্দ্র ও সূর্য নিয়ে।

এইসব আলোচনা কখনো নিরুত্তাপ বৈজ্ঞানিক কথোপকথন হতো না, হয়ে দাঁড়াত উত্তপ্ত তর্কবিতর্ক, যার বিষয় ছিল কেমনভাবে বাঁচতে হবে, কী বিশ্বাস করতে হবে, কী চিন্তা করতে হবে।

২। এথেন্সের একটি বাছাই-করা সমাবেশে পাঠককে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেখানে তিনি শুনতে পাবেন সর্বশেষ সংবাদ সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা।

এথেন্সে পেরিক্লেসের বাড়িতে সান্ধ্যভোজের আসর বসেছিল। ততোক্ষণে অতিথিদের খিদে মিটেছে, ফুলের স্তবকগুলো তাঁরা ভূষণ করে নিয়েছেন। গৃহকর্তার সম্মানে সুরা ঢালা হয়েছে আর জল মেশানো সুরা তাঁরা অল্প অল্প চুমুক দিচ্ছেন। গৃহকর্ত্রী আস্‌পাসিয়া নাচিয়েদের বিদেয় করেছেন ও বংশীবাদকদের থামিয়ে দিয়েছেন। ভোজের আসরে এবার পরস্পর কথাবার্তা শুরু হয়ে গেল।

পেরিক্লেসের বাড়িতে এই যে অতিথিরা সমাগত হয়েছেন—তাঁরা কারা? তাঁরা কি শুধুই খাদ্য, সংগীত, সুরা ও সুগন্ধ উপভোগ করতে এসেছেন?

না। তাঁরা বরং এসেছেন 'যুক্তির ভোজে' যোগ দিতে। অর্থাৎ তাঁদের গুরু আনাক্‌সাগোরাসের কথা শুনতে। তাঁরা সকলেই তাঁর শিষ্য ও বন্ধু। গৃহকর্তা স্বয়ং পেরিক্লেস রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাঁর উপদেশ নিয়ে থাকেন। পেরিক্লেস ছিলেন প্রধান কলাকুশলী, প্রধান অধিনায়ক ও এথেন্সের জনগণের নেতা। তিনি যেমন তাদের শিক্ষা দিতে পারতেন তেমনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। এথেন্সে তাঁকে বলা হতো অলিম্পিয়ান। লোকে বলত, যখন তিনি প্রকাশ্যে ভাষণ দিতেন তখন জিউসের মতো তিনিও আস্ফালন করতে পারতেন বজ্র ও বিদ্যুৎ।

তাঁর অধীনে এথেন্স ক্ষমতার চুড়োয় পৌঁছেছিল। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে নগরটিকে তিনি জগতের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর করে তুলেছিলেন। এবং এই নেতা একজন দার্শনিকের উপদেশ নিতেন এবং তাঁর ভাষণকে প্রকৃতির বিজ্ঞান থেকে বাছাই করা অংশ দিয়ে অলংকৃত করতেন।

ভোজসভার কর্ত্রী আস্‌পাসিয়ার সঙ্গেও আনাক্‌সোগোরাসের দীর্ঘক্ষণ কথা হয়েছিল। সে-সময়ের সাধারণ গড়পড়তা একজন স্ত্রীলোকের দিন কাটত স্ত্রীলোকের মহল্লায় সুতো কাটতে কাটতে, আস্‌পাসিয়া এই স্ত্রীলোকের মতো আদৌ নন। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সক্রিয় অংশ নিতেন আস্‌পাসিয়া, বৈজ্ঞানিক আলোচনায় যোগ দিতেন। সক্রেটিস ও তাঁর শিষ্যরা প্রায়ই দেখা করতে আসতেন তাঁর সঙ্গে।

পেরিক্লেসের স্ত্রী ছিলেন এথেন্সের একজন অভিজাত, তাঁর সঙ্গে পেরিক্লেস বিবাহ-বিচ্ছেদ করেছিলেন যাতে এই বিদেশিনীকে বিয়ে করতে পারেন। এজন্য তাঁকে প্রচুর সমালোচনা শুনতে হয়েছিল। পুরনো সংস্কার তখনো অতি প্রবল। কিন্তু আস্‌পাসিয়ার প্রতি তাঁর ভালোবাসা গোপন করার কোনো চেষ্টা করেননি পেরিক্লেস।

আর কারা এসেছিলেন ভোজের আসরে?

এসেছিলেন মস্ত ভাস্কর, শিল্পী ও স্থপতি ফিডিয়াস। এথেন্সকে নতুন করে গড়ে তুলতে পেরিক্লেসকে সাহায্য করছিলেন তিনি। নগরের কেন্দ্রে কাজে লাগিয়েছিলেন কয়েক হাজার সৈনিক-স্থপতি, ভাস্কর, ছুতোর, তামা-কারিগর, স্যাঁকরাকে।

লেফ্‌টেনেন্টের অধীনে যেমন থাকে, তেমনি প্রত্যেক সর্দারের অধীনে এক কোম্পানী শ্রমিক কাজ করছিল।

এই সৈনিকদের যে-সব অস্ত্রে সজ্জিত করা হয়েছিল তা তলোয়ার কিংবা বর্শা নয়—তা খোদাইকরের হাতিয়ার ও পাথর কাটার মিস্ত্রীর ছুরি। তাদের কাজ ছিল হত্যা করা নয়, জীবন্ত মানুষকে শব করে তোলা নয়—মৃত বস্তুকে সজীব করে তোলা। মৃত কাদামাটিকে তারা ভাস্বর জীবন্ত করে তুলত নগরের কেন্দ্রস্থলের মন্দিরগুলির দেব ও দেবীর মধ্যে। তারা তৈরি করত মন্দিরের হালকা মনোরম স্তম্ভ। বাঙ্ময় করে তুলত স্তম্ভের কার্নিশে অলংকরণ হিসাবে বসানো মার্বেলপাথরকে।

শত শত জাহাজ এথেন্সের বন্দরে নিয়ে আসছিল মার্বেল, তামা, সোনা, হাতির দাঁত ও সাইপ্রেস গাছ। নির্মাণকারীদের এই বাহিনীর নেতা ছিলেন ফিডিয়াস। তিনি শুধু এথেন্সের কেন্দ্রস্থলকে নয়, সমগ্র এথেন্স নগরকে অসাধারণ সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছিলেন।

ফিডিয়াসের পাশে বসেছিলেন ইউরিপিডিস। তিনিও আনাক্‌-সোগোরাসের শিষ্য। মানুষ যে-সব পুরনো বিশ্বাস আঁকড়ে থাকত সেগুলি তিনি যাচাই করে নিতেন। ভাগ্যের কাছে বা দেবতাদের কাছে তিনি কখনো নতি স্বীকার করেননি। তাঁর বিয়োগান্ত নাটকগুলির প্রত্যেকটি কথা থিয়েটারের দর্শকদের হৃদয়কে ভয়ে কাঁপিয়ে দিত। ওই সব দেবতার প্রতি ওই দর্শকদের বিশ্বাস তখনো পর্যন্ত অবিচল ছিল।

যুদ্ধরথে জোতা চারটি ঘোড়া চালিয়ে নিয়ে যাওয়া শক্ত। কিন্তু ইউরিপিডিস চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন হাজার হাজার দর্শককে, তাদের বাধ্য করেছিলেন এক জীবন বাঁচতে, এক চিন্তা ভাবতে, এক আবেগের ভাগী হতে।

থিয়েটারের দর্শকদের অনেকেরই তখনো পর্যন্ত বিশ্বাস ছিল পুরনো দেবতাদের প্রতি। তাদের আত্মা ছিল দুর্বল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। কিন্তু ইউরিপিডিস শক্ত করে লাগাম ধরেছিলেন। তাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে দুর্বল তারাও ভয়ে ভয়ে ও নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এগিয়ে যেতে পেরেছিল। যারা ছিল সবচেয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন তারাও বিয়োগান্ত নাটকের কথাগুলি উচ্চারণ করতে পেরেছিল : 'দেবতারা যদি ন্যায়পরায়ণ না হয় তাহলে তারা দেবতা নয়।'

পেরিক্লেস, আস্‌পাসিয়া, ফিডিয়াস্‌, ইউরিপিডিস...

মস্ত শিক্ষকের মস্ত সব শিষ্য। প্রাচীনকালে নেতারা তাদের অনুগামী-দের নিয়ে নিজেদের দুর্গের শক্ত দেয়ালের পিছনে ভোজের আসর বসাত। হাজার হাজার মহিষ দেবতাদের উদ্দেশে নিবেদন করত। বাতাসে ছড়িয়ে পড়ত আগুনে পোড়ানো ভোগের ভারী গন্ধ, তাদের উল্লসিত হল্লা ও গান এবং ভোজনতৃপ্তদের উচ্চ হাসি। মনে হতো যেন দৈত্যদের ভোজের আসর।

কিন্তু এই ভোজের আসরটি অন্য রকমের।

ইউরিপিডিস কি আকিলিসের সমকক্ষ নয়? আকিলিস লোককে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানাতেন। ইউরিপিডিস আহ্বান জানিয়েছিলেন খোদ দেবতাদেরই।

আর পেরিক্লেস কি অডিসিউসের সমকক্ষ নয়? অডিসিউস রাজত্ব করতেন ইথাকার ছোট দ্বীপে। পেরিক্লেস ছিলেন উপকূল বরাবর ছড়ানো সমস্ত নগর ও সমুদ্রের সমস্ত দ্বীপ নিয়ে গঠিত মেরিটাইম লীগের সর্বাধিনায়ক।

সম্ভবত হোমারের বীরদের মতো পেশীর জোর তাঁদের ছিল না। কিন্তু পেশীর জোরকে ছাপিয়ে যায় যুক্তি। তাঁরা তাঁদের চোখ দিয়ে সেই প্রাচীন বীরদের চেয়ে বেশি দূর পর্যন্ত দেখতে পেতেন।

এই পরাক্রান্ত ব্যক্তিরা জড়ো হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ তাঁর কথা শুনতে। সেই ঋষি কী বলেছিলেন তাঁর শিষ্যদের?

কালের ধোঁয়ার আড়াল সরিয়ে তাঁর কথা শোনা কষ্টকর। তবুও শোনা যাক।

অর্ধ-বৃত্তাকারে সাজানো কৌচের ওপরে অতিথিরা গা এলিয়ে দিয়েছেন। কৌচের সামনে নিচু টেবিল পাতা হলো। গাঢ় সুরা ঝিকঝিক করে উঠল পাত্রের মধ্যে। টেবিলের ওপরে আরও ছিল আঙুর বোঝাই চুবড়ি। সেখানে বসে তাঁরা আনাক্সাগোরাসের কথা শুনছিলেন। তাঁদের সকলের মুখগুলি তাঁর দিকে ফেরানো। কেউ কেউ বসার ভঙ্গি বদলাচ্ছেন, কনুইয়ের ভর রাখছেন বালিশের ওপরে, কিংবা পাশের মানুষের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁদের ঠোঁটগুলি নড়ছে, তাঁদের প্রশ্ন ও জবাবগুলি আমরা শুনতে পেয়ে যাচ্ছি। কিন্তু তাঁরা কী বলছেন সেটা আমরা অনুমান করতে পারি। তাঁরা স্বপ্নের মতো। এই মানুষরা একসময়ে এত প্রখর ও বাস্তব জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু এখন তাঁরা আত্মা মাত্র। আমাদের কল্পনা দিয়ে আমরা তাঁদের অতীত থেকে তুলে এনেছি।

ওই তাঁরা বসে আছেন। তাঁদের সকলের মুখ আনাক্সাগোরাসের দিকে ফেরানো। তাঁরা শুনছেন।

আলোচনার বিষয় কী? পদার্থের সৃষ্টি ও ধ্বংস। আনাক্সাগোরাস বললেন, পদার্থের 'বীজ' হচ্ছে বস্তুর অতিক্ষুদ্র কণিকা যা থেকে সমস্ত পদার্থ তৈরি হয়। বীজ মিলিত হলে পদার্থ আবির্ভূত হয়, বীজ বিচ্ছিন্ন হলে পদার্থ অদৃশ্য হয়। পদার্থ বদলায়, কিন্তু যে বস্তু থেকে পদার্থ তৈরি হয় তা বদলায় না। কিন্তু বস্তু কি নিজের থেকে জগৎ সৃষ্টি করতে পারে? কি করে সৃষ্টি করবে তা আনাক্সাগোরাসের বোধগম্য নয়। অতএব তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, সবকিছুর ওপরে নিশ্চয়ই রয়েছে বোধ। তাঁর মনে হলো, প্রকৃতিরও বোধ আছে যা সবকিছুকে সাজিয়ে তোলে।

তিনি তাঁদের আকাশের বস্তুর কথা বললেন। তাঁরা অবাক হয়ে জানলেন যে আমাদের এই পৃথিবী ছাড়াও অন্য আরও জগৎ আছে। যেমন, চন্দ্র হচ্ছে এমনি আরেকটি জগৎ, যেখানে পর্বত আছে, জীবন্ত প্রাণী আছে, উদ্ভিদ আছে। সূর্য হচ্ছে বিশাল এক জ্বলন্ত পাথর, আগুনের বাতাসে ঘুরন্ত, বিপুল বেগে আবর্তিত। ঘুরন্ত বেগের দরুন যতোবার সূর্য থেকে ফুলকি ছিটকে যায় ততোবার নতুন জগৎ সৃষ্টি হয়। সেখানে থাকে সবকিছু, ঠান্ডা ও অন্ধকার থেকে আলাদা হয়ে যায় উত্তাপ ও আলো। জাহাজ যেমন সমুদ্রের ফেনার মধ্যে দিয়ে চষে যায় তেমনি যায় সূর্য আকাশের মধ্যে দিয়ে। এই প্রচণ্ড গতি থেকে সূর্য ক্রমেই আরো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ছিঁড়েফুঁড়ে

বেরিয়ে যাবার সময়ে তা থেকে টুকরো ছিটকে যায়। কিছু কিছু টুকরো পৃথিবীতে পড়ে খসে-পড়া তারার মতো। এমনি একটি যদি কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেরা দেখতে পেয়ে যায় তাহলে বহুক্ষণ পর্যন্ত তারা তার সামনে যেতে ভয় পায়। শেষপর্যন্ত যখন সামনে গিয়ে পরীক্ষা করে তখন দেখতে পায়, আকাশ থেকে যে এসেছে সে একটুকরো পাথর ছাড়া কিছু নয়।

প্রত্যেকে শুনছিলেন সেই ঋষির কথা, যিনি দেখেছিলেন অন্যরা যা তখনো পর্যন্ত দেখেনি। তাঁর যুক্তি ভেদ করত আকাশের গভীরতাকে। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন এমন সব নতুন জগৎ যা তাঁর আগে অন্য কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। কাজেই তাঁকে যে সবাই 'যুক্তি' নাম দিয়েছিল তাতে অবাক হবার কিছু নেই। কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেরা যখন এমনি একটি ভোজের আসরে উপস্থিত হতো তারা দূরে সরে যেত। সূর্য ও চন্দ্রের দেবত্বে বিশ্বাস করে না এমন এক ব্যক্তির সান্নিধ্যে থাকতে চাইত না। এই সমস্ত অবান্তর কথা শুনেছে বলে তাদের ভয় ছিল, পরে তারা যখন রাস্তায় বার হবে তখন সূর্যের দেবতা তাদের দিকে তীর ছুঁড়বে।

কিন্তু পেরিক্লেসের অতিথিরা ছিলেন নতুন ধরনের মানুষ। পূর্ব-পুরুষরা যাতে বিশ্বাস করত তাতে তাঁদের বিশ্বাস ছিল না। সবকিছু তাঁরা নিজেরা যাচাই করে নিতেন। আর গৃহকর্তা নিজে মানুষের যুক্তিকে তাঁদের সকলের চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করতেন।

তাঁর সম্পর্কে একটি গল্প শোনা যায়, সেটি এই : একবার পেরিক্লেস একশো-পঞ্চাশটি জাহাজ অস্ত্রসজ্জিত করেছিলেন ও যোদ্ধা দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছিলেন। তারপরে তিনি যখন নিজের জাহাজে উঠতে যাচ্ছেন তখন সূর্যগ্রহণ হয়ে গেল। তাই দেখে সকলের সে কী ভয়। তারা এটাকে একটা খুবই খারাপ লক্ষণ বলে ধরে নিয়েছিল। কিন্তু আনাক্সাগোরাসের শিষ্য পেরিক্লেস বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। যখন দেখলেন যে চালক জাহাজ ছাড়তে ইতস্তত করছে, পেরিক্লেস করলেন কি, একটা আঙরাখা চালকের মাথার ওপর দিয়ে ফেলে দিলেন এবং বাইরের সমস্ত আলো আড়াল করে দিলেন। তারপরে চালককে জিজ্ঞেস করলেন, সে ভয় পেয়েছে কিনা। চালক অবাক হয়ে জবাব দিল, সে একটুও ভয় পায়নি।

পেরিক্লেস বললেন, 'তাহলে তফাতটা কোথায়? গ্রহণ হচ্ছে আঙরাখার চেয়ে আরো বড়ো, এই মাত্র।'

রাত্রিবেলা ভোজ শেষ হবার পরে আনাক্সাগোরাস ঘুমন্ত নগরের রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরে চললেন। চন্দ্রের সাদা আলোয় প্লেনগাছগুলি রুপোলী দেখাচ্ছে। নগরের কেন্দ্রস্থলের কালো দেয়ালগুলি ঝুলে আছে এথেন্সের ওপরে। এখানেই রয়েছে দেবতাদের মন্দির। এখানেই পালাস আথেনা তার সোনালী বর্শা তুলে ধরে আছে আকাশের দিকে। সকলেই ঘুমন্ত। বাজারের জায়গাটা জনশূন্য।

আনাক্সাগোরাস থামলেন ও চন্দ্রের গোল চক্রের দিকে তাকিয়ে রইলেন। দু'চোখ কুঁচকে চেষ্টা করলেন আরো ভালোভাবে তাকিয়ে দেখতে। আরে, তাই তো, চন্দ্রের ওপরে তিনি যেন দেখতে পাচ্ছেন কালো কালো এবড়ো-খেবড়ো ছোপ। স্পষ্টই বুঝতে পারছেন ওগুলি হচ্ছে পর্বত ও উপত্যকা। মনে হতে লাগল আকাশকে নতুন চোখে দেখছেন। ওই যেখানে তেজী

ঘোড়ায় চেপে আন্‌ড্রোমিডা প্রতি রাতে আকাশ পার হচ্ছে, বর্শা উঁচিয়ে পারসিউস ড্রাগনকে শাসাচ্ছে, সেখানে তিনি যেন দেখতে পাচ্ছেন মহাশূন্যের বিশাল বিস্তৃতি ঝিকিমিকি তারায় ও অসংখ্য জগতে ভরে আছে। এমনও তো হতে পারে যে এই সমস্ত জগৎ জনমানবহীন।

চন্দ্র তখনো কিরণ দিচ্ছে, কিন্তু ভোর হতে আর দেরি নেই। প্রথম মোরগের ডাক শোনা যাচ্ছে। মুচীর ঘুম ভাঙল, নিজের তেলের বাতিটা জ্বালিয়ে নিল সে। ভোর হবার আগের সময়টুকুর মধ্যে যদি সে বাড়তি একজোড়া চটি বানিয়ে ফেলতে পারে তাহলে বাড়তি এক মাপ ময়দা কেনার সঙ্গতি পেয়ে যায়।

বাড়ির কর্তারা পরিচারিকাদের ডাকাডাকি করছে আর বলছে যে কাজে লাগার সময় হয়ে গেল। একটু পরেই শোনা গেল ময়দা-কলে যাঁতা ঘোরাবার শব্দ—সারাদিনের জন্য রুটির ময়দা পেষা হচ্ছে। শিশুদের ঘুম ভাঙছে, তারা খেতে চাইছে। চাষীরা হাজির হচ্ছে নগরে আর সঙ্গে নিয়ে আসছে বস্তাভর্তি শস্য ও ঝুড়িভর্তি আঙুর—সেগুলি এখনো শিশিরে চকচক করছে। বাজারের জায়গাটাতে লোকজন আসতে শুরু করেছে। একটু আলো ফুটতেই তারা তাঁবু খাটিয়ে নিল ও পসরা সাজিয়ে বসল। রাত্রিবেলা এই নগর ছিল কী নিঃশব্দ ও চাপা, আর এখন কী সরগরম! তেলের পসারীদের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছে—কে কার চেয়ে বেশি বিক্রি করতে পারে। একফোঁটা তেল কিনবে আনাক্‌সাগোরাসের কাছে এমন পয়সাও নেই। অথচ একটা সময় ছিল যখন তাঁর ছিল নিজস্ব জলপাই বাগান। অনেককাল আগেই সেই বাগান ছেড়ে দিয়ে এসেছে দাড়িওয়ালা ছাগল ও পশমওয়ালা ভেড়াদের চরবার জন্য। কোনো জাগতিক ভাবনা নিয়ে তাঁর ধ্যান বিচলিত হোক, তা তিনি চাননি।

৩। মানুষের গৌরবগাথা

এমন এক সময় ছিল যখন লোকে ভাবত তাদের দেশের নদীটাই জগতের একমাত্র নদী। পরে হারকিউলিসের স্তম্ভের কাছে এসে মহাসাগর দেখল। মহাসাগর দেখে ভাবল এটাও একটা নদী, যা জগতকে বেষ্টন করে আছে। নাম দিল নদী মহাসাগর। ঠিক যেমন তাদের পূর্বপুরুষরা প্রথম সিংহ দেখে নাম দিয়েছিল কুকুর।

জগৎ বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আরো ব্যাপক হয়ে উঠল। তারা জানত নদী ও সমুদ্র আছে অনেক, কিন্তু তখনো তারা ভাবত পৃথিবী আছে মাত্র একটিই। এখন তারা আরও দূর পর্যন্ত দেখতে শুরু করল এবং দেখল যে আকাশে অন্যান্য জগতও আছে। কিন্তু তখনো তারা ভাবত আকাশের এই দ্বীপগুলি হচ্ছে বিশাল সব জীব—ড্রাগন, সাপ, ডানাওলা ঘোড়া, ইত্যাদি।

আর এখন তাদের মধ্যে যারা অধিকতর প্রগতিশীল তারা চেষ্টা করছিল এই ধারণাটাই সম্পূর্ণ দূর করতে যে পৃথিবী ও আকাশ সম্পূর্ণ পৃথক দুটি জিনিস। যারা অদ্ভুত দেখে তারা অদ্ভুত যুক্তিও খুঁজে পায়।

আনাক্‌সাগোরাস বললেন, 'চন্দ্রও একটি জগৎ। বিশ্বে পৃথিবীই একমাত্র জগৎ নয়।'

নক্ষত্রের দিকে, অনন্তের দিকে মানুষ আরও দূর থেকে দূর পর্যন্ত পথ পার হয়ে গেল। গোড়ার দিকে মহাশূন্যের মধ্যে সে খানিকটা পথ হারিয়ে ফেলেছিল। তখনো পর্যন্ত সে ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎকে, নিকট থেকে দূরকে তফাত করেনি। হেসয়েড ভাবতেন, তারা থেকে একটি নেহাই যদি পৃথিবীর দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হয় তাহলে সেটি পৃথিবীতে পৌঁছতে সময় নেবে নয় দিন ও নয় রাত্রি। কিন্তু এখন লোকে বুঝতে পারছিল যে পৃথিবী থেকে তারাগুলি রয়েছে অনেক অনেক দূরে। পৃথিবীর ওপরে সবচেয়ে উঁচু যে-সব পর্বত রয়েছে সেগুলির উচ্চতা তারা এখনো মাপতে পারেনি, সে-অবস্থায় পৃথিবী থেকে তারার দূরত্ব মাপতে যাবে—সেটা কি করে সম্ভব? লোকে ভাবত পর্বতগুলি আসলে যতোটা উঁচু তার চেয়েও বেশি উঁচু। তখনো পর্যন্ত কোনো মানুষ পর্বতের তুষার-রেখায় পৌঁছতে পারেনি। আনাক্সাগোরাস বলতেন, পেলোপোনেসাস উপদ্বীপের চেয়েও সূর্য অনেক বড়ো। তখনো পর্যন্ত তিনি পৃথিবীর মাপ ব্যবহার করতেন। তবু যা হোক তিনি একটা মাপ নেবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি জানতে চেষ্টা করেছিলেন, সূর্য না চন্দ্র, কোন্‌টি পৃথিবীর বেশি কাছে। তারপরে সিদ্ধান্ত করেছিলেন চন্দ্র বেশি কাছে। কেননা গ্রহণের সময়ে চন্দ্র থাকে পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে। অতএব গ্রহণ হয়ে উঠেছিল উপায় যা দিয়ে সন্ধানী আলোর মতো আকাশকে আলোকিত করা গিয়েছিল আর আকাশের গভীরতার মধ্যে মানুষ দৃষ্টি প্রসারিত করতে পেরেছিল।

মাটির নিচেও গভীর থেকে গভীরতর পর্যন্ত ভেদ করতে পেরেছিল মানুষ। রুপোর সন্ধানে তিন হাজার ফুটেরও বেশি নেমে গিয়েছিল। তরঙ্গের ওপর দিয়ে পার হয়ে যেত নাবিক একটা দৈত্যের মতো। তার জাহাজ এথেন্সে ফিরে আসত ক্রিমিয়া থেকে মস্ত মস্ত কাঠের গম্বুজ, হাতির দাঁত, গবাদি পশু ও শস্য নিয়ে, কোলচিস থেকে মোম নিয়ে, আরব থেকে সুগন্ধ তেল নিয়ে।

আরও বেশি সাহসের সঙ্গে মানুষ পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় করার কাজে লেগেছিল। এমন সব খাল কেটেছিল যা দিয়ে নৌকো চলাচল করতে পারে। সমুদ্রের উপকূল বরাবর পাথরের বাঁধ তৈরি করেছিল, আর সেটা এত গভীরে যে একজন অপরজনের ঘাড়ে দাঁড়িয়ে পর-পর দশজন উঠে দাঁড়ালেও সবটাই থেকে যেত জলের নিচে। আরেক জায়গায় নিরেট পাথর কেটে খোলা আকাশের নিচে তৈরি করেছিল নাটমঞ্চ। বসার আসনও তৈরি করেছিল পাথর কেটে কেটে। একসঙ্গে তিরিশ হাজার দর্শক বসতে পারত। মাটির তলা থেকে বার করে এনেছিল মার্বেল, যেখানে প্রচুর মার্বেল মজুদ ছিল। আর দেবতাদের সম্মানে নির্মিত মন্দিরগুলির প্রতিটি স্তম্ভ সাক্ষ্য দিচ্ছিল মানুষ কত বিরাট।

শত শত বছর পার হয়ে গেল। আথেনা ও জিউসের প্রতি বিশ্বাস দুর্বল হতে শুরু করল। কিন্তু তাদের কাছে মন্দিরগুলির পবিত্রতা বজায় রইল, যে-মন্দিরগুলি তারা নিজেরাই তৈরি করেছিল। হেলাসে প্রচণ্ড ঝড় তেমন হয়নি। কিন্তু এই কয়েক শত বছরের মধ্যে আবহাওয়া প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছে মন্দিরগুলির দেয়ালে ও স্তম্ভে। সেগুলি বাদামী হয়ে গিয়েছে ও আবহাওয়ার শিকার হয়েছে।

কিন্তু স্তম্ভ আজও টিকে আছে, তাদের না আছে কোনো অবলম্বন, না কোনো কার্নিস। অন্য স্তম্ভগুলি ধসে পড়েছে ও ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। শত্রুর জাহাজ থেকে কামান কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে যতো ক্ষতি করেছে তার পরিমাণ শত শত বছর ধরে বাইরের আবহাওয়ার দরুন হওয়া ক্ষতির চেয়ে বেশি। কিন্তু পুরনো মন্দিরের এই আধা-ধ্বংসপ্রাপ্ত খণ্ডগুলিকে মনে হবে চির-নতুন। শত শত বছর ধরে লোকে এসে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকবে দেব-দেবীদের ভাঙা মূর্তিগুলির দিকে আর উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠবে, 'কী সুন্দর!' যে দুর্বৃত্তরা এই সম্পদগুলি ধ্বংস করেছিল তাদের নাম বহুকাল আগেই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই সৌন্দর্যের স্রষ্টাদের নাম হয়ে আছে চিরস্মরণীয়। স্রষ্টা মানুষের চেয়ে আশ্চর্য আর কী হতে পারে! মানুষ তার মহত্ত্ব উপলব্ধি করতে শুরু করেছিল।

নিরেট শিলা থেকে কেটে বার করা পাথরের আসনের ওপরে বসে ছিল হাজার হাজার দর্শক। নিঃশ্বাস বন্ধ করে তারা দেখছিল ঈস্‌কাইলাস, সোফোক্লিস ও ইউরিপিডিসের বিয়োগান্ত নাটক—ঈস্‌কাইলাসের প্রমিথিউস, সোফোক্লিসের আন্তিগোনে ও ইউরিপিডিসের ইফিগেনিয়া। সকলেই ভাবছে একই সাধারণ ভাবনা, অনুভব করছে একই সাধারণ অনুভূতি। অপরের দুঃখের ভাগ নিতে তারা শিখেছিল—শুধু নিজেদের নিয়ে চিন্তা-ভাবনা নয়, অপরের প্রতি সহানুভূতিবোধও। তারা দেখেছিল মানুষের অমোঘ ভাগ্য ও মুক্ত ইচ্ছার মধ্যে চিরকালীন সংগ্রাম। ককেসাসের একটি চুড়োর সঙ্গে প্রমিথিউসকে শেকল দিয়ে বেঁধে রেখেছিল হেফেস্টাস। ভাগ্য পুনরায় তার বিরুদ্ধে গিয়েছিল। কিন্তু স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে নশ্বর মানুষকে দিয়েছিল বলে সে অনুশোচনা করেনি। ভাগ্যের কাছে নিজেকে ছেড়ে দেয়নি, জিউসের কাছে বা দেবতাদের স্বর্গীয় বিধির কাছে নতিস্বীকার করেনি। আন্তিগোনে পাতালে চলে গিয়েছিল। নিজের পাপী ভাইয়ের শেষকৃত্য করেছিল বলে তাকে মৃত্যুদণ্ড পেতে হয়েছিল। বড়ো বেশি ভালোবেসেছিল বলে তার এই শাস্তি। কিন্তু মানুষের তৈরি করা কোনো আইন তার হৃদয় থেকে ভালোবাসা কেড়ে নিতে পারেনি। সমবেত কণ্ঠে এই কথাগুলি শুনতে শুনতে দর্শকরা শিহরিত হয়ে উঠেছিল।

প্রকৃতি জগতে আশ্চর্য শক্তি অনেক রয়েছে
কিন্তু মানুষের চেয়ে বেশি শক্তিমান কেউ নয়।
যখন বরফের মতো হিমশীতল বাতাস বইতে থাকে,
শীতকালের ঝড় যখন ওঠে, তখন সে ঢেউ কেটে পাড়ি দেয়।
মৃত্যুহীন মাটি-মায়ের বুকে
প্রতি বছর সে লাঙল চালিয়ে পরিখা কাটে।
জাল দিয়ে সে ধরে ডানাওলা পাখি
গভীর জল থেকে সাঁতার কাটা মাছ।
লম্বা কেশরওলা ঘোড়াকে সে পোষ মানিয়েছে,
দুর্ধর্ষ ষাঁড়ের ঘাড়ে পরিয়েছে জোয়াল।
তুষারকে সে ভয় পায় না
ভয় পায় না আকাশ থেকে নেমে-আসা বৃষ্টিধারাকে।

দুর্বোধ রোগের বিরুদ্ধে সে তৈরি করেছে ঔষধি।
একমাত্র জয় করতে পারে না সে মৃত্যুকে,
সে আবিষ্কার করেছে কথা আর চিন্তা যার গতি বাতাসের
চেয়েও দ্রুত।
আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য
সে নির্মাণ করেছে নগর, প্রতিষ্ঠা করেছে আইন।
সে ধনী, আশায় নয়, জ্ঞানে
এবং চতুর দক্ষতায়।

হ্যাঁ, মানুষ ছিল শক্তিশালী, আর নিজের শক্তি উপলব্ধি করতে শুরু করেছিল।

একসময়ে প্রকৃতি শাসন করত মানুষকে। প্রকৃতি ভ্রূকুটি করলে মানুষ কাঁপত। প্রকৃতি কথা বললে নতজানু হতো। ঠান্ডায় ও খারাপ আবহাওয়ায় বহু মানুষকে মরতে হয়েছিল—যতোদিন-না সে নিজের আস্তানায় আগুন জ্বালাতে সমর্থ হয়েছিল, যতোদিন-না বৃষ্টি হলে পরে সেই আগুনকে বাঁচাবার জন্য দীন একটা কুটির তুলতে পেরেছিল।

কিন্তু এখন সে প্রকৃতির এইসব শক্তির কতকগুলোকে জয় করতে শুরু করেছে। কবি ঠিকই বলেছে :

প্রকৃতিকে আমরা জয় করি শিল্প দিয়ে
যখন প্রকৃতি আমাদের জয় করতে চায়।

সে নিজের জমিতে জলসেচন করেছিল, বাতাসকে হুকুম দিয়েছিল তাকে সমুদ্রের ওপর দিয়ে বয়ে নিয়ে যেতে। আগুনকে দিয়ে ধাতু গলিয়ে নিয়েছিল, মাটিকে বাধ্য করেছিল রুটি ও সুরা যোগান দিতে।

নিজের বাড়ি থেকে ঠান্ডাকে দূরে রেখেছিল। সমুদ্রে যখন ঝড় ফুঁসে উঠত তখন নিজের জাহাজগুলি নিরাপদ করার জন্য বন্দর তৈরি করেছিল।

খুব বেশিকাল আগের কথা নয়, তখন সে জানত কেবল দেবতার ইচ্ছা! দেবতাদের হুকুমে নিজের ছেলেমেয়েদের পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারত।

'ইফিগেনিয়া'র ঐকতানে এই গানটি গাওয়া হয় : 'ওগো ভালোমানুষ, প্রিয় ইফিগেনিয়া, দেবী আর্টেমিস ও ভাগ্য তোমার প্রতি নিষ্ঠুর।' ইফিগেনিয়াকে মুক্ত করা হয় ও সম্মান জানানো হয়, আর ইফিগেনিয়া গেয়ে ওঠে 'দেবতারা যদি অন্যায় করে তাহলে তারা দেবতা নয়।'

আগে নিচুজাতের লোকেরা অভিজাতদের বিরুদ্ধে গলা চড়াতে সাহস পেত না। দরবারে যদি কখনো নিজের আসন থেকে উঠে দাঁড়াত তাহলে রাজা তার রাজদণ্ড দিয়ে তাকে আঘাত করত আর বলত : 'বসে থাক আর অন্যারা কী বলে শোন।' আর এখন লোকে নিজেরাই নিজেদের বিচার করছে। নিজেদের নেতা নিজেরা নির্বাচিত করছে। আর নেতারা যদি ভালো না হয় তাহলে নেতাদের বাতিল করে দিচ্ছে।

স্বাধীনতার জন্য লোকে গর্বিত আর শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ের রণক্ষেত্রে এই গর্ব তাদের দশগুণ শক্তি দেয়।

৪। ডিমোক্রিটাস

সত্যের দিকে উঠে-যাওয়া পথ ধরে মানুষ উঁচু থেকে আরো উঁচুতে এসে গেল। তার চোখের সামনে দিগন্ত আরো বেশি বেশি প্রসারিত হলো।

তারপরে একসময়ে মানুষ দেখতে পেল তার চারদিকের বিশ্বের বিরাট অনন্ত বিপুলতা আর তারই সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা যা দিয়ে আকাশের প্রতিটি তারা আর পৃথিবীর প্রতিটি বালুকণা গঠিত। এই বিশ্ব সম্পর্কে যে জ্ঞানী মানুষ প্রথম বলেছিলেন তিনি মহাঋষি ডিমোক্রিটাস।

ডিমোক্রিটাসের জন্ম থ্রেস-এর আরডেরা নগরে। তাঁর পিতা ডামাসিপাস ছিলেন নগরের একজন সম্মানিত ব্যক্তি।

একবার অভিযানে বেরিয়ে পারস্যের রাজা জারেক্‌সেস ধনী ও অতিথিবৎসল ডামাসিপাসের বাড়িতে থেকেছিলেন। তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন একদল পণ্ডিত-যাদুকর। আরডেরা ছেড়ে চলে যাবার সময়ে রাজা জনকয়েক পণ্ডিত-যাদুকর রেখে গেলেন ডামাসিপাসের সন্তানদের বিজ্ঞান শেখাবার জন্য।

পারস্যের যে পণ্ডিতরা বালক ডিমোক্রিটাসকে শিক্ষা দিয়েছিলেন, অনেক বিষয়েই তাঁদের বিচার গ্রীকদের থেকে আলাদা ছিল। তাঁরা মনে করতেন, যারা মূর্তি পুজো করে ও দেবতায় বিশ্বাস করে তারা মূর্খ। তাঁরা শেখালেন, জগৎ আছে দুটি : বিরাট জগৎ—বিশ্ব, ক্ষুদ্র জগৎ—মানুষ।

এই শিক্ষকদের কাছ থেকেই ডিমোক্রিটাস সম্ভবত শুনেছিলেন ভারতবর্ষের ঋষিদের জ্ঞানের কথা : সবকিছু গঠিত হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা দিয়ে বা বিন্দু দিয়ে। বিন্দু দিয়ে গঠন করা যায় রেখা, রেখা দিয়ে সমতল, সমতল দিয়ে ঘন আকার।

ডিমোক্রিটাসের আরো একজন শিক্ষক ছিলেন, যিনি তাঁকে গ্রীক বিজ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে পাঠ দিয়েছিলেন। এই শিক্ষক ও বন্ধুর নাম লিউসিপাস। তাঁর কাছ থেকে ডিমোক্রিটাস শিখেছিলেন মাইলেটাসের দর্শনের এই শিক্ষা যে সবকিছুর মূলে রয়েছে বস্তু।

ডামাসিপাসের মৃত্যুর পরে ডিমোক্রিটাস হয়ে উঠলেন নগরের একজন সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। তাঁর গৃহের জীবন হতে পারল শান্তিপূর্ণ, সম্মানজনক ও প্রতিপত্তিপূর্ণ। 'আর্চন' বা প্রধান বিচারপতি নির্বাচিত হলেন তিনি। তাঁর সম্মানে একটি মুদ্রা প্রকাশ করা হলো, তাতে ছিল তাঁর নাম ও একটি বীণার ছবি। কিন্তু ঘরে বসে জীবন কাটাতে ডিমোক্রিটাসের ভালো লাগল না। জ্ঞানতৃষ্ণা নিয়ে বহুবছরব্যাপী এক ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন তিনি।

তিনি বলছেন, 'আমার সময়ের সমস্ত মানুষের চেয়ে আমি এই পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি অংশ ভ্রমণ করেছি, সবচেয়ে দূরের ব্যাপারগুলি পর্যবেক্ষণ করেছি, আকাশ ও পৃথিবীর বেশির ভাগ অংশ দেখেছি, বহু পণ্ডিত ব্যক্তির কথা শুনেছি।'

দেশে ফিরে এলেন নিঃস্ব হয়ে। তাঁর ভাই যদি সে-সময়ে আশ্রয় না দিত তাহলে তাঁর খাওয়া-পরার কোনো সংস্থান থাকত না। ভ্রমণ করতে গিয়ে তিনি তাঁর সমস্ত অর্থ খরচ করে এসেছিলেন। কারণ তিনি ভ্রমণ

করছিলেন বণিক হিসেবে নয়, জগতের একজন ছাত্র হিসেবে। যতোবার জাহাজ ভাড়া করেছিলেন, তার জন্য অর্থ লেগেছিল। কিন্তু তার বদলে কিছু পাননি।

আর্‌ডেরার মানুষেরা ক্ষেপে গিয়েছিল। এই সেই ডিমোক্রিটাস যাকে তারা এতখানি শ্রদ্ধা করত, সে কিনা বাউন্ডুলে ছোঁড়ার মতো সমস্ত সম্পত্তি বাজে খরচ করে এসেছে, পারস্য ও মিশরের বড়ো রাস্তায় বাপের সমস্ত টাকা উড়িয়ে দিয়ে এসেছে!

ডিমোক্রিটাসকে বিচারের জন্য হাজির করা হলো। বিচারকদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে তিনি মস্ত একটি পাণ্ডুলিপি খুলে ধরলেন। নিজের সপক্ষে একটিও কথা না বলে সেই পাণ্ডুলিপি থেকে পড়তে শুরু করলেন। রচনাটির নাম : 'বিশ্বের বিরাট বিন্যাস'। বিচারকরা প্রথমে বুঝতে পারেননি ডিমোক্রিটাস কেন বিশ্বের সৃষ্টি ও গড়ন সম্পর্কিত এই বইটি থেকে পড়ছেন। তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির সঙ্গে এই বইটির কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে হলো না। কিন্তু বিশ্বের যে-চিত্রটি ডিমোক্রিটাস তাঁদের সামনে মেলে ধরলেন তা এতই চমৎকার যে অভিযোক্তারা তাদের অভিযোগ ভুলে গেল।

পড়া শেষ হবার পরে বিচারকরা রায় দিলেন যে ডিমোক্রিটাস দেশের আইন বা রীতি লঙ্ঘন করেননি। সত্য কথা, তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করে এসেছেন, কিন্তু তিনি ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন এক ভিন্ন ধরনের সম্পদ—জ্ঞান। আরডেরার কোনো বণিক কোনোদিন বিদেশ থেকে এমন একটা লাভ আহরণ করে ফিরে আসেনি। বিচারকরা রায় দিলেন যে ডিমোক্রিটাসকে পাঁচশত মুদ্রা দেওয়া হোক, ডিমোক্রিটাসের জীবিতকালেই তাঁর একটি ব্রোঞ্জমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হোক, ডিমোক্রিটাসের মৃত্যুর পরে তাঁর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার খরচ যেন নগরের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়।

কিন্তু ডিমোক্রিটাস মরবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। আরো একবার তাঁর হাতে অর্থ এসেছে, আরো একবার স্থির করেছেন যে এই অর্থ জ্ঞানের সন্ধানে ব্যয় করবেন। এবার তিনি রওনা দিলেন এথেন্সের উদ্দেশে। এই এথেন্সেই ছিলেন বিখ্যাত সব পণ্ডিত, অন্য কোনো গ্রীক নগরে যতো-না ছিলেন তার চেয়েও বেশি সংখ্যায়—যেমন, আনাক্‌সাগোরাস, সক্রেটিস ও আরো অনেকে।

ডিমোক্রিটাস ভেবেছিলেন তাঁর রচনার খ্যাতি তাঁর চেয়েও আগে এথেন্সে পৌঁছে গিয়েছে। কিন্তু এথেন্সে পৌঁছে টের পেলেন তাঁর নাম কেউ জানে না। সক্রেটিসের নাম তিনি শুনেছিলেন কিন্তু সক্রেটিস তাঁর নাম একেবারেই শোনেননি। আনাক্‌সাগোরাসের সঙ্গে দেখা করলেন, কিন্তু মাননীয় চিন্তাবিদ তাঁকে নিজের বন্ধু ও শিষ্যমহলে গ্রহণ করলেন না। আর্‌ডেরা থেকে আগত এই তরুণ দার্শনিক বিশ্বাস করতেন না যে পরম বোধ বলে কিছু আছে, আনাক্‌সাগোরাসের কাছে তিনি বড়ো বেশি অধঃ-পতিত হয়ে গেলেন। ওলিম্পাস পর্বতে দেবতাদের অস্তিত্ব আনাক্‌-সাগোরাস নিজেও স্বীকার করতেন না। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন কেউ একজন নিশ্চয়ই যন্ত্রচালিত খেলনা চালু করার মতো এই বিশ্বকে চালু করে দিয়েছে। ডিমোক্রিটাস এমনকি এই পরম শক্তির অস্তিত্বও স্বীকার করতেন

না! তিনি মনে করতেন, এই বিশ্ব চিরন্তন, অতএব বিশ্বের শুরু নিয়ে কথা বলার কী অর্থ থাকতে পারে?

আনাক্‌সাগোরাসের কাছে ডিমোক্রিটাসের ধ্যান-ধারণা বড়ো বেশি দুঃসাহসিক মনে হয়েছিল। ডিমোক্রিটাসের কাছে আনাক্‌সাগোরাসের মতামত মনে হয়েছিল স্থবির।

তবে বৃদ্ধ দার্শনিকরা যদিও ডিমোক্রিটাসকে গ্রহণ করতে পারলেন না, কিন্তু তরুণদের মধ্যে অনেকে ডিমোক্রিটাসের প্রতিটি কথা লোভীর মতো গ্রাস করল। তারপরে বহু বছর পরে, পরিণত বৃদ্ধ বয়সে ডিমোক্রিটাস যখন মারা গেলেন, তাঁর গ্রন্থ তরুণদের শিক্ষা দিয়ে চলেছে এবং তাদের সামনে বিশ্বের রহস্য মেলে ধরেছে।

তারা যখন তাঁর গ্রন্থের পৃষ্ঠাগুলি পড়ছিল তখন সেই অভিজ্ঞ বৃদ্ধ তাদের হাত ধরে নিয়ে চললেন অনন্তের পথে, এক জগৎ থেকে অন্য জগতে। তাঁর এমন কোনো ডানা ছিল না যা দিয়ে উড়তে পারেন, কিন্তু এমন চোখ ছিল যা দিয়ে অন্য কেউ আগে যা দেখেনি তা দেখতে পান। তিনি বললেন, পৃথিবী হচ্ছে লাট্টুর মতো। প্রচন্ড একটা ঘূর্ণিবায়ু বয়ে যাচ্ছে পৃথিবীকে ঘিরে, সূর্য চন্দ্র ও গ্রহগুলিকে ঘিরে। এই বাতাসের মধ্যে বাহিত হয়ে চলেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্বলন্ত কণিকা, যেমন চলে জলপ্রপাতের মধ্যে বালুকণা। এত দ্রুত তাদের চলা যে উত্তপ্ত লাল হয়ে ওঠে আর পরস্পরের সঙ্গে এঁটে যায়। এখন তাদের আলাদা করে চেনা অসম্ভব। এমনিভাবে তারা হয়ে ওঠে পৃথিবী গ্রহ ও সূর্য। জগৎ রয়েছে অসংখ্য এবং কোনো দুটি জগৎ একরকমের নয়, যেমন কোনো দুটি মানুষ একরকমের হয় না। তাদের মধ্যে কোনোটির আছে চন্দ্র, কোনোটির সূর্য। বাকিগুলি একেবারেই অন্ধকার, তাদের না আছে সূর্য, না চন্দ্র। সেগুলি হচ্ছে নিঃশব্দ জগৎ, সেখানে একফোঁটা জলও নেই, আরব মরুভূমির মতো ঊষর। তাছাড়া আছে উজ্জ্বল জগৎ, সেখানে শুধু রঙ আর রামধনু, সেখানে বাতাসে সুরের মূর্চ্ছনা।

এই সমস্ত জীবন্ত জগৎ ছাড়াও রয়েছে প্রাচীন মৃত জগৎ। সেগুলিও পাক খেয়ে ঘুরছে আর পরস্পরের সঙ্গে এঁটে যাচ্ছে। এমনিভাবে গড়ে উঠছে নতুন নতুন জগৎ।

এই জগতগুলি পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে আর লড়াই করে চলেছে, যেমন করে মানুষরা। বিজয়ী হয় বড়ো জগতগুলি, আর ছোট জগতগুলি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। কিন্তু এই সমস্ত টুকরো থেকে সৃষ্টি হয় নতুন নতুন পৃথিবী, নতুন নতুন সূর্য। মহাশূন্যের সীমানা নেই। জগৎ সংখ্যায় সংখ্যাতীত এবং নিয়ত পরিবর্তনশীল।

তারপরে ডিমোক্রিটাস তাঁর ছাত্রদের নিয়ে চললেন বৃহৎ জিনিসের এলাকা থেকে পরমাণুর এলাকায়, যে পরমাণু দিয়ে সবকিছু গঠিত। পরমাণুই হচ্ছে চাবিকাঠি। পরমাণু থেকেই গঠিত হয় এই সমস্ত জগৎ ও স্বর্গীয় বস্তু ও অন্য আর সবকিছু।

শিক্ষক তার ছাত্রদের বললেন, একটা পাত্র নিয়ে তার মধ্যে কানায় কানায় ছাই ভরো। তারপরে তার মধ্যে জল ঢালো। জল পাত্রকে এমনভাবে ভরিয়ে তুলবে যেন পাত্রটা খালি ছিল। তারপরে শিক্ষক বললেন, একটা খালি

পাত্রে জল ভরে নাও আর তার মুখটাকে এঁটে বন্ধ করো। পাত্রটাকে আগুনের ওপরে বসাও। তখন সেই জল পাত্রে বিস্ফোরণ ঘটাবে।

কেন? তার কারণ, ছাই ও জল ও এই জগতের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বস্তু, সবই গঠিত হয় বিপুলসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা দিয়ে। তার নাম পরমাণু। পরমাণুকে আমরা দেখতে পাই না, কারণ তারা খুবই ছোট। তাহলে কি করে আমরা পরমাণু সম্পর্কে জানতে পারলাম? কণিকা যখন এতই ছোট যে আমরা তাকে আমাদের দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ ও আস্বাদন, স্পর্শ, এমনি কোনো ইন্দ্রিয় দিয়েই অবলোকন বা অনুভব করতে পারি না তখন আমাদের সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে আসে আমাদের মন। তার সাহায্যে আমরা সেই কণিকাকে জানতে পারি।

আমরা দেখেছি, ছাইয়ে ভরা পাত্রের মধ্যে জল ঢালা হচ্ছে কিন্তু জল পাত্র থেকে উপচে পড়ছে না। আমাদের মন ব্যাখ্যা করে: জলের পরমাণু ছাইয়ের পরমাণুকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে, যেমন একজন মানুষ ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ঠেলে পথ করে নেয়।

আমরা দেখেছি শক্তভাবে আঁটা পাত্র আগুনের ওপরে বসালে বিস্ফোরিত হয়। আমাদের মন আমাদের বলে: জলের পরমাণুগুলি উত্তপ্ত হয়ে প্রসারিত হয়েছে এবং বন্দিশালার দেয়াল ফাটিয়ে উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

আমাদের কাছে এটা অবাক হবার মতো ঘটনা যে মন্দিরের মূর্তির সোনালী হাত বছরে বছরে সংকুচিত হয়। তখন আমাদের মন ব্যাখ্যা করে: পূজারীদের ঠোঁট যখন সোনার হাত স্পর্শ করে তখন সোনার অদৃশ্য পরমাণুগুলি হাত থেকে খসে পড়ে, ফলে সেই হাত আরো ছোট হয়ে যায় ও শুকিয়ে ওঠে।

এমনি ভাবে, সহজে-বোঝা-যায় এমন ব্যাপার থেকে সহজে-বোঝা-যায়-না এমন ব্যাপারকে বোঝার একটা সুযোগ আমরা পেয়ে যাই।

এই ছিল ডিমোক্রিটাসের শিক্ষা। তাঁর পরে তাঁর শিষ্যদেরও নিরীক্ষার বিষয় ছিল সেই অদৃশ্য কণিকা—পরমাণু।

ডিমোক্রিটাস বললেন, পরমাণুর জগতে কোনো স্থিরতা নেই। তারা সবসময়েই একে অপরের গায়ে ছিটকে এসে পড়ছে, গায়ে গায়ে এঁটে যাচ্ছে, আর এমনিভাবে গড়ে উঠছে ছোট ও বড়ো সমস্ত রকমের বস্তু। সূর্যকিরণের ফালিতে ধুলোর কণাগুলিকে যেমন নাচানাচি করতে দেখা যায়, তেমনি নাচানাচি করে এই পরমাণুগুলি। তাদের আকার নানা বিভিন্ন ধরনের—কেউ ছুঁচলো কোণওলা, কেউ গোল, কেউ আয়ত ক্ষেত্রাকার। কেউ বড়ো, কেউ ছোট। কিন্তু পরমাণুরা নিজেরা সবসময়েই অপরিবর্তিত ও অবিভাজনীয়। পরমাণুতে পরমাণুতে যখন এঁটে যায় তখন তৈরি হয় বস্তু। পরমাণু থেকে পরমাণু যখন ছিটকে সরে যায় তখন বস্তু মিলিয়ে যায়। পরমাণুদের এই খেলা অবিশ্রান্ত চলতে থাকে। তারই ফলে সৃষ্টি হয় নানা বিভিন্ন ধরনের জগৎ, নানা বিভিন্ন ধরনের আকার, রঙ, স্বাদ ও গন্ধ।

পরমাণু থেকে আবার তারার কথায় ফিরে আসা যাক।

মহাকাশের অসীম শূন্যতায় পরমাণুগুলি এলোমেলোভাবে আবর্তিত হতে থাকে। একই ধরনের পরমাণুগুলি একই জোট বাঁধে, যেমন একই জাতের পাখিরা এক ঝাঁকে জড়ো হয়—পায়রা ঝাঁক বাঁধে পায়রার সঙ্গে,

সারসের সঙ্গে সারস। এই আকর্ষণের ফলে পরমাণুদের চলার পথ বদলে যায়, তারা আবর্তিত হতে থাকে, যেমন আবর্তিত হয় ঘূর্ণিবাত্যায় ধরা পড়া বালুকণা বা স্রোতে ধরা পড়া কাঠের টুকরো। এমনি একটি আবর্তনের মধ্যে ভারী পদার্থগুলি কেন্দ্রের দিকে চলে আসে আর হালকা পদার্থগুলি বাইরের দিকে চলে যায়। এখানেও ঠিক এই ব্যাপারটি ঘটেছে—মহাজাগতিক ঘূর্ণিতে ভারী পরমাণুগুলি চলে এসেছে কেন্দ্রের দিকে আর হালকা পরমাণুগুলি সরে গিয়েছে বাইরের দিকে।

পরমাণুগুলির আচরণ ময়দানের ভিড়ে মানুষের আচরণের মতো। গোড়ার দিকে যখন ভিড় পাতলা তখন মানুষগুলি ধাক্কাধাক্কি না করেও খুশিমতো ঘুরে বেড়াতে পারে। কিন্তু যখন সত্যিই ভিড় বাড়ে তখনই শুরু হয়ে যায় ধাক্কাধাক্কি ও ঝগড়াঝাঁটি। সেখানে যার গায়ের জোর বেশি সে জেতে, যার গায়ের জোর কম সে হটে যায়।

জগতের কেন্দ্রের দিকে সরে আসার পরে ভারী পরমাণুগুলি গড়ে তোলে জমি। হালকা পরমাণুগুলি ছড়িয়ে পড়ে জমিকে ঘিরে। সবচেয়ে হালকা পরমাণুগুলি থাকে জমি থেকে সবচেয়ে দূরে—সেটা বাতাস।

জলের পরমাণুগুলি পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে ঠেলা দিতে থাকে আর উপরিতলের দুটি অবতলকে ভরিয়ে তোলে। একটি অবতল হচ্ছে ভূমধ্যসাগর, তার চারদিকে মানুষ বাস করে। অপর অবতলটি রয়েছে পৃথিবীর বিপরীত দিকে এবং সেখানেও নিশ্চয়ই মানুষ বাস করে। ওই জায়গাকে বলা হয় প্রতিপাদ, অর্থাৎ 'বিপরীত পদ'। ভূমধ্যসাগরের মানুষের কাছে যে-দিক 'উপর', প্রতিপাদের মানুষের কাছে সে-দিক 'নিম্ন'।

পৃথিবীর পরিবর্তন হয়ে চলে। জল বাষ্প হয়ে উবে যায়। তার ফলে সমুদ্রের তলদেশ উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে। এই কারণে উঁচু পর্বতের ওপরে শামুকের খোলা পাওয়া গিয়েছে, গুহার মধ্যে পাওয়া গিয়েছে মাছ ও ডলফিনের ফসিল।

পৃথিবী পাক খেতে খেতে মহাশূন্যে ছুটে চলে। চলতে চলতে সাক্ষাৎ পায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের, যেগুলি অন্যান্য জগতের টুকরো। এই টুকরোগুলি পৃথিবীর সঙ্গে পাক খেতে শুরু করে ও তার উপগ্রহ হয়ে ওঠে। পৃথিবী থেকে যতো দূরে তারা থাকে ততো বেশি জোরে তারা পাক খেতে থাকে ও ততো বেশি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

পৃথিবীতে জীবন্ত প্রাণী সৃষ্টি হলো কি ভাবে?

শিক্ষক জানালেন, এইভাবে : পৃথিবী তখনো পুরোপুরি শক্ত হয়ে ওঠেনি। সেই সময়ে ভিতরকার উত্তাপে পৃথিবীর উপরিতলে ঢিবি ফুলে ফুলে ওঠে। এই ঢিবিগুলি ফেটে যায়, যেমন ফেটে যায় ফুলের কুঁড়ি। ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে জীবন্ত সব প্রাণী। যে সব প্রাণীর মধ্যে ভারী পৃথিবীর পরমাণু ছিল সবচেয়ে বেশি সংখ্যায়, তারা বাস করতে থাকে ডাঙায়। যাদের মধ্যে জলের পরমাণু ছিল সবচেয়ে বেশি, তারা যায় জলে। হালকা বাতাসের পরমাণুওলা প্রাণীরা হয়ে ওঠে আকাশের ডানাওলা প্রাণী। সেই গোড়ার দিকের বহু প্রাণী পুরোপুরি মারা যায়। বেঁচে যায় শুধু তারাই যাদের ছিল চতুরতা, সাহস ও দ্রুতগতি।

গোড়ার এইসব প্রাণী থেকেই পরবর্তী কালে এসেছে মানুষ। গোড়ার দিকে মানুষ বাস করত জন্তুর মতো—তারা ছিল উলঙ্গ, তাদের বস্ত্র বা আশ্রয় বা আগুন ছিল না, সারাটা জীবন তাদের কাটত সারাক্ষণ শুধু খাদ্যের অনুসন্ধান করে। প্রত্যেকটি মানুষ নিজেই নিজের খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ত, খুঁজে বার করত খাবার মতো ঘাস, গাছের বুনো ফল খেত। সেটা মোটেও স্বর্ণযুগ ছিল না। কেননা মানুষকে প্রচুর দুর্দশা ভোগ করতে হয়েছিল। অপেক্ষাকৃত দুর্বলরা লোপ পায়, অপেক্ষাকৃত শক্তিমানরা টিকে থাকে।

বুনো জন্তুদের আক্রমণে বিব্রত হয়ে মানুষ তখন একে অপরকে সাহায্য করতে শুরু করল। ভয় তাদের একজোট করে তুলল। ক্রমে ক্রমে একে অপরকে জানতে শুরু করল। তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে তারা শিখল গুহায় আশ্রয় নিতে ও শীতকালের জন্য ফল মজুদ করে রাখতে। পরে যখন শিখল কি করে আগুন পেতে হয় তখন ক্রমে ক্রমে আবিষ্কার করল হস্তশিল্প। মাকড়সাকে দেখে শিখল কি করে বুনতে হয়, চড়ুই পাখিকে দেখে শিখল কি করে বাসা বানাতে হয়, পাপিয়াকে দেখে শিখল কি করে গান গাইতে হয়। শিল্প ও আবিষ্কার দেবতাদের দান নয়। বিনা ব্যতিক্রমে সকল ব্যাপারে মানুষের শিক্ষক ছিল প্রয়োজন।

বুনো জন্তুদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে মানুষ একজোট হয়েছিল। কিন্তু শীঘ্রই সেই মানুষ নিজেদের মধ্যে লড়াই শুরু করে দিল। একজন অপরজনকে হিংসা করতে শুরু করল আর চেষ্টা করল তার সম্পত্তি কেড়ে নিতে। মানুষ যাতে পরস্পরকে আঘাত করতে না পারে সেজন্য প্রয়োজন হলো আইনের।

এই কারণেই রাষ্ট্র এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক মানুষের চেষ্টা করা উচিত রাষ্ট্রকে যতোটা সম্ভব নিখুঁত করে তোলার। এজন্য তার সন্তুষ্ট থাকা দরকার যতোটুকু সম্মান তার প্রাপ্য তাই নিয়ে, যতোটুকু ক্ষমতা সাধারণের পক্ষে মঙ্গলকর তাই নিয়ে। রাষ্ট্র যদি ভালোভাবে চলে তাহলে সকলেরই ভালো হয়। রাষ্ট্র যদি লোপ পায় তাহলে সকলেই লোপ পায়।

সমতা এক আশ্চর্য জিনিস। এই কারণেই রাজতন্ত্রে ধনী থাকার চেয়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গরিব থাকা ভালো। যেমন ভালো দাস থাকার চেয়ে স্বাধীন থাকা।...

এমনিভাবেই সৃষ্টি হয়েছে জগতের সবকিছু—পৃথিবী, সূর্য, সমুদ্র, পর্বত, মানুষ ও মানুষের আইন—দেবতাদের ইচ্ছায় নয়, কারণ ও প্রতিফলের অনিবার্য বিকাশধারায়।

ডিমোক্রিটাসের বইয়ে এসব কথা বলা হয়েছে। তারা যখন সেগুলি পড়ল, তখন—কি শিষ্যরা, কি তাদের শিক্ষক—পর্যটন করে বেড়াল তারা থেকে পরমাণুতে, পরমাণু থেকে তারায়। লোকে তাঁর বক্তব্যকে অন্য দার্শনিকদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখল—যথা, থালেস ও আনাক্সিমান্দের, এম্পিডোসিস এবং মাইলেসিয়ার অপর এক বিজ্ঞানী লিউসিপাস। শেষোক্ত জনও পরমাণুর নৃত্য সম্পর্কে জানতেন। ডিমোক্রিটাসের গ্রন্থে মনুষ্যজাতির সামনে বিশ্বের এক নতুন মানচিত্র উন্মুক্ত হলো।

৫। অগ্রসর ও পশ্চাৎপদ মানুষদের সম্পর্কে

দুটি সিধে পথ ছিল। মানুষ দাঁড়িয়েছিল দুই পথের মাঝখানে।

ডানদিকের পথ চলে গিয়েছিল তারাদের বৃহৎ জগতে। বাঁ-দিকের পথ পরমাণুদের বৃহৎ জগতে। পরবর্তী দু-হাজার বছরে মানুষ এগিয়ে গিয়েছিল বাঁ ও ডান উভয় পথ ধরেই। সে উন্মুক্ত করেছিল পর্বত, দখল নিয়েছিল সমুদ্রের ও মরুভূমির।

এমন সময় ছিল যখন সে ভাবত স্বদেশের নদীটির ছোট উপত্যকাটিই হচ্ছে সারা জগৎ। তারপরে সে এই সিদ্ধান্তে পোঁছেছিল যে সমুদ্রের পরেই জগৎ শেষ। এই সমুদ্রকে ঘিরে বাস করে মানুষ, যেমন পুকুরকে ঘিরে বাস করে ব্যাঙ। জগৎ আরো বড়ো হয়ে উঠল। সে তখন সিদ্ধান্ত করল যে এই জগৎ হচ্ছে একটা বৃত্ত বা একটা গোলকের মতো। পরিশেষে সিদ্ধান্ত করল যে এই জগৎ হচ্ছে অসংখ্য জগৎ বা বিশ্ব।

গেল সে অন্য দিকে, ক্ষুদ্র বস্তুর এলাকায়। এমন সময় ছিল যখন সে ভাবত বালুকণা হচ্ছে সবচেয়ে ছোট যা হওয়া সম্ভব তেমনি একটি কণিকা। সে দেখেছিল পাথর কি-ভাবে ঘষা খেয়ে খেয়ে ক্ষয়ে যায়, শস্যের দানা কি-ভাবে যাঁতায় পেষাই হয়, মন্দিরের মূর্তির সোনার হাত কি-ভাবে অসংখ্য মানুষের চুম্বনে ক্ষয়ে যায়। দেখেছিল বৃহৎ বস্তু তৈরি হয় ক্ষুদ্র বস্তু দিয়ে। নিজেকে প্রশ্ন করেছিল : এই ক্ষুদ্র কণিকাগুলিকে যদি আরো ভাগ করে চলা হয়—তাহলে? নিশ্চয়ই একটা জায়গায় গিয়ে এর শেষ আছে, কেননা মানুষের পক্ষে এই ধারণা করাটাই শক্ত ছিল যে সে নিবন্ধ হয়ে আছে অনন্তের দিকে। তখন সে সিদ্ধান্ত করল যে বস্তু তৈরি হয় এত ক্ষুদ্র সব কণিকা দিয়ে যেগুলি সম্ভবত আর ভাগ করা যায় না। এই ক্ষুদ্র কণিকা-গুলির নাম সে দিল পরমাণু। গ্রীক ভাষায় কথাটার অর্থ, 'অবিভাজ্য'। তখন ধারণা হলো যে জগতের সবকিছু গঠিত হয় এই অবিভাজ্য কণিকাগুলি দিয়ে, অর্থাৎ পরমাণু দিয়ে।

এমনিভাবে মানুষ, অতিকায় মানুষ, উভয় পথ ধরে আরো অগ্রসর হয়ে চলল।

কেননা, মানবজাতি অতিকায়—লক্ষ লক্ষ মানুষ নিয়ে যে মানবজাতি। প্রগতিশীলরা যখন অগ্রসর হয়ে চলল তখন বিপুল সংখ্যক পড়ে রইল পিছনে। পিছনে থেকে টেনে টেনে চলল।

প্রথম দলের নেতা ছিলেন লিউসিপাস ও ডিমোক্রিটাস। কিন্তু ঠিক যে-সময়ে তাঁরা এই সমস্ত আবিষ্কার করছেন তখনই হয়তো কোনো একজন কুমোর আধা-মানুষ আধা-ছাগল শিঙ-ওলা এক মূর্তি তার চুল্লির ওপরে টাঙিয়ে রাখছে—যাতে এই মানুষ-ছাগল দুষ্ট আত্মাকে হটিয়ে দেয়। সর্দার কুমোর তার দাসদের ওপরে হুকুম চালায়। সেই দাসরা যে আলাদা আলাদা মানুষ সেটা সে আদৌ মনে করে না। তাদের গালাগালি দেয়, মারধোর করে। কিন্তু যখন তারা কোনো একটি মাটির পাত্র তৈরির কাজ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করে, তার চাকচিক্যটা চমৎকার ফুটিয়ে তোলে, তখন তার পুরো কৃতিত্ব

নিজে নিয়ে নেয়। একবারও ভাবে না কারা এই কাজটি করেছে। দাসরা তাদের কাজের জন্য একটি পয়সাও পায় না!

কখনো কখনো একজন গরিব দাস কুমোরশালার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটা বিষণ্ণ গান গেয়ে চলে। কখনো কখনো এমনও হয় যে প্রভু কুমোরশালায় ফিরে আসতে গিয়ে তাকে দেখতে পায়। তার বিষণ্ণ গান শুনতে শুনতে প্রভুর ভয় ধরে যায় যে এর ফলে কুমোরশালার ওপরে কু-নজর পড়ে যাবে আর বিক্রি বন্ধ হয়ে যাবে। চোখ-মুখ পাকিয়ে রাগে গরগর করতে করতে সে নিজের পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেয় আর নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে একটা কি দুটো পয়সা দাসের দিকে ছুঁড়ে দেয়। কেননা ডিমোক্রিটাসের সমসাময়িক এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষটি তখনো ডাইনী ও যাদুতে বিশ্বাস করে।

এমনকি ডিমোক্রিটাসের নিজের শিক্ষাতেও পুরনো বিশ্বাসের ছিটেফোঁটা থেকে গিয়েছিল। ডিমোক্রিটাস দেবতায় বিশ্বাস করতেন না কিন্তু বিশ্বাস করতেন কু-নজরে। তিনি মনে করতেন, একজন ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি কু-প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তিনি যখন শিশু তখন তার পারসিক শিক্ষকরা তাকে যাদুর রহস্য সম্পর্কে জানিয়েছিলেন। এবং তিনি এখনো বিশ্বাস করে চলেছেন ভাগ্য গণনায়, ভবিষ্যদ্বাণী করণে, দৈববাণী ঘোষণাকারী স্বপ্নে।

যাদু থেকে আস্তে আস্তে জন্ম নিচ্ছিল বিজ্ঞান। কিন্তু লোকের তখনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না কোন্‌টা ঠিক কোন্‌টা ভুল, কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা কুসংস্কার। এ থেকে বোঝা যায় কেন এই পুরনো বিশ্বাসগুলি টিকে ছিল। ডিমোক্রিটাসের মতো বিরাট পন্ডিতও এই সমস্ত কুসংস্কার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি, যদিও তিনি চেষ্টা করছিলেন।

তিনি বলতেন, 'প্রাচীন কালে লোকে ভাবত ডাইনীরা আকাশ থেকে চন্দ্র ও সূর্যকে সরিয়ে ফেলতে পারে। সেই কারণে আজকের দিনেও বহু লোক গ্রহণকে বলে গ্রাস।'

ডিমোক্রিটাস সবসময়েই সবকিছুর স্বাভাবিক ব্যাখ্যা খুঁজতেন। ভাবতেন, ঈর্ষাপরায়ণ মানুষের কেন কু-নজর হয়? খুব সম্ভবত এই কারণে যে তার চোখ থেকে বদ আলো বেরিয়ে আসে আর সেই আলো লোকের ভিতরে ঢুকে গিয়ে তার ক্ষতি করে। দৈববার্তা ঘোষণাকারী স্বপ্ন মানুষ কেন দেখে? এই কারণে যে এমনকি ঘুমের মধ্যেও তার মধ্যে প্রবিষ্ট হয় ভালো কিংবা মন্দ মূর্তি। এই মূর্তিগুলি বস্তুহীন দৃশ্য নয়, তারা হচ্ছে বিভিন্ন বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া বাতাসের পরমাণু। পরমাণুগুলি যখন চোখের ভিতরে ঢোকে তখন মানুষ দেখতে পায়, যখন কানের ভিতরে ঢোকে তখন মানুষ শুনতে পায়।

আড়াই-হাজার বছর পরে আজকের দিনে আমাদের মনে হতে পারে যে ডিমোক্রিটাসের ধ্যানধারণা ছিল অমার্জিত ও অপরিণত। এখন আমরা জানি পরমাণু সম্পর্কে তিনি যা ধারণা করেছিলেন তা থেকে পরমাণু একেবারেই আলাদা। পরমাণুর আচরণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা কখনো পরমাণুকে সারসের সঙ্গে বা ময়দানের মানুষের সঙ্গে তুলনা করি না। যে-নিয়মে পরমাণু চালিত তার সঙ্গে আদৌ মিল নেই সেই নিয়মের যার দ্বারা পাখি চালিত বা একটি গ্রীক নগরের মানুষরা চালিত। ডিমোক্রিটাসের কাছে যা সত্য ছিল আমাদের কাছে তা সত্য নয়।

তবুও একথা সত্য যে আমাদের আধুনিক বিজ্ঞানের আদিতে রয়েছে তাঁরই শিক্ষা। তাঁর যে-বই আমাদের কাল পর্যন্ত টিকে আছে সেটি পড়লে আমরা জানতে পারি, বইয়ের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় কী উজ্জ্বল ও মূল্যবান সব চিন্তাধারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সময়ে যা ধ্বংস হয়নি। ডিমোক্রিটাসের পরমাণু আমাদের পরমাণুর মতো নয়—তাতে কী হয়েছে? তিনি ভুল করেছিলেন, তা সত্ত্বেও অদৃশ্য কণিকার জগতটির সঠিক হদিশ দিয়েছিলেন।

গতির নিত্যতা, বিশ্বের অসীমতা, জগতের বহুতা, জীবদের মধ্যে যোগ্যের টিকে থাকা—ডিমোক্রিটাসের ধ্যানধারণার কত কিছুই না আজকের দিনে আমাদের বিজ্ঞানে গৃহীত হয়েছে। তাঁর ভুলগুলি সম্পর্কে কী বলা হবে? এই ভুলগুলির জন্য আমরা তাঁর দোষ ধরব?

ডিমোক্রিটাস ছিলেন তাঁর সময়ের বিজ্ঞতম ব্যক্তি। কিন্তু তিনি সীমাবদ্ধ ছিলেন তাঁর এলাকার দ্বারা, তাঁর মানুষদের দ্বারা, তাঁর শ্রেণীর দ্বারা। তিনি যে-গণতন্ত্রের পক্ষে ছিলেন তা বহুজনের দাসত্বের ভিত্তিতে অল্প কয়েকজনের গণতন্ত্র। তিনি মনে করতেন, স্বাধীনতা স্বাধীন মানুষদের ভাগ্যলিপি, আর দাসদের থাকা উচিত দাস হিসেবেই। 'তোমার হাত ও পা যেমন ব্যবহার করো তেমনি ব্যবহার করো দাসদের।' তিনি সমতায় বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তবুও এই ধারণা পোষণ করতেন যে ইতর জনতার হাতে ক্ষমতা থাকা উচিত নয়, যে ইতর জনতা গ্রীক নগরগুলিতে ধনীদের বিরুদ্ধে ও বীরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

রাজ্যে এবং পরমাণুর জগতে প্রথম স্থান শক্তিশালীদের। গরিব ও নিচের মানুষরা ক্ষমতা লাভ করার যোগ্য নয়।

সকল ধনী দাস-মালিকদের এই ছিল মতামত। ডামাসিপাসের পুত্র ডিমোক্রিটাসের এই ছিল মতামত।

৬। সামনে রাস্তা বন্ধ

স্বাধীনতা ও ভাগ্যকে বশে আনার পথে মানুষ বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে এসেছে।

তবুও বিজয় উৎসব করার সময় এখনো আসেনি।

স্বাধীনতার পিতৃভূমি হচ্ছে এথেন্স। কিন্তু এই যে কপালে মার্কামারা লোকগুলিকে এথেন্সের রাস্তায় দেখা যাচ্ছে—এরা কারা? মার্কাটি এমন যে মুছে ফেলা যায় না, তাতে লেখা : আমি পালিয়ে যাচ্ছি আমাকে ধরো। এই যে স্ত্রীলোকেরা মাঠে ফসল কাটছে তাদের গলায় কেন অদ্ভুত চেহারার কাঠের চাকা? বাজারে এই যে সারি সারি বিদেশীকে ঠিক পণ্যসামগ্রীর মতো সাজিয়ে রাখা হয়েছে—তার মানে কী?

লোকে তাদের চক্কর দিয়ে দৌড় করাচ্ছে, তাদের মুখ পরীক্ষা করছে, তাদের মাংসপেশী টিপে দেখছে। স্বাধীন মানুষদের সঙ্গে এমন আচরণ কদাচ করা হয়।

এরা সকলেই দাস। এথেন্সে স্বাধীন মানুষদের চেয়েও অনেক বেশি রয়েছে দাস। সর্বত্র দেখা যায় দাসদের—তারা রান্না করছে, শিশুর সেবাযত্ন করছে, দোকানে ও কামারশালায় কাজ করছে।

ওই যে স্ত্রীলোকটি গম পিষছে ও একজন দাস। ওর গলা ঘিরে যে চাকতিটি রয়েছে সেটা এজন্য যে পেষাই করতে করতে শস্যের দানা যেন ও মুখে পুরতে না পারে। বাজারে যে লোকগুলিকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে ওরাও দাস, পণ্যসামগ্রীর মতো ওদের বিক্রি করার জন্য আনা হয়েছে। একটা মোষের দাম প্রায় একশো দাক্মী, একজন মানুষের দাম তার চেয়ে খুব বেশি নয়—প্রায় একশো-পঞ্চাশ দাক্মী। কারখানা যখন বিক্রি হয় তার সঙ্গে দাসরাও বিক্রি হয়ে যায়—যেমন, তিনটি নেহাই, তিনটি হাতুড়ি, পাঁচজন দাস। এথেন্সের সবচেয়ে বিজ্ঞ মানুষদের সঙ্গে কথা বললেও শোনা যাবে, দাস ছাড়া তাদের চলে না। দাস হচ্ছে জীবন্ত হাতিয়ার। জাহাজের হাল একটি মৃত হাতিয়ার, কিন্তু জাহাজের ডেকের ওপরে হেঁটে বেড়াচ্ছে যে নাবিক সে জীবন্ত হাতিয়ার। এইটুকুই মাত্র তফাৎ। কিন্তু দাস নিজে এত সহজে স্বীকার করতে রাজী নয় যে সে একটা জীবন্ত হাতিয়ার মাত্র। নেহাই ঘা খেয়েও তা টের পায় না। হাতুড়ি জানে না স্বাধীনতা কী। কিন্তু মানুষ বুঝতে পারে, ঘা খেলে সে টের পায়, কষ্টের অনুভূতি তার আছে।

আর যতোই সে তার দুর্ভাগ্যের ভার অনুভব করতে থাকে ততোই জোরালো ভাবে সে তার নিজের ইচ্ছাকে দাঁড় করায় তার মালিকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। হাতুড়ি কখনো লাফিয়ে উঠে কামারের মাথা ফাটিয়ে দিতে পারে না। নেহাই কখনো রাত্তিরবেলা কামারশালা থেকে পালিয়ে গিয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতে পারে না।

কিন্তু একজন মানুষ তা পারে।

অতএব জীবন্ত পণ্য ও তার মালিকের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। দাসরা বিদ্রোহ করল। তারা পালিয়ে যেতে লাগল কামারশালা থেকে, কারখানা থেকে, খনি থেকে। খনিতে যারা কাজ করত তাদের হারাবার কিছু ছিল না। খনির মধ্যে আগে থেকেই তারা ছিল মৃত্যুর মুখে, সেখানে তারা শুধু আশা করতে পারত নিঃশ্বাসের একটুখানি বাতাস—যেমন মরুভূমিতে লোকে আশা করে তৃষ্ণার এক আঁজলা জল। জীবন্ত হাতিয়াররা পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রইল জঙ্গলে ও পর্বতে। যখন তারা ধরা পড়ল, তাদের মার্কা দেওয়া হলো, এমন একটা জোয়ালে দুজন করে বাঁধা হলো যে একজন উঠে দাঁড়ালে অপরজন পড়ে যায়। রাত্তিরবেলা তাদের তালাবন্ধ করে রাখা হলো। কারাগারের যে কুঠরিতে তাদের রাখা হলো তা ছিল এত সরু ও এত চাপা যে তারা পিঠ বেঁকাতে বা পা সোজা করতে পারত না। তাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করা হতে লাগল যেন তারা প্রকৃতই লোহায় তৈরি, যেন তাদের কোনো অনুভূতি নেই।

আর এই কাজগুলি করছিল এথেন্সের সেই সব মানুষ যারা নিজেদের স্বাধীনতাকে ভালোবাসত, যারা মানুষের দেহের সুষমা ও ছন্দকে তারিফ করত।

তারা একেবারেই বুঝতে পারত না এইসব কাজ তাদের নিজেদের পক্ষে কত বিপজ্জনক। প্রথমতঃ, আরও বেশি বেশি দাস পাবার জন্য তাদের সব-সময়ে যুদ্ধ চালাতে হতো। আর যুদ্ধ সবসময়েই প্রচন্ড খরচের ব্যাপার। যে কোনো যুদ্ধেই দেশ ধ্বংস হয়ে যায়। দাস-মালিকদের চেয়ে বেশি হয়ে যায় দাস, আর স্বাধীন মানুষের সংখ্যা ক্রমেই কমতে থাকে। একজন মজুর

ভাড়া করার চেয়ে জীবন্ত একটি হাতিয়ার কিনে নেওয়াটা অনেক কম খরচের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আর একজন দাস হাজির হলেই একজন স্বাধীন মজুর ছাঁটাই হয়ে যায়। যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা সৈন্যরা দেখত জীবিকা অর্জনের কোনো উপায় তাদের নেই। এথেন্সে বেকারদের সংখ্যা প্রতি বছর বাড়ছিল। তাদের আর কিছু ছিল না, কিন্তু ছিল এই সগর্ব বোধটুকু যে তারা স্বাধীন নাগরিক। বেঁচে থাকার জন্য কয়েকটা ওবোল্ রোজগার করাটাও প্রতি বছর তাদের পক্ষে আরো বেশি বেশি শক্ত হয়ে দাঁড়াল। তাদের একমাত্র রোজগার ছিল এই যে সাধারণ সমাবেশে যোগ দিলে রাষ্ট্র থেকে তিন ওবোল্ করে দেওয়া হতো। তখন সেই সভা চলাকালেই, চারদিকের চিৎকার ও হই-হট্টগোলের মধ্যেই তারা খাবার ও পানীয় কিনে খেয়ে ফেলত। কিন্তু এমন সৌভাগ্যের দিন ক্রমেই কমে আসতে লাগল।

তখন ভিড় শুরু হলো আদালতে। তারা গেল এই আশা নিয়ে যে ওখানে কিছু একটা কাজ পেয়ে যেতে পারে। আদালতের কাজেও তিন ওবোল্ করে দেওয়া হতো। এক্ষেত্রে সৌভাগ্য দেখা দিত দ্বিগুণ মাত্রায়—কেননা একদিকে পাওয়া যেত খাদ্য, অন্যদিকে সম্মান।

কিন্তু সবাইকে জুরির কাজে নেওয়া যেত না। মামলায় বাদী হতে পারলেও পয়সা পাওয়া যেত। ফলে অনেকেই অন্য লোকের নামে মিথ্যে মামলা আনত। কিংবা মামলা আনবে বলে কোনো নিরীহ লোককে শাসাত যাতে সেই লোক মামলা বন্ধ করার জন্য পয়সা দেয়। কিছু লোক ছিল যাদের এটাই ছিল নিত্যকার কাজ।

রাস্তায় ভুখা মানুষের ভিড় প্রতিদিন বাড়তে লাগল। তারা প্রচণ্ড আক্রোশ নিয়ে তাকাতে শুরু করল সেই ধনীদের দিকে যারা প্রচুর বিলাসিতা ও আড়ম্বর দেখিয়ে বেড়াত, যারা দুপুরের গরমে ঠাণ্ডা ছায়ায় আশ্রয় নিত, যারা বন্ধুদের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে যেত পুরোদস্তুর সাজপোশাক করে আর এমন সুগন্ধ ছড়াতে ছড়াতে যে মনে হতো তারা যেন একটা সুগন্ধীর বোতল থেকে বেরিয়ে এসেছে, আর যারা এমন পিরাণ গায়ে দিত যার দাম অন্ততপক্ষে কুড়ি দ্রাক্‌মী, যা দিয়ে তিনমাস খাওয়া-পরার খরচ ভালোভাবে চলতে পারে। ভাঁজ করা চেয়ার কাঁধে নিয়ে তাদের পাশে পাশে ছুটত দাসরা, যেন রাস্তায় চলতে চলতে ইচ্ছে হলেই তারা বিশ্রাম নেবার জন্য বসতে পারে। প্রায়ই তাদের মধ্যে কেউ কেউ পালকি-চেয়ারে চলাফেরা করত। সেই চেয়ার বয়ে নিয়ে যেতে হতো দাসদের। অর্থাৎ এই দাসরা প্রভুদের সেবায় যেমন লাগাত তাদের পা, তেমনি তাদের হাত। প্রভুদের যে কত অর্থ ছিল তার যেন কোনো সীমাপরিসীমা নেই। বাইরে থেকে তারা আমদানি করত মধু, শখের কুকুর, সুগন্ধ। তাদের ঘরের দেয়াল থেকে ঝুলত পারস্যের অমূল্য গালিচা। তাদের করার মতো কোনো কাজ ছিল না,. তাই তারা বাঁদর পুষত আর বাঁদরকে নানারকম খেলা শেখাত।

এই স্বাধীনতা দাসত্বের ওপরে নির্মিত। তার ফলে কেউ কেউ বেকার হতো, আর কেউ কেউ হতো অলস পরজীবী। বেকাররা অলস ধনীদের ঘৃণা করত। নগর ছিল প্রকৃতই দুটি—একটি অনাহারীদের, অপরটি অতিরিক্ত আহারীদের। বেকারদের ক্রোধ দিনে দিনে বাড়তে লাগল আর তার ফলে জনসভাগুলিতে দাঙ্গা হতে লাগল। এই সমস্ত ঝড় কি-ভাবে শান্ত করা

যায় তাই ছিল সে-সময়ের সমস্যা। বেকারদের কাজে লাগানো হলো নগরকেন্দ্রের মন্দিরগুলিতে ও নগরের চারদিকের দেয়ালে। কিন্তু এতে সমস্ত বেকারকে কাজ দেওয়া গেল না। আর আসল কথা ছিল এই যে এথেন্সের মানুষরা কাজ করার মন হারিয়ে ফেলেছিল। দাসরা আসার পর থেকে কাজ করাটা হয়ে উঠেছিল লজ্জার ব্যাপার, এমন একটা কিছু যার জন্য একমাত্র দাসরাই উপযোগী। একটা সময় ছিল যখন কাজ করার ব্যাপারে খুব বেশি অলস হওয়াটাই লজ্জার ব্যাপার বলে মনে করা হতো, এমনি অলস লোককে দেবতারা ভালোবাসে না। তারপরে লোকে কাজকেই ঘৃণা করতে শুরু করল। বলল, কাজ করলে যেমন আত্মা তেমনি শরীর হয়ে পড়ে কুৎসিত ও কদাকার। 'যে লোক সারাদিন উবু হয়ে কাজ করে তার পিঠ স্থায়ীভাবে বেঁকে যায় আর তখন রাষ্ট্রের বিষয় নিয়ে বা আত্মার উচ্চতর অনুধাবনের বিষয় নিয়ে চিন্তা করার সময় তার থাকে না। এই সুন্দর দেহ যদি দুর্বল ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে তাহলে আত্মাও তার শক্তি হারায়।'

কাজ মানুষকে চিন্তা করতে শিখিয়েছে, আর এখন কিনা তারা কাজকেই ঘৃণা করে। সবচেয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তি যিনি তিনিও চিন্তা করতে শিখেছিলেন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে। কিন্তু এখন ব্যাপারটা ঘুরে গিয়েছে, তারা ভাবছে চিন্তাই মানুষকে শিখিয়েছে কি-ভাবে কাজ করতে হয়! এর ফলে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ব্যাহত হলো।

এই উভয় সংকট থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কী? তাহলে দাসত্ব লোপ করতে হয়। কিন্তু দাসত্ব লোপ করার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবে না। একথা বুঝতে পারার সময় এখনো আসেনি। তারা ভাবত, দাসত্ব ছাড়া জীবন চলতেই পারে না। দাসরা থাকবে, এটাই দেবতাদের চিরকালের বিধি।

অনাহার ও ভিক্ষাবৃত্তি থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য গরিব মানুষরা কোথায় যেতে পারে? দেশ থেকে পালিয়ে গেলে কেমন হয়? সে চেষ্টাও তারা করে দেখল। বাইরে পাড়ি দিচ্ছিল যে-সব জাহাজ সেগুলি দেশত্যাগী-দের ভিড়ে ভরে গেল। স্বদেশে যাদের জীবন এত দুঃখকষ্টের তারা বিদেশে গিয়ে পেতে চাইল সুখী জীবন। তাঁদের মনে হয়েছিল তাদের হারাবার কিছু নেই কিন্তু তবুও তাদের ছিল মাতৃভূমি। এখন সেই মাতৃভূমিও তারা হারাল। নগরের দিকে শেষবারের মতো তাকিয়ে দেখল তারা, নগর-কেন্দ্রের অট্টালিকাগুলির মধ্যে তাদের ঘরবাড়ির দিকে। আস্তে আস্তে ঝাপসা হতে হতে নগর একেবারে মিলিয়ে গেল। তখনো দেখা যাচ্ছিল সবুজ পাহাড় আর পালাস আথেনার হাতে ধরা সোনালী বর্শার ফলক। শেষকালে তাও মিলিয়ে গেল।

এই স্বাধীন মানুষগুলি তাদের ঘর হারাল এই কারণে যে দাস ছিল সংখ্যায় বড়ো বেশি।...

৭। পিছনপানে মানুষের দৃষ্টি

অতীতের কথা মানুষের প্রায়ই মনে পড়ত। তাদের মনে হতো, অতীতের দিনগুলি আরো ভালো ছিল, তখনো সত্যের অস্তিত্ব ছিল এই পৃথিবীতে, স্বর্গে নয়। সেই সময়ে দাস ছিল না, ছিল না ধনী ও গরিব।

ডায়োনাইসাস উৎসবের দিনগুলিতে তারা স্বর্ণযুগ সম্পর্কে একটা গান গাইল। সেটা ছিল সুখের গান—এমন এক সময়ের গান যখন কোনো যুদ্ধ ছিল না। প্রকৃতি নিশ্বাস ফেলত শান্তির সঙ্গে। অসুখবিসুখ বলে কিছু ছিল না। প্রকৃতি উজাড় করে ঢেলে দিত মানুষের যা-কিছু প্রয়োজন—সমস্তই। নদীতে বইত জলের বদলে সুরা। মধুর পিঠে বলত, 'ভালো ভালো পিঠে খেয়ে নাও।' মাছগুলি স্বেচ্ছায় খাবার টেবিলে লাফিয়ে উঠে আসত আর বলত, 'যতো খুশি খাও।' গাছ থেকে টুপ করে খসে পড়ত পাতার বদলে ঝলসানো পাখি।

এই আনন্দময় গান গমগম করে বেজে উঠত আর সমস্বরে সবাই বারবার গাইত এই লাইনটি : 'সে-সময়ে পৃথিবীতে কখনো শোনা যায়নি যে দাস বলে কোনো কিছু আছে।' এটি ছিল সুখের গান। কিন্তু লোকে এই গান গাইত কারণ তারা নিজেরা ছিল অসুখী। কেননা, দেখাই যাচ্ছে, তারা সব সময়েই ক্ষুধার্ত থাকত। এটা তাদের দুর্ভাগ্য যে তারা জন্মেছিল স্বর্ণযুগে নয়, লৌহযুগে।

অতএব মানুষ পিছন ফিরে তাকাল। সামনের দিকে যখন যাচ্ছিল তখন দেখতে পাচ্ছিল না পথ তাকে কোথায় নিয়ে চলেছে। সুখের গান যখন গাইছিল তখন ভুলে থাকতে পারছিল যে-যুগে তার বাস সেই লৌহযুগের কথা।

এটা স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু এমনকি স্বপ্নও তাদের কাছে অর্থবহ। এই প্রথম মানুষ স্বর্ণযুগের স্বপ্ন দেখল। সেই গানের লাইন আবার সে গাইল : 'সে-সময়ে দাস ছিল না—না পুরুষ দাস, না মেয়ে দাস।' এই সুখের গান, এই অতীতের ভাবনা তাকে বেঁচে থাকার আশা ও উৎসাহ দিল। সেই যে স্বপ্ন তখন জন্ম নিল সেই স্বপ্ন আজকের দিন পর্যন্ত চলে এসেছে। কিন্তু লোকে বুঝতে শুরু করেছে স্বর্ণযুগ রয়েছে তাদের পিছনে নয়, সামনে। ভবিষ্যতে স্বর্ণযুগের স্বপ্ন হচ্ছে এমন সময়ের যখন প্রকৃতি হবে মানুষের দাস, যখন আর যুদ্ধ থাকবে না, যখন পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ হবে স্বাধীন।

কিন্তু তখনো পর্যন্ত মানুষ ছিল লৌহযুগে। আর জীবন হয়ে উঠল দিনে দিনে আরো কণ্টকর।

এথেন্সে সবকিছুই ছিল একটা অনিশ্চয়তা ও ভয়ের অবস্থায়। যারা ছিল বিক্ষুব্ধ, তাদের গলার আওয়াজ ক্রমেই আরো জোরালো হয়ে উঠল। আরো বেশি আশা নিয়ে লোকে তাকাতে লাগল অতীতের দিকে, সেই স্বর্ণযুগের দিকে যখন তাদের বাপ-ঠাকুর্দারা জীবন কাটাচ্ছিল, যখন ছিল 'পুরনো সেই সোনার দিন'। তারা ক্রমেই আরো ভালোভাবে বুঝতে শুরু করল যে এথেন্সের মানুষরা হচ্ছে শান্তির শত্রু। এথেন্সের স্বাধীন মানুষদের তারা নিজেদের শত্রু হিসেবে ঘৃণা করতে শুরু করল।

অলিম্পাসের পেরিক্লেসের পক্ষে ঘনায়মান সেই ঝড় থামানো ক্রমেই আরো শক্ত হয়ে উঠল। শুধু সমুদ্রে নয়, দেশের জমিতেও, সমাবেশের মানুষের গলায় যতো নালিশ শোনা যাচ্ছিল তা থামানো তার পক্ষে শক্ত ছিল। প্রকাশ্য শত্রুও ছিল তার অনেক। সে ছিল অভিজাত, কিন্তু খোদ অভিজাতরাই তাকে পছন্দ করছিল না, কারণ সে সাধারণ মানুষের পক্ষে

চলে গিয়েছিল। বিখ্যাত যোদ্ধা ও অভিজাতদের বংশধররা ঘৃণা করত কারিগর, তাঁতী, কুমোর ও মুচীদের হট্টগোলকারী জনতাকে। আর তারপরে অভিজাতরা যখন আরো একবার নিজেদের হাতে ক্ষমতা নিতে চেষ্টা করল তখন সাধারণ মানুষরা তাদের নির্বাসনে পাঠিয়ে দিল।

অভিজাতরা অনেকেই দেশের বাইরে বিতাড়িত হবার জন্য অপেক্ষা করে থাকল না। তারা এমন এক দেশে গিয়ে আশ্রয় নিল যেখানে অতীত বিস্মৃত নয়। গেল স্পার্টায় যেখানে মানুষ বাস করত শিলাময় পাহাড়ের ওপরে, যেখানে অতীতের রীতিনীতি মেনে চলা হতো। জীবিকা অর্জনের জন্য তারা সমুদ্রের ওপরে বা হস্তশিল্পের ওপরে বা বাণিজ্যের ওপরে নির্ভর করত না। তাদের প্রধান নির্ভর ছিল কৃষির ওপরে, জমিতে কাজ করার ওপরে। এসব কাজ করানো হতো হেলোটদের অনিচ্ছুক হাত দিয়ে। স্পার্টানরা হেলোটদের বাধ্য করত তাদের হয়ে কাজ করার জন্য। এই হেলোটরা ছিল নিচুবংশীয় মানুষ, দেবতা ও বীরদের বংশধরদের কাছে তারা মাথা নত করেছিল।

এমনকি স্পার্টানদের মুদ্রা পর্যন্ত ছিল একেবারে ভিন্ন ধরনের। তাদের মুদ্রা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোহার বাট, যেগুলি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় টেনে নিয়ে যেতে হলে একপাল ষাঁড় লাগত। টানাটানি তারা বিশেষ করতও না, লোহার বাট থেকে যেত বাড়ির মধ্যেই, সেটা বড়ো একটা ব্যবহার হতো না।

স্পার্টা তাকাত এথেন্সের দিকে আর ভাবত : এথেন্সের যদি এমন মতি হয় যে গ্রীসের সমস্ত নগর তার আওতায় নিয়ে আসবে তাহলে কী হবে? এমনও হতে পারে যে এথেন্স আমাদের দখল করে নিল—তখন? তখন তো আমাদের যা কিছু পুরনো রীতিনীতি ও ঐতিহ্য তা আচমকা নিশ্চিতভাবেই শেষ।

আস্তে আস্তে কিন্তু সমানে স্পার্টা ও এথেন্সের মধ্যে শত্রুতা বাড়তে লাগল। শত্রুতা বাড়তে লাগল স্থল-শক্তি ও সমুদ্র-শক্তির মধ্যে, অতীত ও বর্তমানের মধ্যে। এথেন্সের শক্তির বন্যাকে রোধ করার জন্য এথেন্সের সকল শত্রুকে যদি স্পার্টা এক করতে পারত!

কিন্তু এথেন্সের সবচেয়ে বড়ো শত্রু ছিল নগরের মধ্যে। সেই মানুষরা যারা দিন কাটাত খুব কষ্টের মধ্যে। ঘরের এই বিক্ষোভকে উস্কিয়ে তুলে একটা আগুনে পরিণত করতে কি স্পার্টা পারবে? সাধারণ সমাবেশগুলিতে পেরিক্লেসের বিরুদ্ধে গলার আওয়াজ ক্রমেই জোরালো হয়ে উঠল। তাই পেরিক্লেসের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ চালানো অসম্ভব ছিল। স্পার্টা তখন অসুবিধাজনক অবস্থা তৈরি করতে লাগল পেরিক্লেসের পক্ষে নয়, তার বন্ধুদের পক্ষে। ভাস্কর ফিডিয়াসকে তারা কারাগারে পুরল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ—আথেনার ঢালের ওপরে সে তার নিজের ও পেরিক্লেসের অনুরূপ মূর্তি বসিয়েছে। কী আস্পর্ধা, নশ্বর মানুষের মূর্তি কিনা অবিনশ্বর দেবতাদের মধ্যে!

ফিডিয়াস কারাগারে মারা গেল। পেরিক্লেসের প্রিয়া আস্পাসিয়াকে তারা মৃত্যুদণ্ড দিল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ—নৈতিক অধঃপতন, পুরনো দেবতা ও পুরনো রীতিনীতির প্রতি অশ্রদ্ধা। পেরিক্লেস মাথা নিচু করে

নগরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল আর আস্পাসিয়ার প্রাণ ভিক্ষা চাইল। আস্পাসিয়ার প্রাণ বাঁচাতে পেরেছিল সে, কিন্তু তার শত্রুরা তুষ্ট হয়নি।

৮। এথেন্স থেকে বিচারবুদ্ধি বিতাড়িত

সমাবেশে উঠে দাঁড়ালেন মহর্ষি ডিওপিথেস। সবাই এখন জানে এই মহাপুরুষ সবসময়ে সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনতে চান যে তারা পুরনো বিশ্বাসের প্রতি অশ্রদ্ধাশীল। তিনি সবসময়ে মন্দিরে থাকেন ও নিচু স্বরে প্রার্থনা করে যান। ভেড়া ও মোরগ নিবেদন করেন ছোট বড়ো সকল প্রাচীন দেবতার উদ্দেশে—ইস্কিউলেপিয়াস, আথেনা, সর্বশক্তিমান আফ্রোদিতে, অ্যাপোলো। তিনি সমস্ত প্রাচীন কাহিনী বিশ্বাস করেন আর ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন যে এথেন্সের পতন সেইদিন যেদিন একশৃঙ্গ ভেড়ার জন্ম হবে। প্রাচীন অন্ধবিশ্বাসী এই মানুষটি আনাক্সাগোরাসকে এই বলে দোষ দিতেন যে আনাক্সাগোরাস সবসময়ে স্বর্গের বস্তুসমূহের কথা বলে বেড়ান। স্বর্গের এই বস্তুগুলি সৃষ্টি করেছে দেবতারা নিজেরাই, তাদের গৌরবের জন্য। আর আনাক্সাগোরাস বলেছেন এই স্বর্গীয় বস্তুগুলি নাকি একেবারেই পার্থিব ব্যাপার। দেবতাদের ইচ্ছার প্রতি আনাক্সাগোরাস কোনো মনোযোগ দিচ্ছেন না। তাঁর এতই সাহস যে বলছেন, চন্দ্র আরেকটি পৃথিবী মাত্র, সূর্য একটি জ্বলন্ত পাথর ছাড়া কিছু নয়। তিনি চান সবকিছু জানতে, স্বর্গের ও পৃথিবীর সবকিছু ব্যাখ্যা করতে। দেবতাদের তিনি স্বীকার করেন না, অন্যদের নিজের ভাবনায় ভাবিত করে তোলার শিক্ষা দেন।

পেরিক্লেসের শত্রুরা এবং যা-কিছু নতুন ও প্রগতিশীল তার শত্রুরা সাধারণ সমাবেশে বেশির ভাগ ভোট পেয়ে গেল। পৃথিবীতে অবস্থা বদলেছে কিন্তু অলিম্পাসে এখনো বাস করছে দেবতারা। সেখানে পরিবার পরিবৃত হয়ে এখনো শাসন করছে জিউস। বহু অভিজাত পরিবার দাবি করে থাকে তারা দেবতাদের ও বীরদের পিতা জিউস-এর সরাসরি বংশধর। জিউসের বংশধর এই অভিজাতদের বহু আগেই উৎখাত করেছে এথেন্সের জনগণ। কিন্তু জিউস উৎখাত হয়নি। লোকে এখনো মন্দিরে তার পুজো দিচ্ছে, যেমন আগেকার কালে দিত।

এই হচ্ছে আর এক প্রমিথিউস যে নশ্বরদের কাছে স্বর্গের আগুন নিয়ে এসেছে। আর জিউস পুনরায় তাকে শিকল দিয়ে বেঁধেছে। আনাক্-সাগোরাসকে কারাগারে যেতে হলো। সেখানে একটা আঙরাখা মুড়ি দিয়ে তিনি শান্তভাবে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। তিনি জানতেন, তাঁকে ওরা হত্যা করতে পারে, কিন্তু, সত্যকে ওরা হত্যা করতে পারবে না।

হঠাৎ কারাগারের দরজা সপাটে খুলে গেল আর আনাক্সাগোরাসের একদল প্রাক্তন শিষ্য ভিতরে ঢুকে এল। তারা জানাল, তাঁকে উদ্ধার করবার জন্য পেরিক্লেস তাদের পাঠিয়েছে, তিনি যেন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসেন। তারা একজন নাবিককে ঘুষ দিয়েছে। তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য বন্দরে নৌকো তৈরি। অনুকূল বাতাস বইছিল। অতএব পাল তুলে দেওয়া হলো, তিনি নিরাপদে হেলাস থেকে বেরিয়ে গেলেন। তাঁকে বলা হতো হেলাসের মস্তিষ্ক, হেলাসের বিচারবুদ্ধি। এথেন্স থেকে বিচারবুদ্ধি বিতাড়িত হলো।

চতুর্থ অধ্যায়

বড়ো মানুষের সামনে অনেক পথ

১। মানুষ চিন্তা করতে শুরু করে কিন্তু বড়ো তাড়াতাড়ি নিজেকে অতিমানুষ ভেবে নেয়

স্বাধীনতা ও সত্যের দিকে, প্রকৃতিকে জয় করার দিকে অগ্রসর হওয়া মানুষের পক্ষে ক্রমেই অনেক বেশি শক্ত হয়ে দাঁড়াল। সে ভেবেছিল সে স্বাধীনতা লাভ করেছে, কিন্তু তা ছিল এমনই এক স্বাধীনতা যা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল দাসত্ব। সে ভেবেছিল সে সত্যের কাছাকাছি এসেছে, কিন্তু তার ও সত্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল কুসংস্কারের পাঁচিল। নিজের ধনসম্পদ নিয়ে সে গর্ব করত, কিন্তু এই ধনসম্পদ সঙ্গে এনেছিল দারিদ্র্য। লোহা নিয়ে কাজ করতে সে শিখেছিল, কিন্তু সেই লোহা থেকে তৈরি করেছিল কেবলমাত্র লাঙল নয়, তলোয়ারও। তৈরি করেছিল ফুলের বাগান, আঙুরের ক্ষেত ও জলপাইয়ের কুঞ্জ, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলিকে উপড়িয়ে ও পুড়িয়ে ফেলতে শুরু করেছিল। ঢেউকে বাধ্য করেছিল তার জাহাজগুলিকে সমুদ্রের ওপর দিয়ে বয়ে নিয়ে যেতে, কিন্তু সমুদ্রকে বশে আনার পরে সে নিজে যতো জাহাজ ডুবিয়েছিল তাতো জাহাজ ঢেউ ও বাতাস কখনোই ডোবায়নি।

তার শত্রু ছিল অনেক। বুনো জন্তুরা তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ত, যখন নিজেকে রক্ষা করার জন্য কোনো অস্ত্র তার ছিল না। পর্বতের হিমবাহ তাকে বিপর্যস্ত করত। তার পায়ের কাছে মাটি ফাঁক হয়ে যেত। কিন্তু নিজের চেয়ে বড়ো শত্রু তার আর কেউ ছিল না। তার সারাটা জীবনের কাহিনী নিজের সঙ্গে সংগ্রাম।

এমন সময় আসবে যখন এই সংঘর্ষ বন্ধ হবে এবং মানুষ তার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করবে প্রকৃতিকে জয় করার জন্য। কিন্তু ইতিমধ্যে সামনের দিকে চলতে তার কষ্ট হচ্ছে, হোঁচট খেয়ে খেয়ে পিছু হটছে, পথ হারিয়ে ফেলছে। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে অতীতের দিকে, কিন্তু অতীতে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। একটা সময় ছিল যখন নিজের শক্তিতে সে বিশ্বাস হারিয়েছিল, নিজেকে সন্দেহ করতে শুরু করেছিল।

যে নাট্যে একসময়ে সে নিজের ক্ষমতা নিয়ে দম্ভ করেছিল সেখানে এখন সে নিজেকে নিয়ে ও নিজের বিবেচনা নিয়ে ঠাট্টা করছে। মঞ্চে দেখানো হচ্ছে একজন চিন্তাশীলের বাড়ি। একজন শিষ্য ঝুঁকে পড়ে মাটিতে উঁকি দিচ্ছে। কেউ একজন জানতে চাইল কিসের সন্ধান করছে ও। 'বিছুটি'? না, ও সন্ধান করছে টারটারাসে বা পাতালে যাবার পথ।

অন্য একজন ব্যস্ত রয়েছে এই সমস্যার সমাধান করতে যে মাছি একলাফে কত ফুট পার হয়। এবারে চিন্তাশীল নিজেই উপস্থিত হলেন। সকলে চিনতে পারল তাঁকে। তিনি হচ্ছেন সক্রেটিস, এথেন্সের সব মানুষের মধ্যে বিখ্যাত। আকাশের দিকে তাকিয়ে চলতে গিয়ে পায়ের কাছে একটা খানার মধ্যে পড়ে গেলেন। আর তাঁর পকেটে একটি ওবোলও ছিল না যা দিয়ে রাতের খাবার কিনে খেতে পারেন।

গ্রন্থকার আরিস্টোফানিস কাকে নিয়ে তামাসা করেছিলেন? তামাসা করেছিলেন সেইসব দার্শনিককে নিয়ে যাঁরা আকাশের দিকে মাথা তুলে পথ চলেন, অর্থাৎ যাঁরা 'তারা দেখেন'। আর তামাসা করেছিলেন সেইসব সরল মানুষদের নিয়ে যাদের কাছে আকাশে লুক্কায়িত সমস্ত সম্পদের চেয়ে একটুকরো রসুন বেশি মূল্যবান।

হ্যাঁ, মানুষ নিজেকে নিয়েই কটু হাসি হেসেছিল, নিজের ক্ষমতাকে অবিশ্বাস করেছিল। এতে অবাক হবার কিছু নেই, কেননা জীবনটাই ছিল এক বিপর্যয় থেকে আর এক বিপর্যয়। ভয়ংকর সময় ঘনিয়ে এসেছিল হেলাসের ওপরে, যে হেলাস স্বাধীনতার পিতৃভূমি, শিল্প ও বিজ্ঞানের শহর। পরের পর যুদ্ধ চলছিল, সঙ্গে নিয়ে এসেছিল ধ্বংস ও অগ্নিকাণ্ড।

কার সঙ্গে কে যুদ্ধ করছিল?

প্রত্যেকে অন্য প্রত্যেকের সঙ্গে।

দাসরা দাস-মালিকদের সঙ্গে। গরিবরা ধনীদের সঙ্গে। অভিজাতরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে। সমুদ্রের শক্তি স্থলের শক্তির সঙ্গে। তারা লড়াই করছিল শুধু তলোয়ার দিয়ে নয়, চিন্তা দিয়েও। কেউ কেউ চেয়েছিল ফিরে যেতে অতীতে, পুরনো দিনে, প্রাচীন কালের সংকীর্ণ জগতে। অন্যরা চেয়েছিল জগতের পাঁচিলগুলি পনটুস থেকে মহাসাগরে সরিয়ে নিয়ে যেতে। যুদ্ধ দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলল, আগুন জ্বালিয়ে তুলল, সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি করে চলল একদল শরণার্থী। লোকে ব্যগ্র হয়ে উঠল যাতে নিজেদের ছেলেমেয়েদের ও নিজেদের বিষয়সম্পত্তি নগরের উঁচু দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে ফেলাতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা, যথেষ্ট সংখ্যক বাড়ি ছিল না। শত শত পরিবারকে রাত কাটাতে হলো খোলা আকাশের নিচে জমির ওপরে বা মন্দিরের সিঁড়ির ওপরে খালি মাটির ওপরে কম্বল বিছিয়ে।

খাদ্যদ্রব্য যথেষ্ট ছিল না। অনেকেই না খেয়ে মারা যাচ্ছিল, যদিও নগরের দেয়ালগুলি ছিল অক্ষত, যদিও নগরের তোরণগুলি ছিল শক্তভাবে আঁটা।

বুভুক্ষার পিছনে পিছনে এল সেই বিদেশী রোগ—প্লেগ। পাথরের দেয়াল বা লোহার খিল, কোনোটাই সেই রোগকে আটকাতে পারল না। রোগ ছড়িয়ে পড়ল জমি বরাবর গুঁড়ি মেরে মেরে রাস্তার ওপরে ঘুমন্ত লোকগুলির মধ্যে। ছড়িয়ে পড়ল বাজারের ভিড়ের মধ্যে। কেউ মারা গেল রোগের সামান্য ছোঁয়ায়, কেউ মারা গেল রোগের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে। রোগের কাছে সবাই সমান হয়ে গেল—কি দাস কি স্বাধীন মানুষ, কি ধনী কি গরিব। রোগে মারা পড়ল তরুণরা, বেঁচে গেল বুড়োরা। রোগ আক্রমণ করে বসল সেনাদলের অধিনায়ককে ঠিক যখন যুদ্ধ শুরু হতে চলেছে,

ধরাশায়ী করল কৃপণ মানুষকে ঠিক যখন সে সোনা নেবার জন্য হাত বাড়িয়েছে। রাস্তার ওপরে এত মড়া ছড়িয়ে ছিল যে মড়াদের ভিড়ে জ্যান্তদের পথ ছেড়ে দিতে হলো। যারা মরছিল তারা একটা শেষ মরিয়া চেষ্টা করল কূপের কাছে যেতে, যাতে একফোঁটা জলে নিজেদের আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিবারণ করা যায়! লোকে দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করার জন্য মন্দিরের মধ্যে ছুটে গেল, কিন্তু দেবতারা মনোযোগ দিল না। এই পাথরের মূর্তিগুলির হৃদয়ও পাথরের। লোকে দৈববাণী থেকে ব্যাখ্যা খুঁজল, কিন্তু জবাব যা পাওয়া গেল তা দুর্বোধ্য ও দুর্জ্ঞেয়।

ধার্মিকদের বিশ্বাস চলে গেল। আগে যারা বিচারবুদ্ধি অনুসরণ করে চলত তারা হতাশায় ডুবে গিয়ে ধর্মকে আশ্রয় করল। আনাক্সাগোরাসের শিষ্য পেরিক্লেস মরবার সময়ে ছোট একটা কাঠের মূর্তি গলায় ঝুলিয়ে রাখলেন। যেন কাঠের একটা ছোট টুকরো তাঁকে বাঁচাতে পারবে।

লালসা, খলতা, স্বার্থপরতা খোলাখুলি বাইরে বেরিয়ে এল, যেমন এসে থাকে চিড়িয়াখানা থেকে পালিয়ে আসা বুনো জন্তুরা।

সামরিক লোকেরা যুদ্ধ নিয়ে দারুণ উল্লসিত, কেননা এটা তাদের কাছে মস্ত একটা উৎসবের মতো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ীরা মজুদ মাল লুকিয়ে ফেলল যাতে আরো বেশি দাম পেতে পারে। তারা মিথ্যে গুজব ছড়াতে লাগল যে শত্রুরা মালবোঝাই জাহাজ সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছে তাই এই অভাব।

ঐতিহাসিক থুসিডিডেস তৎকালীন মানুষদের কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এ-বিষয়ে তিনি কী ভেবেছিলেন তা আমরা তাঁর লেখা পড়ে জানতে পারি :

'লোকে জানে না তাদের কী হবে...তাই তারা কোনো নিয়মকে মর্যাদা দিতে চায় না—না দেবতার নিয়ম, না মানুষের নিয়ম...লোকে একেবারেই খোলাখুলি এমন সব কাজ করে যা আগে তারা গোপন করত। দেবতার বা মানুষের, কোনো নিয়মকেই তারা ভয় পায় না। কারণ, তারা দেখছে সকলেই বিলুপ্ত হয়। আইন মানো বা না-মানো, দেবতাদের শ্রদ্ধা করো বা না-করো, কোনো পার্থক্য নেই। কেউ আশা করে না যে বহুকাল বেঁচে থাকতে হবে আর তার ফলে নিজের অপরাধের জন্য আদালতে দণ্ড পেতে হবে। আতঙ্ক থেকে তারা সবাই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভীত হয়ে উঠেছে। তাই তারা তাড়াহুড়ো করছে, মৃত্যু এসে গ্রাস করার আগে, যতোটুকু সময় হাতে আছে তারই মধ্যে, জীবন থেকে যতোটুকু পাওয়া সম্ভব উপভোগ করে নিতে।' ,

একটা যুদ্ধ শেষ হবার পরে লোকে যে একটু বিশ্রাম করার সময় পায় তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা যুদ্ধ এসে পড়ে। বিদেশীদের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হবার পরেই শুরু হয়ে যায় গৃহযুদ্ধ। লোকে খুনোখুনি করে—কখনো ঘরের মধ্যে, কখনো প্রকাশ্যে। খুন হয় শুধু পুরুষরা নয়, স্ত্রীলোকেরাও। বাড়ির ছাদ থেকে ভাঙা টালি ছুঁড়ে স্ত্রীলোকরা শত্রুর সঙ্গে লড়াই চালায়। একটি নগরে সাধারণ মানুষরা অভিজাতদের নির্মূল করে ফেলে। কিন্তু মাইলেটাসের রাস্তায় ধৃত শিশুদের গায়ে আলকাতরা মাখিয়ে দেওয়া হয় যাতে ভালোভাবে আগুন লাগে। তারপরে সেই শিশুদের জীবন্ত পুড়িয়ে

ফেলা হয়। অভিজাতরা যেখানে ক্ষমতায় থাকতে পেরেছিল সেখানে এমনি ছিল সাধারণ মানুষদের প্রতি তাদের আচরণ। ক্ষেতে চাষ হয় না। জলপাই গাছে ফলন ধরবার সময় পাওয়া যায় না, কেননা তার আগেই শত্রুরা সেই গাছগুলিকে উপড়ে ফেলে দিয়ে যায়।

আতঙ্ক নিয়ে একজন অপরজনকে জিজ্ঞেস করে : এত সব বিপর্যয় কোত্থেকে আসছে? কেউ বলে, মানুষগুলি স্বভাবত খারাপ তাই সবকিছু খারাপ। অন্যরা মানুষের ওপরে দোষ চাপায় না, কিন্তু বলে যে মানুষ যে সব আইন বলবৎ করেছে তারই দরুন এমনটি হচ্ছে। দার্শনিকরা বই লিখে জানায়, যদি যথার্থ আইন চালু হয় আর যথার্থ গভর্নমেন্ট কায়েম হয় তাহলে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা ভুল?

প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন জবাব দেয়। স্বাধীন মানুষের পক্ষে যা ভালো, দাসের পক্ষে তা খারাপ। অভিজাতদের পক্ষে যা ভালো, সাধারণ মানুষদের পক্ষে তা খারাপ।

শিক্ষকরা তাদের শিষ্যদের বলে : সকলের পক্ষে খাটে এমন নির্বিশেষ ন্যায় বলে কিছু নেই। প্রত্যেকে বিবেচনা করে কোনটা তার নিজের পক্ষে ভালো।

লোকে সবকিছুতে সন্দেহ করতে শুরু করে। এমন যদি ব্যাপার হয় যে একজন মানুষের পক্ষে যা সত্য অন্য একজন মানুষের পক্ষে তা মিথ্যা তাহলে মিথ্যা থেকে সত্যকে চিনে নেওয়া যাবে কি ভাবে? সত্যকে কি আদৌ চিনে নেওয়া সম্ভব? দেখাই যাচ্ছে, প্রত্যেকের রয়েছে নিজস্ব সত্য। একটি পাথর একজনের চোখে দেখাল সাদা। কিন্তু সত্যিই কি সেটা সাদা? হয়তো অপর একজনের চোখ এমন ভিন্নভাবে তৈরি যে তার চোখে সেটা দেখাবে কালো। ব্যাপারটা এতদূর গড়ায় যে লোকে শেষপর্যন্ত এই বলে সন্দেহ প্রকাশ করতে থাকে যে এই জগতে কোনো কিছুর অস্তিত্ব সত্যিই আছে কিনা। তারা বলে, 'হয়তো ব্যাপারটা এই যে আমাদের মনে হচ্ছে পাথরটার অস্তিত্ব আছে। যদি থেকেও থাকে তাহলে আমরা কোনোদিন জানতে পারব না পাথরটা সত্যিই কী রকম। যদি জানতেও পারি তাহলে কোনোদিন কাউকে সেটা বুঝিয়ে বলতে পারব না।' তার মানে, কোনা সমস্যারই সমাধান নেই যেন। মানুষ স্বীকার করে নেয় যে তার বিচারবুদ্ধি একেবারেই নির্ভরযোগ্য নয়। কোনো কিছু বোঝার চেষ্টা সে একেবারেই ছেড়ে দিল।

২। সক্রেটিস সম্পর্কে

এমনকি সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিরাও বলতেন, তাঁরা কিছু জানেন না। সক্রেটিস এই কথাটি বলতে ভালোবাসতেন, 'আমি জানি যে আমি কিছু জানি না।' সক্রেটিসকে প্রথম যে দেখবে তার পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত যে ইনিই সেই বিখ্যাত দার্শনিক। তাঁর পা খালি, পরনে শতচ্ছিন্ন জামা। তাঁকে তুলনা করা চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাইলেনাস বাক্‌সের সঙ্গে, যেগুলি প্রায় সকল গ্রীক গৃহে দেখতে পাওয়া যায়। এই বাক্‌সগুলির বাইরের দিকে কুৎসিত

সমস্ত মূর্তি আঁকা থাকে। কিন্তু যে-কোনো একটি বাক্‌স যদি খোলা যায়, দেখা যাবে তার ভিতরে রয়েছে বাড়ির সবচেয়ে মূল্যবান সব সামগ্রী। ক্ষুদে দেবতা সাইলেনাসের মতো সক্রেটিসও ছিলেন ছোট চ্যাপটা নাকবিশিষ্ট এবং কুৎসিত। তাঁর মুখের কথাও ছিল সরল ও অমার্জিত। কিন্তু যখন তিনি তাঁর চিন্তাকে রূপ দিচ্ছেন তখন তাঁর কথা শুনলে অতি মূল্যবান ধ্যান-ধারণার সন্ধান পাওয়া যায়।

কী শিক্ষা দিতেন তিনি? কোন্ বিজ্ঞান?

আরিস্টোফানিস তাঁর 'মেঘ' নাটকে সক্রেটিসকে দেখিয়েছেন একটি চুবড়ির মধ্যে পৃথিবী ও আকাশের মাঝখানে ঝুলে থাকা অবস্থায়। এবং তিনি নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করছেন। কিন্তু সক্রেটিস কখনোই নক্ষত্র নিয়ে সময় নষ্ট করেননি। প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণে তিনি আদৌ বিশ্বাস করতেন না, মানুষ যেন এতেই সুখী হতে পারে! আনাক্‌সাগোরাস তাই করতে চেষ্টা করে-ছিলেন। ওই আহাম্মক বলেছিল সূর্য নাকি আগুনে তৈরি। কিন্তু ওর এইটুকুও বিবেচনায় নেই যে আগুনের দিকে লোকে তাকাতে পারে, কিন্তু সূর্যের দিকে পারে না।

পণ্ডিতদের উপহাস করতেন সক্রেটিস। পণ্ডিতরা কখনো একমত হয় না। প্রত্যেকেই ভাবে অন্য সবাই ছিটগ্রস্ত। ওদের কারও কারও মতে, সমস্ত পদার্থ অভিন্ন। আবার অন্য কারও কারও মতে, পদার্থের অসংখ্য বিভিন্নতা। ওরা কেউ কেউ বলে, সবকিছুর সৃষ্টি ও লয় আছে। অন্য কেউ কেউ বলে, কোনোকিছুর সৃষ্টি নেই, লয় নেই। এই লোকগুলি প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। কিন্তু এদের কি এই ক্ষমতাটুকুও আছে যে ইচ্ছামতো বায়ু বা বৃষ্টিকে ডেকে আনতে পারে? দেবতাদের কাজ বোঝার ক্ষমতা মানুষের নেই। তাছাড়া, দেবতারা যা গোপন রাখতে চায় তা যদি কেউ প্রকাশ করার চেষ্টা করে তাহলে তার প্রতি দেবতারা সন্তুষ্ট থাকে না।

তাহলে অনুশীলন করতে হবে কী নিয়ে? সক্রেটিস প্রশ্ন করলেন। দেবতাদের কাজ নিয়ে নয়, মানুষের কাজ নিয়ে। প্রকৃতি নয়, মানুষের আত্মা। 'নিজেকে জানো!' এই জ্ঞানই মানুষের পক্ষে প্রকৃত প্রয়োজনীয়।

এথেন্সে বহু তার্কিক পণ্ডিত ছিলেন যাঁরা অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা দিতেন। বলতেন, তাঁরা দর্শন শেখাচ্ছেন। সক্রেটিস অর্থ নিতেন না। বলতেন, তিনি অপরকে শিক্ষা দিচ্ছেন না, তাদের কাছ থেকে নিজে শিক্ষা নিতে চেষ্টা করছেন। তিনি সন্ধান করছেন সত্যের। তিনি খুবই আনন্দিত হবেন যদি এমন কাউকে খুঁজে পান যিনি তাঁর চেয়েও বিজ্ঞ এবং যাঁর কাছ থেকে তিনি কিছু শিক্ষা নিতে পারবেন। একবার তাঁর এক বন্ধু ডেল্‌ফিতে অ্যাপোলোর মন্দিরে গিয়েছিলেন। সেখানে প্রশ্ন করেছিলেন, সক্রেটিসের চেয়ে বেশি বিজ্ঞ কেউ আছেন কিনা। তখন দৈববাণী হয়েছিল, 'না, সক্রেটিসের চেয়ে বেশি বিজ্ঞ কেউ নেই।'

কথাটা যখন সক্রেটিসের কানে তোলা হলো তিনি ভীষণভাবে অবাক ও অপ্রস্তুত হলেন। বললেন, 'এই দৈববাণীর মানে কী? কই, আমি তো কিছু জানি না।'

শেষপর্যন্ত সক্রেটিস স্থির করলেন প্রকৃত বিজ্ঞ ব্যক্তির সন্ধানে সারা জগতে ঘুরে বেড়াবেন। প্রথমে তিনি এমন এক ব্যক্তির কাছে গেলেন যিনি

এথেনীয় রাষ্ট্রে একটি উচ্চতম পদে আসীন। এই ব্যক্তি অতীব জ্ঞানী বলে গণ্য—নিজের সম্পর্কে তাঁর নিজেরও ধারণা তাই! সততই তিনি গভর্নমেন্টের উচ্চতম পদে নির্বাচিত হন। সক্রেটিস কিন্তু অল্প কিছুক্ষণ কথা বলেই বুঝে গেলেন এই ব্যক্তি নিজেকে যা ভাবেন তেমন জ্ঞানী তিনি আদপেই নন। এটা বুঝতে সক্রেটিসের খুব বেশি সময় লাগল না।

সাক্ষীদের সামনেই সক্রেটিস এই রাজনীতিকের সঙ্গে কথা বললেন। রাজনীতিক তো মহা রুষ্ট, তিনি ভাবেননি যে তাঁর সঙ্গে এভাবে কথা বলার সাহস কারও থাকতে পারে! এই তথাকথিত বিজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে কথা শেষ করার পরে সক্রেটিস বললেন, দুজনের মধ্যে তিনি, সক্রেটিস, অধিকতর বিজ্ঞ। বললেন, দুজনের কেউ-ই কিছু জানে না, কিন্তু তিনি, সক্রেটিস, জানেন যে তিনি কিছু জানেন না, কিন্তু রাজনীতিক ভাবেন তিনি অনেক কিছু জানেন। অতএব দুজনের মধ্যে সক্রেটিস অধিকতর বিজ্ঞ। কাব্য ও শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য একজন কবির কাছে গেলেন সক্রেটিস, কিন্তু সর্বত্রই তাঁর সেই একই অভিজ্ঞতা হলো। বক্তা ভাবছে সমস্ত বিষয়ে সে বিজ্ঞ, কেননা সে বক্তৃতা দিতে পারে। কবি ও ভাস্কর ভাবে যেহেতু নিজেদের শিল্পের ক্ষেত্রে তারা শ্রেষ্ঠ, অতএব সমস্ত ক্ষেত্রেই তারা বিজ্ঞ। আর ঠিক এইটুকুর জন্য তারা আদৌ বিজ্ঞ হতে পারেনি। সক্রেটিসের অনুগামীদের মধ্যে জনকয়েক তরুণ ছিল। তারা কখনো ভাবত না তারা বিজ্ঞ। এবং সক্রেটিসের মতো তারাও চাইছিল সম্ভব হলো সত্য সম্পর্কে কিছু শিক্ষা নিতে।

এমনিভাবে সক্রেটিস এথেন্সের রাস্তায় ও সমাবেশের স্থান ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। সর্বত্র অনুসন্ধান করলেন প্রকৃত একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির। কুস্তির আখড়ায় গেলেন তিনি, দেখলেন তাঁর তরুণ বন্ধুরা অনেকেই সেখানে উপস্থিত। তরুণ বন্ধুরা তাঁকে বিপুল অভ্যর্থনা জানাল। তিনি একটা বেঞ্চির ওপরে বসলেন, তাঁকে ঘিরে বসল তাঁর ছাত্ররা, সবাই কথা বলতে লাগল। সাধারণত যা হয়ে থাকে, কথাবার্তা শুরু হলো জনকল্যাণকর কোনো বিষয় নিয়ে।

ওদের মধ্যে সবচেয়ে যে ছোট, ক্লিনিয়াস, তাকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন সক্রেটিস।

'একথা কি সত্য যে সকলেই সুখের প্রত্যাশী? নাকি এই প্রশ্ন নিরর্থক? হয়তো বা প্রশ্নটাই উদ্ভট। সুখী হতে কে না চায়?'

'নিশ্চিতরূপেই এমন মানুষের অস্তিত্ব নেই।' ক্লিনিয়াস জবাব দিল।

'কিন্তু সুখ কী নিয়ে হয়? সম্ভবত ধন নিয়ে?'

'হ্যাঁ, তাই। ঠিক এই কথাই আমি বলি।' ক্লিনিয়াস বলল।

'তাহলেও ধন নিয়ে কি সবসময়ে সুখ পাওয়া যায়? স্বাস্থ্য ও শক্তিতেও তো সুখ—নয় কি?'

'হ্যাঁ, এই দুটিতেও।'

'কিন্তু মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে কী বলবে? নিজের পিতৃভূমিতে মর্যাদা লাভ করাটা কি খারাপ জিনিস?'

'কখনোই নয়।'

'বেশ। আচ্ছা, সাহস থাকাটাও তো ভালো জিনিস, নয় কি?'

'নিশ্চয়ই।'

'তার মানে তুমি বলছ, একজন মানুষ তখনই সুখী যখন তার থাকে শক্তি, স্বাস্থ্য, মর্যাদা এবং সাহস? আচ্ছা, তুমি আমাকে আরো একটা কথার জবাব দাও। একজন মানুষের যা আছে সেটা তার কাছে প্রয়োজনীয়, কিংবা প্রয়োজনীয় নয়, কখন তার অবস্থা ভালো?'

'এ তো সহজ কথা, যখন প্রয়োজনীয়।'

'আচ্ছা, একজন মানুষ যদি তার জিনিস কাজে লাগাতে না পারে তাহলে সেই জিনিসের কী দাম? ধরো একজন ছুতোরমিস্ত্রীর মালমশলা আছে, যন্ত্রপাতি আছে, কিন্তু কিছুই গড়ে তোলার নেই। তাহলে তার কাছে ওই সমস্ত জিনিসের কোনো দাম আছে কি?'

'না, কোনো দাম নেই।'

'আচ্ছা, এই যে সব ভালো ভালো জিনিসের কথা আমরা এতক্ষণ বললাম, সে-সবই একজন মানুষের আছে, কিন্তু সেগুলো ব্যবহার করে না—তাহলে?'

'তাহলে সে-সব জিনিসের কোনো দাম নেই।'

'তাহলে কথাটা এই দাঁড়াচ্ছে, একজন মানুষের শুধু জিনিস থাকলেই হয় না, সেই জিনিসগুলি তার ব্যবহার করাও চাই।'

'হ্যাঁ, কথাটা তাই দাঁড়াচ্ছে বটে।'

এ-ধরনের কথাবার্তা থেকে বোঝা যায় ধ্যানধারণার মধ্যে স্ব-বিরোধিতা কতখানি। একসময়ে ক্লিনিয়াস খোদ শক্তিকেই আশীর্বাদ মনে করছে। কিন্তু তারপরেই স্বীকার করছে একই সঙ্গে শক্তি হতে পারে অভিশাপ। সেটা নির্ভর করে শক্তি যে ব্যবহার করছে সে অজ্ঞ না বিজ্ঞ তার ওপরে।

সক্রেটিসের সঙ্গে কথা বলে তরুণরা শিখত চিন্তা করতে, বিষয়ের গভীরে যেতে, স্ব-বিরোধিতা উদ্‌ঘাটন করতে, সত্যের প্রকৃতি উপলব্ধি করতে। তাদের সঙ্গে থেকে সক্রেটিসও এই উপলব্ধি পেতে চাইতেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল সত্য লাভ করা। তাঁর শ্রোতারা এতই বিচলিত থাকত যে তারা তফাত করতে পারত না কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ, কোন্‌টা ন্যায় কোন্‌টা অন্যায়।

লোকে ভাবত, দেবী সত্য প্রতিদিন নগরে নগরে ও গৃহে গৃহে ঘুরে বেড়ান এবং সন্ধ্যার সময়ে ওলিম্পাস পর্বতে তাঁর পিতা জিউসের কাছে ফিরে গিয়ে সারাদিন পৃথিবীতে যা কিছু দেখেছেন তার বিবরণ দেন। তাঁর কাছে সেই সব মানুষের কথা বলেন যারা দিনের বেলা দেবী সত্যকে অপমান ও গালিগালাজ করেছে। আর এই মানুষদের জিউস শাস্তি দিয়ে থাকেন। এখন মানুষ সেই অবস্থা পার হয়ে এসেছে। তারা ভাবে সত্য নশ্বর মানুষদের সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছে এবং ওলিম্পাসে আশ্রয় নিয়েছে। তার সঙ্গে চলে গিয়েছে বিবেকও, তার তুষার-শুভ্র আঙরাখায় নিজেকে ভালোভাবে আবৃত করে। পৃথিবীতে ন্যায় বলে কিছু নেই, ন্যায় পুরোপুরি লোপ পেয়েছে। অন্যায়ের সম্পূর্ণ জয় হয়েছে। সর্বত্রই শুধু লোভ আর মন্দ। সত্যের বাণী লোকে আর শোনে না। হিংস্র জন্তুর মতো তারা একে অপরকে ভক্ষণ করছে।

আর এখানেই সক্রেটিস আসছেন সত্যের সন্ধানে। নগরের সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর সকলকে বলছেন : মানুষ সবার বড়ো। সৌভাগ্য সেই মানুষের যে এথেন্সে বাস করে। এথেন্স এক বিরাট নগর, তার জ্ঞান ও

আত্মার শক্তির জন্য বিখ্যাত, আর তার মন নিবন্ধ হয়ে আছে শুধু সম্পদের ওপরে নয়, মর্যাদা ও সম্মানের ওপরেও—যাতে এই তিনটি থেকেই বেশির ভাগ ফল লাভ করা যায়। কিন্তু আত্মার অন্তর্নিহিত মহত্ত্বের প্রতি লোকে আর তেমন মনোযোগ দিচ্ছে না।

এই কথাটি যতো বেশিবার সম্ভব তিনি প্রকাশ করার চেষ্টা করছেন। কথাটি বলছেন বাজারের এলাকায় যেখানে মানুষের ভাবনাচিন্তা শুধু কেনাবেচা নিয়ে। ভোজের আসরে যেখানে একজন দেমাক করেছে নিজের বাগ্মিতার জন্য, একজন জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার জন্য, অন্য আরো একজন বড়াই করছে রেসের মাঠে তার ঘোড়ার জয়লাভের জন্য। এমনিভাবে তিনি অনেককেই শত্রু করে তুললেন, কিন্তু তাতেও কিছুমাত্র দমলেন না। সক্রেটিস মনে করতেন মানুষকে নাড়া দেওয়া, মানুষের ঘুমন্ত বিবেককে জাগিয়ে তোলা তাঁর কর্তব্য।

'নিজের আত্মার কথা ভাবো, নিজেকে চেনো! শুধু ভেবো না কত গৌরবমণ্ডিত তোমার নগর, কী আছে তোমার নগরের, ভাবো এই নগর সম্পর্কেই।'

তিনি এথেন্সকে ভালোবাসতেন। আরো অনেকের মতো তিনিও পিছন ফিরে তাকাতেন চমৎকার পুরনো দিনগুলির দিকে। মানুষকে ধ্বংস করার জন্য তিনি দোষ দিতেন বাণিজ্য ও হস্তশিল্পের ওপরে। কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি মানুষের সুখ বাড়িয়ে তোলেনি। আরও অগ্রগতির মধ্যে তিনি কোনো আশা দেখতে পেতেন না। ভাবতেন, সেই চমৎকার পুরনো কালে ফিরে যাওয়াই বরং ভালো। বলতেন, মানুষ তাদের স্বাধীনতা নিয়ে গৌরব করে, কিন্তু একই সঙ্গে ধনের দাসত্ব করে। অনেকেই তাঁর কথা শুনত আর ভাবত যে তিনি ঠিকই বলেন যে তাদের উচিত তাদের পূর্ব-পুরুষদের কঠোর নিয়ম ও আচারআচরণের মধ্যে ফিরে যাওয়া।

'আমাদের পূর্বপুরুষদের নিয়ম ও আচার-আচরণে ফিরে যাওয়া!' অভিজাত তরুণরা তাদের সমিতির সভায় ঠিক এই আলোচনাই করত। প্রাচীন ধরনের জীবন বজায় আছে একমাত্র স্পার্টায়। যদিও স্পার্টার সঙ্গে এথেন্সের যুদ্ধ চলছে, তারা চেষ্টা করে সমস্ত রকমে স্পার্টানদের মতো হতে—এমনকি তাদের চেহারাতেও। তারা পরে ভারী খসখসে টুপি, চুল লম্বা রাখে আর ঘন দাড়ি গজায়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ গোপনে শত্রুর সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলে।

সক্রেটিস অভিজাত নন। একজন হস্তশিল্পীর, ভাস্কর সোফ্রোনিকাসের পুত্র তিনি। যৌবনে তিনিও ছেনি নিয়ে কাজ করেছেন। তাঁর তৈরি সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী তিন দেবীর মূর্তি নগরের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু বাপের ব্যবসা তিনি ত্যাগ করেছিলেন। তিনি অনুভব করতেন, হস্তশিল্পীর কাজ আত্মাকে দুর্বল করে এবং এই কাজে ব্যাপৃত থাকলে রাষ্ট্রের ব্যাপারের জন্য খুবই কম সময় পাওয়া যায়। এথেন্সে এই ব্যাপার-গুলি নির্ধারিত হয় ব্যবসায়ীদের সভায় তাঁতী, চামার ও কুমোরদের দ্বারা—তিনি মনে করেন এটা ঠিক নয়। একজন চামার কি ভালো রাষ্ট্রনেতা হতে পারে? রাষ্ট্রশাসনকার্যের বিজ্ঞানে যে পারঙ্গম, একমাত্র সেই ব্যক্তিই পারে রাষ্ট্রনেতা হতে।

সংগত কারণেই সক্রেটিসের এই সমস্ত ধ্যানধারণা ধনী অভিজাত পরিবারের তরুণদের খুবই ভালো লেগে গেল। এমনিভাবে সেই হস্তশিল্পীর সন্তান, জীর্ণ টুপি পরিহিত সেই গরিব মানুষটি, সেই প্রাচীন সৈনিক যিনি বহুবার স্বদেশের জন্য লড়াই করেছেন, সেই সবচেয়ে স্বার্থপরতাশূন্য মানুষটি নিজেও বুঝতে পারলেন না যে তিনি হয়ে উঠেছেন গর্বিত লোভী উচ্চাকাঙ্ক্ষী বিশ্বাসঘাতকদের শিক্ষক।

এথেন্সবাসীরা পরাজিত হলো। ক্ষমতা চলে গেল স্পার্টার অনুগামী অভিজাতদের হাতে। নগর শাসন করতে লাগল হাজার হাজার বণিক ও ব্যবসায়ী নয়, ত্রিশজন অত্যাচারী। আর সক্রেটিসের দুই ছাত্র—ক্রিটিয়াস ও চারমিডিস—উচ্চতম সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হলো। তাহলে একথা তো এখন নিশ্চয় করে বলা চলে, তাঁর ছাত্র ও বন্ধুদের সঙ্গে ন্যায় ও সত্য ও আত্মা সম্পর্কে যে দীর্ঘ আলোচনা সক্রেটিস চালিয়েছিলেন তা এবারে ফলপ্রসূ হবে। কিন্তু দেখা গেল, এথেন্সে এখন আর কেউ ন্যায়ের কথা বলে না।

বিরোধীদের সঙ্গে ব্যবহারে অত্যাচারীরা ছিল নির্মম। নিরীহ লোকদের তারা অভিযুক্ত করত শুধু তাদের সম্পত্তি দখল করার জন্য। নিজেদের তারা এতই নিরাপত্তাহীন মনে করত যে যতো বেশি সম্ভব লোককে বন্দী করত বা কোতল করত।

সক্রেটিস ও অন্য চারজনকে তারা হুকুম দিল তারা যেন সালামিস দ্বীপে যায় এবং এথেন্সের প্রখ্যাত মানুষ লিওনকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। লিওন তাঁর প্রাণ বাঁচাবার জন্য সালামিসে পালিয়ে গিয়েছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে ক্রিটিয়াস ও চারমিডিস তাঁকে প্রাণদণ্ড দিতে চায় ও তাঁর সম্পত্তি দখল করতে চায়। একমাত্র সক্রেটিস এই বেআইনী আদেশ মেনে চলতে অস্বীকার করলেন। তাঁর প্রাক্তন ছাত্রদের খোলাখুলি সমালোচনা করলেন এবং বললেন যে তারা অতি অধম মেষপালক কেননা তারা নিজেদের মেষের পাল হ্রাস করতে চায়। অত্যাচারীরা সক্রেটিসের ওপরে হুকুম জারি করল যে তিনি যেন তরুণদের সঙ্গে কথা না বলেন।

ক্রিটিয়াস ও চারমিডিস সক্রেটিসকে ডেকে পাঠিয়ে বলল, 'সাবধান সক্রেটিস, নইলে আমাদের মেষের পাল থেকে আরো একটি মাথা খসিয়ে ফেলতে হতে পারে।'

এতদিনের অভিজ্ঞতা থেকেই সক্রেটিস বুঝতে পারছিলেন অভিজাতদের শাসনের অর্থ কী। এই অভিজাতরা জনসাধারণকে মনে করে মেষের পাল আর নিজেদের মনে করে মেষপালক।

সক্রেটিসের আরো একজন ছাত্র ছিল—প্লেটো। সে অভিজাত, ক্রিটিয়াসের আত্মীয়, কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে এমনকি সেও স্বীকার করত যে ত্রিশজন অত্যাচারীর শাসনের সঙ্গে তুলনায় গণতন্ত্র হচ্ছে খাঁটি সোনা।

অবশেষে অত্যাচারীরা উৎখাত হলো। গণ-পরিষদের সভায় গণতন্ত্রীরা একটি আইন গ্রহণ করল যাতে গণতন্ত্রের শত্রুদের ক্ষমা করা হলো। কিন্তু সক্রেটিসকে ক্ষমা করতে তারা অনিচ্ছুক ছিল, কেননা এই সক্রেটিসই তরুণ-দের শিখিয়েছে গণতান্ত্রিক শাসনকে ঘৃণা করতে। ঘাতক ও লুঠেরাদের

চেয়েও সক্রেটিস অধিকতর বিপজ্জনক। হত্যাকারীরা ও লুণ্ঠনকারীরা তো স্পষ্টতই শয়তান, কিন্তু বহু হাজার মানুষের কাছে সক্রেটিস ছিলেন সৎ ও মহৎ মানুষ। অত্যাচারীরা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে তাদের তলোয়ার, কিন্তু সক্রেটিসের অস্ত্র আরো অনেক বেশি ধারালো। লোককে বশীভূত করা ও যুক্তি দিয়ে স্বমতে আনার কলাকৌশলে—অর্থাৎ ডায়ালেক্‌টিক্‌স-এ —সক্রেটিস সুনিপুণ অধিকারী।

গণ-পরিষদে অনুমোদিত আইন অনুসারে গণতান্ত্রিক শাসনের বিরোধী হওয়ার জন্য সক্রেটিসকে দোষী করা চলে না। অতএব তাঁর বিরুদ্ধে অন্য অভিযোগ আনা হলো : তরুণদের নষ্ট করা ও নতুন দেবতা প্রবর্তন করা। তিনি তো সবসময়েই বলে থাকেন অন্তরের পবিত্র এক বাণীর কথা, যা তাঁকে চালিত করে।

শেষপর্যন্ত সক্রেটিসকে তারা বিচারের জন্য আদালতে দাঁড় করাল। তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোক্তা ছিল মেলিটাস নামে কোনো এক ধনী ব্যক্তি, ডিকন নামে একজন আদালত-বক্তা, অ্যানিটাস নামে একজন ব্যর্থ নাট্যকার।

আত্মপক্ষ সমর্থনে সক্রেটিস কী বলেন তা শোনার জন্য প্রত্যেকে অপেক্ষা করে রইল। সক্রেটিস করুণা চাইলেন না।

'মনে করুন আপনারা আমাকে বললেন : অ্যানিটাসের কথায় কান না দিয়ে আপনাকে আমরা ছেড়ে দিতে পারি একটি শর্তে—দর্শন নিয়ে ব্যাপৃত থাকা থেকে আপনি বিরত হবেন। তাহলে আমি জবাব দেব—যতোদিন আমি বেঁচে থাকব ও চালিয়ে যেতে পারব, দার্শনিক হওয়া থেকে আমি বিরত হব না। তরুণ-বৃদ্ধ আমার সকল শ্রোতাকে অবিরাম বলেই চলব, দেহ ও অর্থ দিয়ে তাদের মনকে ব্যাপৃত করা থেকে তারা যেন বিরত হয়, বরং তারা যেন ভাবে তাদের আত্মার কথা, নিজেদের উন্নত করে তোলার চেষ্টার কথা। আমি বলব—এথেন্সবাসীগণ, অ্যানিটাসকে বিশ্বাস করো বা না-করো, আমাকে ছেড়ে দাও বা না-দাও, আমি কিন্তু আমার কাজ একটুও বদলাব না—বহুবার যদি আমাকে মরতে হয়, তবুও! কথাটা শুনে সোরগোল তুলো না, বরং মন দিয়ে শোনো আমি কী বলতে চাই। আমার মতো মানুষ— এমন একজন মানুষ যে তোমাদের উস্‌কে তোলার জন্য তোমাদের ওপরে ডাঁশের মতো সক্রিয় হবে—দ্বিতীয় আর একজন তোমরা খুঁজে পাবে কিনা সন্দেহ। একজন ঘুমন্ত মানুষকে যদি কেউ জাগিয়ে তুলতে চায়, আর সেই ঘুমন্ত মানুষ যদি বাকিটা জীবন বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে কাটাতে চায়. তাহলে সে যেমন তাকে জাগাতে আসা মানুষকে ভর্ৎসনা করে—তেমনি তোমরাও হয়তো আমার ওপরে রেগে উঠছ ও আমাকে ভর্ৎসনা করছ। তবুও এ-কাজটি আমি করেই চলব, কেননা তোমরা মেতে আছ তোমাদের কাজ নিয়ে, তোমাদের নগরে যে বিশৃঙ্খলার রাজত্ব চলছে সেদিকে কোনো মনোযোগই দিচ্ছ না। যাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমি কথা বলে যাব, চেষ্টা করব যাতে সে সৎ মানুষে, নগরের মানুষের বন্ধুতে রূপান্তরিত হয়...'

অতএব বিচারকরা সক্রেটিসকে দোষী ঘোষণা করল। তাঁর অভিযোক্তারা দাবি তুলল সক্রেটিসকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হোক, কিন্তু এথেন্সের আইন অনুযায়ী সক্রেটিসের অধিকার ছিল বিকল্প কোনো ব্যবস্থা সুপারিশ

করার। তারপরে বিচারকদের সিদ্ধান্ত নিতে হয় বাদীর কথামতো না প্রতিবাদীর কথামতো শাস্তি দেওয়া হবে।

'তোমরা জিজ্ঞেস করছ কী শাস্তি আমি নিতে চাই? জরিমানা? নির্বাসন? কিন্তু কোথায় যাব আমি? যেখানেই যাই না কেন এমন সব তরুণ নিশ্চয়ই পাব যারা আমার শিক্ষা শুনবে। তোমরা বলবে, আর কিছু নয়, শুধু মুখটি বন্ধ করে থাকো, তাহলেই আর কোনো ঝামেলায় পড়তে হবে না। এটা আমার পক্ষে অসম্ভব—কথাটা তোমরা বিশ্বাস করো বা না-করো। আরো একটা কথা তোমাদের পক্ষে বিশ্বাস করা খুবই শক্ত হবে যদি আমি বলি, মানুষের সবচেয়ে বড়ো সুখ হচ্ছে সদ্‌গুণ নিয়ে প্রতিদিন আলোচনা করা, জানতে চাওয়া কোন্‌টা সদ্‌গুণ কোন্‌টা নয়। এছাড়া জীবন জীবন নয়।'

বিচারকরা আবার মন্ত্রণা করতে চলে গেলেন। এবারে ফিরে এলেন প্রাণদণ্ডের আদেশ নিয়ে।

সক্রেটিসকে তারপরে জিজ্ঞেস করা হলো, শেষ কথা তাঁর কিছু বলার আছে কিনা।

'এই আমি এখানে, পুরস্কারের উপযুক্ত, নিরীহ এক বৃদ্ধ, মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত। যাবার সময় হয়ে গিয়েছে—আমি আমার মৃত্যুর দিকে, তোমরা তোমাদের জীবনের দিকে।'

সক্রেটিস কারাগারে চলে গেলেন। বিচারের সময়ে তিনি আত্মরক্ষার চেষ্টা করলেন না দেখে তাঁর বন্ধুরা ও শিষ্যরা অবাক হয়েছিল। চেষ্টা করলে সহজেই তিনি আরো হালকা দণ্ড পেতে পারতেন। তিনি তো বলতে পারতেন তাঁকে নির্বাসিত করা হোক। বিচারকরা তাতেই সম্মত হতেন। নিজের জীবন বাঁচাবার জন্য তিনি কিছুই করেননি। যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁর এই অদ্ভুত আচরণের কারণ কী, তিনি জবাব দিলেন, 'আমার পক্ষে মরাই ভালো।' পালিয়ে যাবার সুযোগ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি বললেন :

'না। সেটা ঠিক হবে না। আমাকে আমার জায়গায় থাকতে হবে। সারাটা জীবন আমি ন্যায়সাধন করার কথা বলে এসেছি। এখন এই জীবনের শেষদিকে, আমার পিতৃভূমি আমার জন্য যে-স্থান নির্দিষ্ট করেছে সেই স্থান ছেড়ে যদি আমি পালিয়ে যাই, তাহলে আমার সম্পর্কে কী চমৎকার কথাই না বলা হবে! আমার আঙরাখা মুড়ি দিয়ে এখন যদি আমি ছায়ায় সরে যাই এবং জেনে রাখি যে একেবারে শেষ মুহূর্তে দলত্যাগীর মতো আমি পালিয়ে যাইনি—তাই আমার পক্ষে ভালো। আমি বুড়ো হয়েছি, জীবনের সামান্যই অবশিষ্ট আছে, জীবনের শেষদিকে এখন যদি এমন একটা কাণ্ড করে বসি তাহলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায়! যে স্বদেশে আমি আমার জীবনের সেরা বছরগুলি কাটিয়েছি সেই স্বদেশের আইন কিনা ভঙ্গ করতাম!'

দণ্ডাদেশ কার্যকর করার দিন এসে গেল। সক্রেটিস খুব ভোরে উঠে পড়লেন, সবকিছু ঠিক করার জন্য। বন্ধুরা তাঁর বিছানার চারদিকে দাঁড়িয়েছিল, তাদের সঙ্গে শেষবারের মতো কথাবার্তা বললেন।

এই শেষ দিনে বন্ধুদের সঙ্গে কী বিষয়ে কথা বলেছিলেন তিনি?

বলেছিলেন মৃত্যু ও অমরতার কথা। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পরে আত্মার কী হয়? আত্মা কি তারপরেও বেঁচে থাকে, নাকি দেহ বিলীন হবার সঙ্গে সঙ্গে আত্মা ধ্বংস হয় ও আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে? শান্তভাবে তিনি মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সূর্যাস্ত হবার সময় হয়ে এল প্রায়। সূর্য যখন নগরের পেছনে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল, বিষ হাতে উপস্থিত হলো জল্লাদরা। একজন শিষ্য এই বলে প্রতিবাদ জানাল যে সূর্য এখনো অস্ত যায়নি, দূরের পর্বতের চুড়োয় সূর্যের কিরণ এখনো দেখা যাছে।

সক্রেটিস বললেন, 'বিষ যদি তৈরি থাকে তাহলো ওরা সেটা নিয়ে আসুক।'

জল্লাদকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওহে, ভালো মানুষের ছেলে, কী করতে হবে বলো দিকি। আমি ধরে নিচ্ছি তুমি এসব ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ।'

শিষ্যদের দিকে আবার মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'ভুলে যেও না আসক্লাপিয়াসের কাছে একটা মোরগ আমার ঋণ আছে।'

এই ছিল তাঁর শেষ কথা।

জল্লাদ বলল, 'বিষটা খেয়ে ফেলুন। তারপরে অপেক্ষা করুন যতোক্ষণ না পা-দুটো ভারী মনে হয়। তারপরে শুয়ে পড়ুন। তার মানে, বিষের কাজ শুরু হয়েছে।'

কিছুক্ষণ পরে সক্রেটিস শুয়ে পড়লেন। তাঁর ঠোঁট-নড়া বন্ধ হয়ে গেল।

সক্রেটিসের মৃত্যুকে মনে হলো না প্রাণদণ্ড। বরং মনে হলো জীবন থেকে স্বেচ্ছায় পলায়ন, যেন আত্মহত্যা। সক্রেটিসের জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর শিষ্যরা যে-সব কাহিনী লিখে গিয়েছে তা হাজার হাজার বছর ধরে লোকে পড়ছে। কিন্তু সক্রেটিসের গভীর ট্রাজেডি একমাত্র এখনই আমরা বুঝতে শুরু করেছি।

তিনি মানুষকে শেখাতে চেয়েছিলেন ন্যায়পরায়ণ হতে, তার বদলে পোষণ করে গিয়েছেন শয়তান ও বিশ্বাসঘাতকদের। তিনি ভাবতেন, মানুষকে ন্যায়পরায়ণ করে তুলতে হলে তাঁকে শুধু এইটুকুই করতে হবে যে ন্যায় কী সেটা তিনি ব্যাখ্যা করবেন। ক্রিটিয়াস ও চারমিডিস যদিও ভালো করেই জানত সৎ কী, কিন্তু কাজ করেছিল অসৎ। তাদের দুষ্কার্যে সক্রেটিসকে তারা সহযোগী করে তুলেছিল, কেননা তিনিই তাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন।

সক্রেটিস প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে চাইতেন না, যেটা অন্য দার্শনিকরা করতেন। তিনি পর্যবেক্ষণ করতেন 'মানুষের কাজ' এবং এই পর্যবেক্ষণ থেকে চালিত হয়েছিলেন সবচেয়ে কু-কার্যে যোগদানে। অতএব, সেই ব্যক্তি, যাঁকে বলা হতো 'মানুষদের মধ্যে মহত্তম', একবার যখন এই মিথ্যা পথে পা দিলেন, তারপরে গিয়ে পড়লেন এক রুদ্ধ গলির মধ্যে। এই অবস্থায় মৃত্যু ছাড়া তাঁর সামনে আর কিছু বাকি ছিল না।

সক্রেটিসের মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর শিষ্যরা যে কাহিনী লিখে গিয়েছে তা পড়তে পড়তে আমরা অচেতনভাবেই এই বৃদ্ধ দার্শনিকের প্রতি সহানুভূতি বোধ করি—এমন এক দার্শনিক যিনি বিচারকদের সামনে নতজানু হননি,

যিনি কারাগার থেকে পালিয়ে যেতে অস্বীকার করেছেন, যিনি সবসময়েই বলতেন, 'আইন ভংগ করার চেয়ে মৃত্যু বরণ করা ভালো।'

কিন্তু আমাদের বইয়ে দার্শনিকদের বিচার তাদের আত্মিক শক্তি বা দুর্বলতা দিয়ে আমরা করি না। বরং আমরা বিচার করি মানুষের অগ্রগতি তাঁরা কতখানি এগিয়ে নিয়েছেন বা পিছিয়ে দিয়েছেন। সক্রেটিস সম্পর্কে আমরা কী বলব? তিনি কি মানুষকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন?

মানুষ এগিয়ে যাচ্ছিল স্বাধীনতার দিকে। এথেন্সের গণতন্ত্র ছিল এই পথে একটি সম্মুখ পদক্ষেপ। অবশ্য একথা সত্যি যে গণতন্ত্র বলতে এখন আমরা যা বুঝি সেই অর্থে এটা গণতন্ত্র ছিল না। কেননা এথেন্সের কয়েক হাজার নাগরিকের স্বাধীনতার অর্থ ছিল লক্ষ লক্ষ দাস ও বিদেশীর নির্যাতন। তবুও অভিজাতদের শাসনের সংগে তুলনায় এটা ছিল সে-সময়ের পক্ষে আরো অগ্রসর গভর্নমেন্ট। এবং সক্রেটিস ছিলেন গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে। স্বাধীনতাকে তিনি বলতেন কড়া মদ যা দিয়ে অসৎ মদ্য-ব্যবসায়ীরা মানুষকে মাতাল করে তোলে।

মানুষ এগিয়ে চলেছে সত্যের দিকে, প্রকৃতির জ্ঞানের দিকে, প্রকৃতিকে আয়ত্ত করার দিকে। কিন্তু সক্রেটিস ছিলেন প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করার বিরোধী। তিনি বলতেন, 'নিজের আত্মাকে জানো।' যেন আত্মা এমন একটা কিছু যা বাস করে প্রকৃতির বাইরে, জগতের বাইরে।

অতএব তিনি ক্ষতি করেছিলেন শুধু তাঁর সমকালীনদের নয়, ভবিষ্যৎ বংশধরদেরও। কারণ যারাই চাইত মানুষ যেন এগিয়ে না যায়, বরং পিছিয়ে আসে, তারাই তাঁর কথা উদ্ধৃত করত। ফিরে যাও আমাদের পূর্বপুরুষদের আচরণের মধ্যে, ফিরে যাও পুরনো বিশ্বাসের মধ্যে।

তাঁর যুক্তিতর্কের মধ্যে সক্রেটিস সৃষ্টি করেছিলেন দ্বান্দ্বিকতার ধারালো হাতিয়ার। পরবর্তী পণ্ডিতদের তিনি শিখিয়েছিলেন আরো সঠিকভাবে জিনিসের সংজ্ঞা দিতে। কিন্তু জগতকে জানার জন্য বা সত্যকে খুঁজে পাবার জন্য তিনি নিজে এই হাতিয়ার ব্যবহার করেননি। সক্রেটিস ও তাঁর অনুগামীদের হাতে দ্বান্দ্বিকতা সবসময়েই হয়ে ছিল অর্থহীন তর্ক করার একটা উপায়। ভুল পথে পদার্পণ করে সক্রেটিস বিপথচালিত করেছিলেন শুধু তাঁর নিজের ছাত্রদেরই নয়, পরবর্তীকালের বহু মনীষীকেও।

৩। রূপকথার দেশে প্রত্যাবর্তন

সক্রেটিসের ছাত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন যিনি গণতন্ত্র ও বিজ্ঞানের আরো অসহিষ্ণু শত্রু হয়ে ওঠেন, তাঁর শিক্ষকের চেয়েও। ইনি প্লেটো, চিন্তাশীল ও অনুধ্যানশীল এক তরুণ যুবক। চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে তিনি ঘুরে বেড়াতেন, কিন্তু কখনো বিভ্রান্ত হতেন না। অন্য শিষ্যদের তিনি খানিকটা অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। তিনি যে কাজের ভার তুলে নিয়েছেন সেটা মোটেই হাল্‌কা ছিল না—তা হচ্ছে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য সক্রেটিসের শিক্ষাকে সংরক্ষিত করা। মাঝে মাঝে এমন হতো যে সক্রেটিসের সংগে একটি সভা হবার পরে বাড়ি ফিরে সংগে সংগেই বসে যেতেন মোমের প্যাড ও ছুঁচের কলম নিয়ে। মনে করতে চেষ্টা করতেন হুবহু কথার পর কথায় সক্রেটিসের সংগে কথোপকথন। সক্রেটিস যাই বলুন, তিনি কিন্তু তার

সঙ্গে আরো কিছু যোগ করে দিতেন এবং বক্তব্যকে যতোটা সম্ভব পরিষ্কার করে তুলতেন। সমস্ত দৃশ্যটাকে এমনভাবে উপস্থিত করতেন যেন মঞ্চের ওপরে অনুষ্ঠান চলছে—সক্রেটিস বসে আছেন চারদিকে ঘিরে থাকা শিষ্যদের মাঝখানটিতে। এই কারণেই প্লেটোর 'ডায়ালোগস' এত জীবন্ত, কৌতূহলোদ্দীপক ও নাটকীয়।

সক্রেটিস হাসতেন, মাথা নাড়তেন আর বলতেন, 'এই যুবক কী যে ভাবে আমার সম্পর্কে, শোনো তোমরা হে অমর দেবগণ!'

সক্রেটিসের মৃত্যুর পরে প্লেটো একটুও সময় নষ্ট না করে স্বদেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। এথেন্সে থাকা তাঁর পক্ষে অতি বিপজ্জনক ছিল। অভিজাত পরিবারে তাঁর জন্ম, যে-পরিবার আগেকার কালের শাসকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাঁর নিকটতম আত্মীয়রা গণতন্ত্রকে উৎখাত করার জন্য সক্রিয়-ভাবে ষড়যন্ত্র করছে। তিনি নিজেও গণ-পার্টির নেতাদের প্রতি তাঁর শত্রুতা গোপন করেননি। গণ-পার্টির নেতারা মানে বণিক, জাহাজের মিস্ত্রী, চামার, জাহাজের মালিক—যারা সক্রেটিসকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছে।

অতএব প্লেটো এথেন্স থেকে পালালেন।

সারা জগতে এমন দেশ কি আছে যেখানে মানুষ প্রকৃত ন্যায়ের মধ্যে বাস করে? আর এমন বিজ্ঞান কি আছে যা সমস্ত প্রশ্নের জবাব দেবে, সমস্ত সন্দেহের নিরসন করবে?

গ্রীস থেকে প্লেটো সাগর পার হয়ে মিশরে গেলেন। মিশরের রীতিনীতি ও বিশ্বাস তাঁর কাছে বিদেশের বলে মনে হলো। পুরোহিতদের হাতে এত ক্ষমতা থাকাটা তাঁর ভালো লাগল না। সেখানকার মাত্র একটি জিনিস তাঁর কাছে ন্যায়সঙ্গত বলে মনে হলো—মিশরের প্রত্যেকেই শুধু সেই কাজ করে যা তার করার কথা। কারিগররা ব্যস্ত থাকে তাদের শিল্পকর্ম নিয়ে, কৃষকরা জমি চাষ করে। জমিদারের ছেলে কারিগর হতে চায় না, কারিগরের ছেলে রাজার লিপিকর হতে পারে না। এথেন্সে প্রত্যেক কুমোর, মুচি ও কুলি গণ-পরিষদে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে। কিন্তু মিশরে একজন সাধারণ মানুষ যদি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে শাসন করার মতো 'বিশেষ রাজকীয় অধিকার' নিজের হাতে তুলে নেয় তাহলে তাকে শাস্তি পেতে হয়।

ক্রমে ক্রমে প্লেটো এমন এক রাষ্ট্র কল্পনা করতে শুরু করলেন যেখানে কৃষক ও কারিগররা কাজ করে এবং যোদ্ধা ও দার্শনিকরা জনগণকে রক্ষা করে ও শাসন করে। যদিও এই ব্যবস্থায় জনগণের বেশির ভাগই দাস-শ্রম ও অজ্ঞতার মধ্যে অবদমিত থাকত, কিন্তু প্লেটোর মনে হয়েছিল সংখ্যাগরিষ্ঠের গভর্নমেন্টের চেয়ে এই ব্যবস্থা অনেক বেশি 'ন্যায়সঙ্গত'।

সাধারণ মানুষদের নিয়ে অভিজাতদের কোনো ভাবনাচিন্তা ছিল না। 'একজন মুচিকে নিয়ে, সে কে, তার কী হলো, এসব প্রশ্ন নিয়ে রাষ্ট্র ভাবে না। প্রহরীদের গুরুত্ব অনেক বেশি, কেননা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য মুচির মঙ্গল-সাধন নয়, নিজস্ব উৎকর্ষ অর্জন।' প্রহরীরাই হচ্ছে 'সেরা' মানুষ।

কিন্তু 'সেরা' মানুষ হওয়া মানে সবচেয়ে সৎ ও সবচেয়ে যথার্থ মানুষ হওয়া নয়। শাসক যদি মিথ্যা বলে ও প্রতারণা করে তাহলে দোষ হয় না, সেটা রাষ্ট্রের স্বার্থে। কিন্তু কারিগর যদি মিথ্যা বলে বা প্রতারণা করে

তাহলে তার শাস্তি হওয়া উচিত। এই ছিল 'ন্যায়সঙ্গত' রাষ্ট্র সম্পর্কে প্লেটোর ধারণা।

অদ্ভুতরকমের দ্বৈত-জীবনকেন্দ্রিক জীবন হয়ে উঠল প্লেটোর। তিনি চলেফিরে বেড়ান অন্য যে-কোনো মানুষের মতো, নিজের চারদিকে তাকিয়ে দেখেন, লোকের কথা শোনেন ও তার জবাব দেন। কিন্তু তাঁর আত্মা সেখানে থাকে না, তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে ভিতরের দিকে। নিজের মনের মধ্যে তিনি কথা বলে চলেন তাঁর মৃত শিক্ষকের সঙ্গে, নশ্বর চোখ দিয়ে যা দেখা যায় না তাই দেখেন। সক্রেটিস তাঁর কাছে মনে হয় জীবন্ত, নিজের চারদিকে যাদের দেখছেন তারা সবাই প্রেত ছাড়া কিছু নয়।

শয়ন ও জাগরণ জায়গা বদল করেছে মনে হয়। দুঃস্বপ্নে যেমন ঘটে থাকে, তার আবির্ভাব ঘটা মাত্র সর্বকিছু অদৃশ্য হয়ে যায়, ভেঙে ভেঙে পড়ে। সবকিছু অনিশ্চিত—মানুষের ভাগ্য, জীবন, আইন। কিসের ওপরে নির্ভর করবেন তিনি? কোথা থেকে সমর্থন পাবেন?

বৃদ্ধ শিক্ষকের সঙ্গে একবার কিছু কথা হয়েছিল, সেটা প্লেটোর খুব ভালো করেই মনে আছে। সক্রেটিস তাঁকে সাহায্য করেছিলেন এই দৃশ্যমান জগতের ঊর্ধ্বে উঠে ধ্যানধারণার জগতে উত্তীর্ণ হতে, যে ধ্যানধারণার জগতটি অবলোকন করা যায় একমাত্র যুক্তির চোখ দিয়ে। এমনিভাবে তাঁর শিক্ষক অদৃশ্য মই বেয়ে ধ্যানধারণার জগতে উঠে গিয়েছিলেন। চারদিকে তাকিয়ে প্লেটো দেখতে পান গাছ—ওক্‌গাছ, লরেলগাছ, প্লেনগাছ। কিন্তু কোনো গাছই চিরস্থায়ী নয়। তাকে ঝড় উপড়ে ফেলতে পারে, কাঠুরে তার কুঠার দিয়ে কেটে ফেলতে পারে। এমন যে শক্তিধর ওক্‌গাছ, তাও ধ্বংস হয় ও পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তখন প্লেটো এই সমস্ত গাছ থেকে হাজির হলেন গাছের 'ধারণায়'। গাছের ধারণাকে কেউ স্পর্শ করতে পারে না, ধ্বংস বা ক্ষয় গাছের ধারণার ক্ষতি করতে পারে না। ত্রিভুজের চিত্র মুছে ফেলা যায়, কিন্তু ত্রিভুজের ধারণা মুছে ফেলা অসম্ভব—ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায় এই ধারণা। এই ধারণা বা আইডিয়ার ওপরে সময়ের কোনো ক্ষমতা নেই। আমাদের চারদিকে যা-কিছু দেখি সবই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যায়, কিন্তু এই সমস্ত জিনিসের আইডিয়াকে সময় স্পর্শ করতে পারে না। আইডিয়ার স্থান দেশ ও কালের বাইরে।

কোথায় আছে তারা?

তারা আছে আইডিয়ার জগতে, সময় ছাড়িয়ে, যেখানে পৌঁছতে পারে একমাত্র যুক্তি।

এমনিভাবে প্লেটো পৌঁছে গেলেন আইডিয়ার জগতে। সেটা এমন এক জগৎ যেখানে রঙ বা আকার বা অনুরূপ কিছু নেই, এমন কিছু নেই যা আমরা দেখতে বা স্পর্শ করতে পারি। এখানে সত্যের উচ্চতম আইডিয়ায় পৌঁছয় আত্মা। যে অন্ধকার জগতকে আমরা দেখি তা এই অদৃশ্য জগতের অকিঞ্চিৎকর প্রতিফলন মাত্র।

হেসিয়েডের সময়ে গ্রীকরা বিশ্বাস করত—সত্য, স্বাস্থ্য, ভয়, শক্তি, এরা আসলে দেবতা। এখন প্লেটো চেষ্টা করলেন এই প্রাচীন ও অবসিত চিন্তা-ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করতে। তাঁর কাছে বিমূর্ত আইডিয়াই শাশ্বত। বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য কোনো জগতে তারা অস্তিত্বশীল। তাঁর

বিশ্বাস, বাস্তব ঘোড়া বা বাস্তব টেবিল ছাড়াও, অন্য কোথাও, কোনো এক অদৃশ্য জগতে অস্তিত্বশীল রয়েছে 'সাধারণীকৃত ঘোড়া' ও 'সাধারণীকৃত টেবিল'—ঘোড়ার আইডিয়া, টেবিলের আইডিয়া।

এমনিভাবে প্লেটো দুই জীবন কাটাতেন। তাঁর জেগে থাকার সময়টা ছিল স্বপ্ন, ঘুমিয়ে থাকার সময়টা বাস্তবতা। তিনি তাঁর আত্মার মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেন, সেখানে দেখতে পেতেন বস্তুর উপলব্ধি এবং উপলব্ধির উপলব্ধি। এমনিভাবে সমগ্র এই জগৎ—তার কোলাহল, তার সৌন্দর্য, তার প্রতিচ্ছবি—একটা প্রতিফলন ছাড়া কিছু নয়। প্রকৃত জগৎ রয়েছে তাঁর মনের মধ্যে। তিনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তির মতো যিনি নদীর জলের ভিতরে তাকিয়ে বলেন, 'জলের মধ্যে যে ওক্‌গাছ দেখা যাচ্ছে, ওটাই আসল ও্‌কগাছ। নদীর পাড়ে যে ওক্‌গাছ বড়ো হয়ে উঠছে, সেটা প্রতিফলন ছাড়া কিছু নয়।'

কিন্তু একজন মানুষের পক্ষে এমনি এক অদৃশ্য ভূতের মতো জগতে বাস করা শক্ত। এমন সম্ভাবনা থাকে যে অন্ধকারে সে একটা কিছুতে হোঁচট খেয়ে পড়বে। প্লেটো চেয়েছিলেন তাঁর নিজের আবিষ্কারগুলিকে অন্যদের কাছে প্রকাশ করতে। তাদের বলতে চেয়েছিলেন : তোমরা বসে আছ মাটির নিচের একটা গুহার মধ্যে। তোমরা শুধু দেখছ গুহার দেয়ালে ছায়া। তোমরা শুধু শুনছ কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি। মুখ তুলে তাকাও, পাহাড়ের খাড়া কিনার বেয়ে উঠে যাও প্রকৃত জগতের দিকে। সেখানে তোমরা দেখতে পাবে আকাশ ও সূর্য। সূর্যের দিকে তাকালে তোমার চোখ ধাঁধিয়ে যাবে, কেননা তোমার চোখ অন্ধকারে অভ্যস্ত: জলের মধ্যে সূর্যের প্রতিফলনের দিকে নয়, সূর্যের দিকে তাকিয়ে অভ্যস্ত হতে দীর্ঘকাল সময় লাগবে তোমার। কিন্তু শেষপর্যন্ত যখন অভ্যস্ত হয়ে উঠবে তখন বুঝতে পারবে এই জগৎ চালনা করছে সূর্য, গুহার মধ্যে থাকার সময়ে যা-কিছু দেখেছিলে তার হেতু সূর্য।

তখন প্লেটো তাঁর এই বাণী নিয়ে জনসাধারণের কাছে উপস্থিত হলেন। ভেবেছিলেন স্বাধীনতার পথ তিনি খুঁজে পেয়েছেন এবং চেয়েছিলেন অন্যদের মুক্ত করতে। জানতেন, তাঁর কথা অন্যদের শোনাতে হলে খুবই বেগ পেতে হবে। তারা তাঁর সঙ্গে তর্ক করবে, তাঁকে উপহাস করবে, এমনকি তাঁকে খুনও করতে পারে।

কিন্তু তিনি তরুণদের শিক্ষা দিয়ে চললেন যাতে তারা প্রকৃত জগতের আলোকে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে। ছাত্রদের সঙ্গে তিনি কথা বলতেন সক্রেটিসের মতো কোলাহলমুখর রাস্তায় নয়—তাঁর বাগানের ছায়াঘেরা আশ্রয়ে, বীর অ্যাকাডিমাসের মূর্তির নিচে। তিনি তাদের বিশেষভাবে বলতেন প্রকৃত জগতের জন্য, জ্ঞানের জন্য প্রয়াসী হতে। বাগানের প্রবেশ পথে তিনি একটি লক্ষ্যবাণী স্থাপন করেছিলেন : 'জ্যামিতির জ্ঞান যার নেই সে যেন এখানে প্রবেশ না করে!'

গণিতের জ্ঞান নিয়ে তাঁর ছাত্ররা আয়ত্ত করবে সংখ্যা, উপলব্ধি করবে আইডিয়া।

বিমূর্ত আইড়িয়াকে এভাবে চিন্তা করাটা সহজ কাজ নয়। প্লেটো

নিজেও তখনো পর্যন্ত কোনো একটা মূর্ত প্রতিচ্ছবি বাদ দিয়ে বিমূর্ত আইডিয়াকে চিন্তা করতে পারতেন না।

প্লেটো বলতেন, আকাডেমি থেকে তিনি কবিতাকে নির্বাসিত করেছেন। তা সত্ত্বেও কবিতার আধিপত্য কিন্তু সমানভাবেই থেকে গিয়েছিল, প্লেটো যতোই বলুন না কেন কবিতাকে নির্বাসিত করা হয়েছে। একমাত্র যে উপায়ে তিনি তাঁর আকাডেমি থেকে কবিতাকে নির্বাসিত করতে পারতেন তা হচ্ছে নিজের মধ্যে থেকে কবিতাকে নির্বাসিত করা। নিজের অজান্তেই তিনি আইডিয়ার অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে কথা বলছিলেন জীবন্ত কাব্যিক ভাষায়।

প্লেটোর বন্ধু ও অনুগামীরাও আকাডেমিতে পড়াতেন। সেখানে ছাত্ররা শিক্ষা পেত চারটি বিষয়ে—গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, সংগীত ও ডায়ালেক্‌টিক্‌স। বলবিদ্যা বা ভেষজবিদ্যা বা এমনি ধরনের অন্যান্য বিষয়ে পড়াশুনা করতে হতো কেবল কারিগরদের। স্বচ্ছল পরিবারের তরুণদের বেলায় মনে করা হতো, তাদের পড়াশুনোটা শুধু তাদের আত্মার প্রয়োজনে, বা যুদ্ধের প্রয়োজনে। প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণকে প্লেটো মনে করতেন অর্থহীন অবসর-বিনোদন। যারা গ্রহের গতিবিধি ধরতে চেষ্টা করে বা মিলের মধ্যে কালক্ষেপ নির্ধারণ করতে চায়, তাদের নিয়ে তিনি তামাসা করতেন। জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত বা সংগীত নিয়ে পড়াশুনো করার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাত্র যেন এই বিষয়গুলিকে ছাড়িয়ে উর্ধ্বে উঠতে পারে এবং উচ্চতর জগতে উপনীত হতে পারে এবং তারিফ করতে পারে কত যুক্তিপূর্ণ ও উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে সৃষ্টিকর্তা প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেছেন।

তাঁর ছাত্রদের মধ্যে প্লেটো দেখতে পেতেন তাঁর আদর্শের উত্তরাধিকারী-দের—সম্ভবত সেই দার্শনিকদেরই যারা তাঁর আদর্শস্থানীয় অভিজাত রাষ্ট্রের শাসক হবার জন্য অবতীর্ণ। আকাডেমির শান্ত বাগানেও প্লেটো ভুলে যাননি জগতের পরিবর্তন ঘটাবার জন্য তাঁর পরিকল্পনা।

তিনি সিরাকুস-এ গেলেন। সেখানে তখন আধিপত্য করছিলেন ছোট ডিওনিসিয়াস। কিন্তু এই অত্যাচারী একজন দার্শনিকের উপদেশ শুনতে রাজী ছিলেন না। এই অনাহূত উপদেষ্টাকে তিনি জেলে পুরলেন! প্লেটোকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাল একমাত্র তাঁর বন্ধুদের সাহায্য।

একদিকে এথেন্স অন্যদিকে সিরাকুস, একদিকে আকাডেমি অন্যদিকে অত্যাচারীর প্রাসাদ—এই টানাপোড়েনের মধ্যে পড়লেন প্লেটো। একসময়ে এই জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন তিনি, যে জগতকে মনে হলো নিতান্ত দুঃস্থ, যে জগৎ আইডিয়ার সমুজ্জ্বল রাজ্য থেকে একেবারেই ভিন্ন। তারপরে আবার এই জগতে ফিরে এলেন চেষ্টা করে দেখার জন্য, আপন আলোক শিখায় জগতের পরিবর্তন করতে পারেন কিনা। কখনো কখনো জগতকে আহবান করতেন অতীতের পক্ষপুটে আশ্রয় নিতে, যে অতীতকে ফিরিয়ে আনা যায় না। কখনো কখনো ঝাঁপ দিতেন এমন এক জগতের স্বপ্নের মধ্যে, যে জগতের কোনো অস্তিত্ব নেই।

প্লেটোকে ঐ দেখা যাচ্ছে তাঁর বাগানে, প্লেনগাছের ছায়ায়, কলরবমুখর নগর থেকে দূরে। স্থানটি মন্দিরের মতো প্রশান্ত। শিষ্যদের বলছেন কিভাবে তিনি তাঁর যৌবনকালে সত্যের সন্ধান করেছেন।

অনুগামীদের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন এক ঐশ্বরিক স্রষ্টার কথা, যিনি

দেহ গঠন করেছেন এবং তার মধ্যে স্থাপন করেছেন আত্মা। আত্মা ও মন সমন্বিত দেহ প্রতিভাত হয়েছে জীবন্ত বস্তুর মতো। বললেন, প্রত্যেকটি নক্ষত্রেরও আত্মা আছে, প্রত্যেকটি গ্রহেরও। সূর্য চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহ হচ্ছে দৃশ্যমান দেবতা। তারা নড়াচড়া করে, কারণ তারা জীবন্ত, কারণ তাদের আছে আত্মা। আত্মা আছে গাছেরও, জন্তুজানোয়ারেরও। যিনি ভালোর স্রষ্টা, সুন্দরেরও স্রষ্টা, তিনিই সমস্ত কিছুরই সৃষ্টিকর্তা। কেননা এই যে জগৎ আমরা দেখছি তা হচ্ছে প্রকৃত, চরম সুন্দর, আধ্যাত্মিক জগতের ছায়া মাত্র। এই আধ্যাত্মিক জগতটি বিশুদ্ধ স্বর্গের মধ্যে শুদ্ধতম, যে স্বর্গে রয়েছে নক্ষত্রসমূহ। আমরা হচ্ছি সেই জীবের মতো যে বাস করে সমুদ্রের তলদেশে কিন্তু যার ধারণা, সে বাস করছে উপরিতলে। মাথার ওপরে জলের দিকে সে তাকায় আর সেই জলের মধ্যে দিয়ে দেখতে পায় নক্ষত্র ও সূর্য। সে এত দুর্বল ও শ্লথ যে ওদের দেখতে পায় না, পাবেও না কখনো। সমুদ্রের ওপরে আকাশ যে কতখানি সুন্দর তা সে কখনো জানতে পারবে না।

আমরা এই রকম। বাস করছি গুহায়, কিন্তু কল্পনা করছি আমাদের বাস পৃথিবীর উপরিতলে। বায়ুকে আমরা বলি স্বর্গ, কেননা আমরা বায়ুর ওপরে উঠতে পারি না। মানুষ যদি তার প্রকৃতিকে বদলাতে পারত তাহলে চিনতে পারত প্রকৃত জগতকে। সেখানে সবকিছু ভারি সুন্দর। জমি রক্ত-বেগুনি, রুপোলী ও সোনালী ; পাথর স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ, অতি মূল্যবান সব জহরত, চুনি ও পান্না। সেখানে বিশুদ্ধ ইথারের মধ্যে রয়েছে বসতিপূর্ণ মহাদেশ ও দ্বীপ। রয়েছে মন্দির, যেখানে দেবতারা বাস করে।

গুরু এইসব কথা বলেন আর শিষ্যরা তদ্গত হয়ে শোনে, যেমন শোনে শিশুরা রূপকথার গল্প।

তিনি তাদের কাছে আরো বলেন মাটির নিচের এক ভয়ংকর জগতের কথা, যেখানে মন্দ লোকেরা যায়, আর ভালো লোকেরা উঠে যায় ওপরে ইথারের মধ্যে সেই সুন্দর জগতে ও তাদের পুরস্কার লাভ করে। বহু বছর পরে এই আত্মারা আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে। কিন্তু তারা মনে রাখে তাদের সেই স্বর্গীয় আবাসের কথা। আমাদের সকল সৎ চিন্তা স্মৃতি ছাড়া কিছু নয়। অতএব আমাদের সকলেরই উচিৎ সৎ জীবন যাপনের চেষ্টা করা।

প্লেটো যে কাহিনী বলেছেন তার মধ্যে গাঁথা রয়েছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু জাতির প্রাচীন বিশ্বাস। কাহিনী দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে। এই কাহিনীর স্রষ্টা একজন অভিজাত, দাসপ্রথার সমর্থক, রাজার বংশধর। কিন্তু এই কাহিনী হয়ে ওঠে দাস ও ভিখারিদের সান্ত্বনা। যখন তারা দেখে পৃথিবীতে স্বাধীনতা নেই, তারা সেই স্বাধীনতা খোঁজে অন্য কোনো উত্তম ও সুন্দর জগতে—স্বর্গে। সমকালীনদের উদ্দেশে প্লেটো ডাক দিয়েছিলেন পিছু হটে আসতে—গণতন্ত্র থেকে অল্প কয়েকজনের শাসনে। তাই, বহুর চেয়ে অল্প কয়েকজনের কল্যাণ যেখানে অগ্রাধিকার পায় এমন প্রত্যেকটি ব্যবস্থার অনুগামীরা প্লেটোর শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরেছে।

একটা সময় ছিল যখন বিজ্ঞান ও ধর্ম ছিল অভিন্ন। তারপরে ধর্ম থেকে বিজ্ঞান বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং স্বাধীনভাবে গড়ে উঠতে থাকে। প্লেটো চেষ্টা করেছিলেন তাদের আবার মিলিয়ে ফেলতে, ধর্মকে বিজ্ঞানের ছদ্মবেশ

পরাতে। সোফিস্ট বলেছিলেন, সত্য বলে কিছু নেই। আছে শুধু মতামত—যতো মানুষ ততো মতামত। সক্রেটিস ও প্লেটো বলেছিলেন, সত্যের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁরা তাকে স্থাপন করেছিলেন ছায়া-আইডিয়ার এক শাশ্বত অপরিবর্তনীয় জগতে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই সমস্ত শিক্ষা বহু চিন্তাবিদের রচনায় ঢুকে পড়তে থাকে। তাঁরা বিজ্ঞানকে চালিত করেন প্রকৃতি থেকে আত্মার অস্তিত্বহীন জগতে। তার ফলে ব্যাহত হয়েছে প্রকৃত জগতের জ্ঞানের দিকে মানুষের জয়যাত্রা।

একসময়ে মানুষ বাস করত রূপকথার জগতে। সেখানে থাকত সমস্ত রকমের ভূতের মতো মূর্তি, যাদু ঘাস, যাদু জীব, গাছ, আত্মা। প্রত্যেকটি গাছের ছিল আত্মা। প্রত্যেকটি পাথর কথা বলতে পারত।

কিন্তু মানুষের জানার ছিল এক ক্রমবর্ধমান জগৎ। প্রতিদিন প্রসারিত হচ্ছিল উপলব্ধির আলোক-সীমানা। কিন্তু তারপরেই পুরনো জগৎ তাকে ঘিরে সংকুচিত হয়ে আসতে থাকে। বিজ্ঞানের পিতৃভূমি গ্রীসে দার্শনিক প্লেটো তাঁর শিষ্যদের চালিত করেছিলেন পিছনদিকে সেই রূপকথার দেশে। মনে হতে পারত থালেস আনাক্সামান্দের, আনাক্সাগোরাস ও অন্যান্য পণ্ডিতদের অস্তিত্ব কোনোকালে ছিল না।

বড়ো মানুষ কি সত্যিই পিছনদিকে গিয়েছিল?

ব্যর্থ হয়েছিল কি তার সকল সাফল্য?

না। কিছু কিছু তরুণ যখন প্লেটোর কথা শুনছিল অন্যরা তখন সযত্নে পড়ছিল ডিমোক্রিটাসের বই। প্লেটো চালিত করেছিলেন একদিকে, ডিমোক্রিটাস অন্য আর একদিকে।

প্লেটো ও তাঁর শিষ্যরা সর্বপ্রকারে চেষ্টা করেছিল ডিমোক্রিটাসের শিক্ষা যেন লোকের কাছে না পেঁছয়। ডিমোক্রিটাসের বিষয় নিয়ে জবাব দিতে হলেও প্লেটো কখনো ডিমোক্রিটাসের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করতেন না। শত্রুপক্ষের খ্যাতি বাড়ুক এটা তিনি চাইতেন না। তিক্ত মন নিয়ে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন ডিমোক্রিটাসের ধ্যানধারণা ছড়িয়ে পড়ছে। তিনি লিখেছিলেন, 'অনেকেই মনে করে এই সমস্ত শিক্ষা হচ্ছে সবচেয়ে জ্ঞানের শিক্ষা। এই কারণেই তরুণরা ধর্মের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠছে এবং বলছে যে দেবতাদের অস্তিত্ব নেই, যদিও আইন অনুসারেই দেবতাদের প্রতি বিশ্বাসী হতে আমরা বাধ্য। বিপ্লব যদি হয়, এই তার কারণ।'

যে-সমস্ত চিন্তাবিদ বলতেন, 'জিউস সব নাম করেন, সব জানেন, সব দেন, সব নিয়ে নেন', তাঁদের বিদ্রূপ করেছেন ডিমোক্রিটাস এবং ঘোষণা করেছেন, 'কিছু লোক জানে না যে নশ্বর প্রকৃতি ধ্বংস হবেই, তাই জীবনের কষ্টভোগের অভিজ্ঞতা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ও ভয়ে জীবন কাটায় এবং পরপারের জীবন সম্পর্কে অলীক কাহিনী রচনা করে।'

এ-ধরনের মতামতের বিরুদ্ধে প্লেটো লড়াই চালিয়েছিলেন। তিনি লোককে পুনরায় অন্য এক জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করাতে চেয়েছিলেন—যেটি একমাত্র প্রকৃত জগৎ, যেখানে লোক তাদের কষ্টভোগের জন্য পুরস্কৃত হয়, পাপের জন্য শাস্তি পায়।

তবে, স্পষ্টই বোঝা যায়, নিজের কথার শক্তিতে প্লেটোর খুব বেশি

আস্থা ছিল না। তাই তিনি শত্রুপক্ষকে শাস্তির ভয় দেখিয়ে শাসিয়েছিলেন —শাস্তি শুধু পরপারের জগতে নয়, এই জগতেও। তিনি লিখেছিলেন, 'কিছু লোককে প্রাণদণ্ড দিতে হবে, কিছু লোককে নির্যাতন করতে হবে ও কারাদণ্ড দিতে হবে, আরও কিছু লোককে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে হবে ও নির্বাসন দিতে হবে।' এই কি সেই প্লেটো যিনি কিছুকাল আগে যে-বিচারকরা সক্রেটিসকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল তাদের বিরুদ্ধে রাগে ফেটে পড়েছিলেন? আর আজ কিনা তিনি নিজেই চাইছেন ভিন্ন ধ্যানধারণা পোষণকারীদের প্রাণদণ্ড।

এমনিভাবে দুই বিরোধী দর্শনের মধ্যে লড়াই চলতে লাগল—প্লেটোর 'ভাববাদ', ডিমোক্রিটাসের 'বস্তুবাদ'।

৪। পথের সন্ধানে মানুষ

প্লেটোর শিষ্যদের মধ্যে এমন একজন ছিলেন যিনি তাঁর গুরুকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতে রাজী ছিলেন না। তিনি একজন চিকিৎসকের পুত্র, তাঁর পক্ষে একথা বিশ্বাস করা শক্ত ছিল যে দেহ ছাড়া আত্মা থাকতে পারে। তিনি তাঁর পিতার কাছে শুনেছিলেন রক্তকে উত্তপ্ত করে হৃৎপিণ্ড এবং এই উত্তাপ জীবন্ত জীবদেহের প্রাণ টিকিয়ে রাখে। তিনি বুঝতে পারতেন না আগুনের মধ্যে বা পাথরের মধ্যে বা বায়ুর মধ্যে কী ধরনের আত্মা থাকতে পারে। গাছের মধ্যে একধরনের উদ্ভিজ্জ আত্মা থাকতে পারে, যার কোনো অনুভূতি নেই এবং যার কোনো সচেতনতা নেই। তবুও এই আত্মাই গাছকে জীবন্ত রাখে এবং বীজের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করতে সমর্থ করে তোলে। কিন্তু পাথরে কী দেখি? পাথর জীবন্ত নয়, পাথর মাটি থেকে রস টানে না, পাথর বংশবৃদ্ধি করে না।

সন্দেহ প্রকাশ করছেন এই যে ছাত্র তাঁর নাম আরিস্টটল।

আকাডেমিতে বছরের পর বছর কাটিয়েছেন তিনি। গুরুর শিক্ষা তাঁর খুবই পছন্দ—সবকিছু নিয়ে প্রশ্ন করা, সবকিছু নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা, যুক্তির সাহায্যে সত্যের সন্ধান করা, নির্দিষ্ট বস্তু থেকে চূড়ান্ত উপলব্ধিতে পৌঁছনো। তাঁর সম্পর্কে প্লেটো বলতেন, 'অন্যদের চাই নাল, আরিস্টটলের চাই লাগাম।'

কিন্তু প্লেটো যখন তাঁকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করলেন সেই রূপকথার দেশে যেখানে দেহ নেই কিন্তু আত্মা আছে, বস্তু নেই কিন্তু বস্তুর উপলব্ধি আছে—তখন আরিস্টটল বাধা দিলেন।

তিনি ছিলেন সাহসী, কিন্তু সৎ। আর যতোবারই তাঁর গুরু এ-কাজটি করতে চাইতেন, তিনি বলতেন, 'প্লেটোকে আমি ভালোবাসি, কিন্তু তার চেয়েও বেশি ভালোবাসি সত্যকে।'

শেষপর্যন্ত তিনি আকাডেমি ত্যাগ করলেন। এবারে তাঁর যাত্রা জ্ঞানের দিকে তাঁর নিজস্ব পথে।

আরিস্টটল একথা বুঝতেন যে চোখ বন্ধ রেখে শুধুমাত্র যুক্তির সাহায্যে কোনো কিছু উপলব্ধি করা যায় না। কোনো কিছু জানতে হলে প্রথমে অবশ্যই দেখতে হবে, শুনতে হবে, স্পর্শ করতে হবে।

কিন্তু জন্তুরাও তো তাই করে, আরিস্টটল ভাবতেন। কোনো কোনো জন্তু যা অনুভব করে ও দেখে তা এমনকি মনেও রাখতে পারে। যেমন, আগুনে পুড়ে যাওয়া জন্তু কখনোই আর আগুনের সামনে যায় না। এ থেকে প্রমাণ হয় জন্তুদের স্মৃতিশক্তি আছে ও অভিজ্ঞতা হয়। কিন্তু একমাত্র মানুষের মধ্যে আমরা দেখতে পাই শিল্প ও বিজ্ঞান। মানুষ যখন জানতে পারল যে আগুন তাকে পুড়িয়ে দিতে পারে তখন আগুনকে একটা মাটির পাত্রে আবদ্ধ করে রাখল। তার মানে, অভিজ্ঞতা থেকে সে শিখল শিল্প।

সাধারণ একজন কুমোর আগুন ব্যবহার করে অভ্যাস থেকে। কখনো প্রশ্ন করে না—কেন? কিন্তু একজন বিজ্ঞানী যা করার তা করে থাকেন কেন করছেন জেনে।

আরিস্টটল সিদ্ধান্ত করলেন : বিজ্ঞান হচ্ছে স্বীকৃতি। নতুন কিছু দেখলে অজ্ঞ মানুষ অবাক হয়। যান্ত্রিক খেলনা দেখলে শিশু অবাক হয়। কিন্তু যে-লোক যন্ত্রের নিয়মকানুন বোঝে সে চালু খেলনা দেখে যতো-না অবাক হয় তার চেয়ে বেশি অবাক হয় খেলনা অচল থাকলে।

একজন অজ্ঞ লোক আর শিক্ষিত লোকের মধ্যে এই হচ্ছে তফাত।

তাহলে, বস্তুর হেতু কী?

আরিস্টটল জানতেন, এ প্রশ্ন তিনিই প্রথম করছেন তা নয়। একটা খেলনা চালু থাকার হেতু কী, তা বোঝার জন্য বিশেষ চাতুর্যের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আমাদের এই জগৎ যে অসংখ্য বস্তু দিয়ে গঠিত তাদের সকলের হেতু কী, সেটা জানতে চাওয়াটা একেবারেই ভিন্ন ব্যাপার। আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীকরা এই প্রশ্নের জবাব দিতে চেষ্টা করেছিল। তাদের অনুমান তারা পুস্তকে লিখে রেখে গিয়েছিল, গোল করে পাকানো পাণ্ডুলিপিতে। অজ্ঞ লোকদের কাছে এই পাণ্ডুলিপিগুলির কোনো দাম নেই। কিন্তু আরিস্টটলের মনে হলো এই পাণ্ডুলিপিগুলি সবচেয়ে দামী চিন্তায় পরিপূর্ণ। সেখানে প্রত্যেক দার্শনিক রেখে গিয়েছেন এই চিন্তায় তাঁর নিজস্ব অবদান—কখনো কখনো সে অবদান বেশ বড়ো রকমের। আগ্রহের সঙ্গে আরিস্টটল এই পুস্তকগুলি খুললেন, যেমন আগ্রহ বোধ করে একজন উত্তরাধিকারী সিন্দুক খোলার সময়ে। আর কত ধনরত্নেরই না সন্ধান পেলেন তিনি সেখানে। তবে তার মধ্যে যেমন ছিল সোনার সম্পদ, তেমনি ছিল বেশ কিছুটা মূল্যহীন পেতল। তখন তিনি পেতল থেকে সোনাকে—মিথ্যা থেকে সত্যকে—বাছাই করার কাজে লাগলেন।

দেখতে পেলেন, এই প্রাচীন দার্শনিকদের পক্ষে পরিষ্কারভাবে চিন্তা করাটা শক্ত ছিল। এই দার্শনিকরা মনে পড়িয়ে দিল তাঁদের প্রথম যুদ্ধে নতুন দলভুক্ত সৈনিকদের অপ্রস্তুত অবস্থার কথা।

কিন্তু আরিস্টটল যে প্লেটো ও সক্রেটিসের শিষ্য সেটা অকারণে নয়। তরুণ বয়স থেকেই তিনি চিন্তার সঙ্গে লড়াই করতে অভ্যস্ত ছিলেন। ভাবলেন, এই সমস্ত পুস্তকে কখনো কখনো দেখা যায় প্রচুর বাজে কথা রয়েছে, কিন্তু প্রায় সমস্ত পুস্তকেই ছড়ানো রয়েছে অমূল্য সব চিন্তা। দেখলেন, তাঁরা সকলেই প্রকৃতিকে গ্রহণ করেছেন সবকিছুর হেতু হিসেবে,

প্রকৃতি থেকে সবকিছু উদ্ভূত, পরিশেষে প্রকৃতির মধ্যে সবকিছুর প্রত্যাবর্তন।

থালেস ভাবতেন, জল হচ্ছে সবকিছুর শুরু। আনাক্সিমেনেস ভাবতেন, বাতাস। হেরাক্লিটাস ভাবতেন, আগুন। এম্পিডোক্লিস তার সঙ্গে যোগ করেছিলেন চতুর্থ একটি পদার্থ—মাটি। আর আনাক্সাগোরাস শিখিয়েছিলেন, মৌলিক পদার্থের সংখ্যা অসংখ্য।

হ্যাঁ, আরিস্টটল ভাবলেন, বস্তু ছাড়া কোনো কিছু হতে পারে না। মূর্তি তৈরি করতে হলে ব্রোঞ্জ চাই, পাত্র তৈরি করতে হলে রুপো চাই। কিন্তু শুধু ব্রোঞ্জটাই তো আর মূর্তি নয়, শুধু রুপোটাই তো আর পাত্র নয়। আকার থাকা চাই, যে আকার অনুযায়ী মূর্তি বা পাত্র তৈরি হয়।

মনে পড়ে গেল, কোনো কোনো দার্শনিক বলেছেন—বস্তু নয়, আকার হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস।

পিথাগোরাসের অনুগামীদের পুস্তকটি খুললেন। তাঁরাই প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন গণিতের গুরুত্ব, সংখ্যা রেখা ও নক্শার গুরুত্ব। তাঁরা ভাবতেন গণিত দিয়ে সবকিছুর ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু ভুলে গিয়েছিলেন যে আকার নিজের থেকে কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। আরিস্টটল উপলব্ধি করলেন, ব্রোঞ্জের একটি গোলক তৈরি করতে হলে শুধু জ্যামিতিক আকার থাকাটাই যথেষ্ট নয়, ব্রোঞ্জও থাকা চাই। মনে পড়ে গেল আকাডেমিতে আইডিয়া সম্পর্কে প্লেটোর দীর্ঘ আলোচনা। আইডিয়া হচ্ছে শাশ্বত আকার যার মতো করে সবকিছু তৈরি হচ্ছে। প্লেটো তাই ভাবতেন।

কিন্তু আরিস্টটল যে আকাডেমির সবচেয়ে একগুঁয়ে ছাত্র ছিলেন সেটা অকারণে নয়। প্লেটোকে তিনি এমন সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেন যার জবাব গুরু দিতে পারতেন না।

কতবারই-না তিনি প্লেটোকে বলেছেন আমাদের চারপাশের বাস্তব জিনিসগুলির হেতু বিবেচনা করতে। তিনি জানতে চাইতেন, এটা কি করে সম্ভব যে জিনিস থেকে স্বতন্ত্র হয়ে আকারের অস্তিত্ব থাকছে? এটা কি করে সম্ভব, যে-রুপো দিয়ে পেয়ালা তৈরি তা থেকে স্বতন্ত্র হয়ে পেয়ালার অস্তিত্ব থাকছে?

প্লেটো ব্যাখ্যা করে বলতেন, বাস্তব পেয়ালা ছাড়াও অন্য কোনো জগতে রয়েছে 'সাধারণীকৃত পেয়ালা'। বলতেন, আলাদা আলাদা গাছ যেমন আছে তেমনি আছে 'সাধারণীকৃত গাছ'। আরিস্টটল জিজ্ঞেস করতেন, কিন্তু তার দরকারটা কী—প্রত্যেকটা জিনিসকে এভাবে দুটো করে দেখার? এ থেকে কি আমাদের বুঝতে সাহায্য হয় কি-ভাবে একটি গাছ বীজ থেকে বড়ো হয়ে ওঠে এবং কেন সেই গাছে ফল ধরে?

এখন আরিস্টটল বারে বারেই এই পুরনো আলোচনায় ফিরে আসতে লাগলেন। এবং বারে বারেই জোরের সঙ্গে বলে যেতে লাগলেন, যে-রুপো দিয়ে পেয়ালাটি তৈরি তা থেকে পেয়ালাটিকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব।

অতএব আরিস্টটল বহু প্রাচীন পুস্তকের মধ্যে বিজ্ঞানের ভিত্তি সন্ধান করলেন। কোনো গ্রন্থকার ব্যাখ্যা করেছেন বস্তু সম্পর্কে, কোনো গ্রন্থকার

আকার সম্পর্কে। কিন্তু তবুও তিনি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তাঁর সমস্যার সমাধানের জন্য অনুসন্ধান করে চললেন।

এমনকি আকার ও বস্তু একসঙ্গে হলেও একটি পাত্র তৈরি হতে পারে না। আরও একটি হেতু থাকা চাই। তা হচ্ছে কারিগর, যে পাত্রটি তৈরি করে। তাহলে এই জগৎ সৃষ্টি করছে কে অথবা কী?

জবাবে আনাক্সাগোরাস বলেছিলেন, প্রকৃতিতে ধী আছে, এবং ধী থেকে জগতের সৃষ্টি। যেমন কারিগর সৃষ্টি করে পাত্র, ভাস্কর সৃষ্টি করে মূর্তি।

কিন্তু আনাক্সাগোরাস এই হেতুটি তখনই উপস্থিত করেছেন যখন অন্য কোনো ব্যাখ্যা একেবারেই পাওয়া যায়নি। তখনই, একমাত্র তখনই তিনি একটি সৃষ্টিকর্তা উপস্থিত করেছেন।

এম্‌পিডোক্লিস উপস্থিত করেছেন দুটি হেতু—ভালোবাসা ও ঘৃণা। ভালোবাসা সৃষ্টি করে, ঘৃণা ধ্বংস করে।

লিউসিপাস ও ডিমোক্রিটাস বলেছেন যে পরমাণুর অবিরাম গতিশীলতার ফলেই সবকিছু সৃষ্টি ও ধ্বংস হয়ে থাকে।

তার মানে, বস্তু ও আকার ছাড়াও অবশ্যই থাকা দরকার গতি।

কিন্তু এই গতি কোথা থেকে আসছে?

পুস্তকের মধ্যে এই প্রশ্নের কোনো জবাব আরিস্টটল খুঁজে পেলেন না। তখন তিনি গেলেন তাঁর পুরনো মহান শিক্ষক প্রকৃতির কাছে। আবার তিনি চলে গেলেন ক্ষেতে ও জঙ্গলে—দেখার জন্য, শোনার জন্য, স্পর্শ করার জন্য। দীর্ঘকাল ধরে পুস্তক অধ্যয়ন করার ফলে তাঁর ইন্দ্রিয় আরো ধারালো হয়েছে। এখন তিনি দেখতে পাচ্ছেন আগে যা দেখেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি।

চাষ-করা ক্ষেতে গিয়ে তিনি দেখলেন চাষীরা ভিজে মাটিতে বীজ ছড়াচ্ছে। দেখলেন এই বীজ অংকুরিত হচ্ছে। প্রথমে বেরিয়ে এল বোঁটা। এটি এমনই যে বীজ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই বোঁটার ওপরে এল শস্যের দানা। এটিও বোঁটা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

আরিস্টটল দেখলেন, কেমনভাবে পাখির ছানা ডিমের খোলা ভেঙে বেরিয়ে আসে এবং খাবারের জন্য আগ্রহের সঙ্গে ঠোঁট ফাঁক করে। মা-পাখিকে শুধু এইটুকুই করতে হয়েছিল যে তার সুন্দর নরম পালকের নিচে গরম রাখতে হয়েছিল ডিমগুলিকে। তখন আবার চিন্তা তাঁকে নিয়ে গেল বিশেষ থেকে নির্বিশেষের দিকে। বোঁটার মধ্যেই ছিল শস্যের দানা উৎপন্ন হবার ক্ষমতা। প্রকৃতি নিজেই বদলাচ্ছে এবং জিনিস তৈরি করছে—সেই মানুষের মতো যে নিজেই সেরে ওঠে। একটি রুপোর পাত্র তৈরি করার সময়ে মানুষ সচেতন থাকে সে কী করছে। প্রকৃতি সচেতন থাকে না, কিন্তু তবুও বোঁটাটিকে বদলে দেয় শস্যের দানায়। দুয়ের মধ্যে এই হচ্ছে তফাত। মাঝে মাঝে প্রকৃতি যা চায় তা উৎপন্ন করতে পারে না, তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়, একটা বিকট কিছু উৎপন্ন হয়ে থাকে। একমাত্র যদি একটা উদ্দেশ্য থাকে তাহলেই ভুল হতে পারে, আরিস্টটল ভাবলেন।

প্রকৃতি কী লক্ষ্যসাধন করতে চায়?

তার প্রশ্নের জবাবের জন্য আরিস্টটল আবার প্রকৃতির কাছে গেলেন।

একটি গাছের শেকড় পরীক্ষা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে একটি জীবন্ত প্রাণীর কাছে মুখ যা একটি গাছের কাছে শেকড় তাই। সমুদ্রের তীরে গিয়ে তিনি মাছ পরীক্ষা করলেন। ডাঙার প্রাণীর চেয়ে সেগুলি কতই না ভিন্ন। নিঃশ্বাস নেবার জন্য তাদের শরীরে ফুসফুসের বদলে আছে কান্‌কো। তাদের কান নেই, তবুও জেলেদের গাওয়া গান তারা শুনতে পায়, শুনতে পায় নৌকো চলে যাবার সময়ে দাঁড়ের ছপছপ।

জীবন্ত প্রাণীদের মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করলেন, ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া মইয়ের মতো তাদের সাজিয়ে তোলা যায়, সবচেয়ে নিচু থেকে সবচেয়ে উঁচু পর্যন্ত—শামুক তারামাছ স্পঞ্জ থেকে চার-পা-ওলা লোমে ঢাকা প্রাণী পর্যন্ত। শেষোক্ত দলে সবচেয়ে উঁচুতে রয়েছে বানর, যারা সবচেয়ে বেশি মানুষের মতো। অবশ্যই সবচেয়ে উঁচুতে রয়েছে মানুষ। জীবন্ত জিনিসের মধ্যে সবচেয়ে নিচুতে রয়েছে ঘাস ও গাছ, তার চেয়ে নিচে পাথর, কাদা, মাটি। প্রকৃতি অক্লান্তভাবে একটির পর একটি জিনিস সৃষ্টি করে চলেছে, প্রত্যেকটি জিনিস তার পূর্ববর্তী জিনিসের চেয়ে আরো জটিল।

প্রকৃতি একলাফে ত্রুটিহীনতায় পৌঁছয় না। উপকরণ সবসময়েই প্রকৃতিকে বাধা দেয়। দেখ না কেন, ভাস্করের ছেনিকে বাধা দিয়ে থাকে মার্বেলপাথর।

তাহলে কি একথাটা ভাবা ঠিক যে মানুষই হচ্ছে শেষ কথা, মইয়ের শেষ চূড়ান্ত ত্রুটিহীন ধাপ?

তার চেয়ে একথাটা ধরে নেওয়া কি আরো যুক্তিসংগত নয় যে মানুষের পরে আসবে এমন কিছু যা আরো বেশি নিখুঁত, বিশুদ্ধ সচেতনতার আরো কাছাকাছি?

এই তো, দেখা যাচ্ছে, সম্পূর্ণ অচেতনভাবেই আরিস্টটল আবার প্লেটোতে ফিরে যাচ্ছেন। বহু আগে আরিস্টটল বলেছিলেন, শরীর ছাড়া আত্মা থাকা অসম্ভব। কিন্তু এখন তিনি নিজেই বলছেন শরীর ছাড়াও কোনো এক জায়গায়—আমাদের জগতের বাইরে কোনো এক জায়গায়—বোধির অস্তিত্ব থাকতে পারে।

আরিস্টটল লক্ষ্য করে দেখলেন একখণ্ড কাঠ কী-ভাবে পুড়ে যায়, ধোঁয়া ও বাষ্পে পরিণত হয়, সেই ধোঁয়া ও বাষ্প বাতাসে ওঠে। তারপরে সেই ধোঁয়া আবার ফিরে আসে মাটিতে, সেই বাষ্প বৃষ্টি বা বরফ হয়ে নেমে আসে। তখন আরিস্টটল এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন : মাটি, আগুন, বাতাস, জল, তারপরে আবার মাটি।

এই হচ্ছে চারটি উপাদান যা সবকিছু গঠন করে।

এম্‌পিডোক্লিসও একই রকম ভেবেছিলেন।

রাত্রিবেলা বাইরে বেরিয়ে আরিস্টটল আকাশের তারার দিকে তাকাতেন, যেমন তাকিয়ে ছিলেন তাঁর আগে আরো বহু দার্শনিক। জানতে চেষ্টা করতেন কেমনভাবে এই বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। তার আগেই জেনেছিলেন এই জগৎ সমতল নয়, গোলক। জেনেছিলেন পিথাগোরাসের কাছ থেকে।

তাঁর কয়েকজন শিষ্য একথা বিশ্বাস করত না, তারা বলত : পৃথিবী যদি গোলকই হবে তাহলে এই গোলকের বিপরীত দিকে কোনো কোনো

লোককে মাথা নিচের দিকে পা ওপরের দিকে করে হাঁটতে হয়। আর জাহাজই বা কি করে এই খাড়া ঢাল বেয়ে ভেসে চলে?

আরিস্টটল একথা শুনে হাসতেন। তিনি আগেই জেনেছিলেন একজন লোকের পক্ষে যা ঠিক দিক অপর একজনের পক্ষে তা ওলটানো দিক। তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন যে পৃথিবী একটি গোলক।

কিন্তু পৃথিবীকে তিনি ভাবতেন অনড়। কিছু একটা যান্ত্রিক ব্যবস্হাপনায় এই অনড় পৃথিবীর চারদিকে গ্রহগুলি, সূর্য ও চন্দ্র ঘুরে চলেছে, কলের খেলনা যেমন চলে। তখন নিজেকে প্রশ্ন করলেন : এই যান্ত্রিক ব্যবস্হাপনাটি প্রথম চালু হলো কি করে? চালু করল কে বা কিসে?

আরিস্টটলের মনে হয়েছিল জবাবটি তিনি পেয়ে গিয়েছেন। নক্ষত্র ছাড়িয়ে, আকাশের সীমানা ছাড়িয়ে নিশ্চয়ই কোথাও এক বোধি আছে। সেই বোধি সবকিছুকে চালু করছে। এমনি এক বোধির আশ্রয় নিতেন আনাক্সাগোরাস, যখনই ভালোমতো ব্যাখ্যা খুঁজে পেতেন না। এজন্য অল্প কিছুকাল আগেও আনাক্সাগোরাসকে নিয়ে তামাসা করেছেন আরিস্টটল। কিন্তু এখন কিনা তিনি নিজেই সেই পুরনো ধারণাকে টেনে বার করলেন আর তার নাম দিলেন : 'আদি চালক'।

আরিস্টটল বললেন, চন্দ্রের নিচে আমাদের এই জগতে সবকিছু পরিবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু চন্দ্র পেরিয়ে যে গোলক রয়েছে সেখানে কোনো পরিবর্তন নেই। ওই হচ্ছে শাশ্বতের এলাকা। কেননা জ্যোতিষ্কগুলি বস্তু দিয়ে তৈরি নয়—মাটি বা জল বা আগুন বা বাতাস দিয়ে তৈরি নয়—তৈরি অবিনশ্বর ইথার দিয়ে। এমনিভাবে আরিস্টটল ফিরে গেলেন তাঁর পুরনো শিক্ষক প্লেটোর তত্ত্বে। এবং এই জগৎ পেরিয়ে তৈরি করলেন এক স্বর্গীয় জগৎ, যেখানে ধ্বংস নেই, মৃত্যু নেই, যেখানে সবকিছু শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়।

আরিস্টটল সঠিক পথ খুঁজে পেয়েছিলেন, কিন্তু সেই পথ তিনি হারিয়ে ফেললেন। প্রথমে ঘোষণা করেছিলেন শরীর ছাড়া আত্মা হয় না, বস্তু ছাড়া আকার হয় না এবং আইডিয়া সম্পর্কে প্লেটোর তত্ত্বকে কঠোর পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেই আবার 'আদি চালকের' কথা বললেন, যিনি রয়েছেন স্বর্গীয় এক জগতে, বস্তু থেকে একেবারেই দূরে।

গ্রীসের সমস্ত জ্ঞানকে একসূত্রে গেঁথে তুলতে গিয়ে তিনি চেষ্টা করলেন দুই বিরোধীকে মেলাতে—প্লেটো ও ডিমোক্রিটাস, পুরনো ধর্ম ও নতুন বিজ্ঞান।

পঞ্চম অধ্যায়

জ্ঞানী মানুষদের পথ

প্লেটোর মতো আরিস্টটলেরও শিষ্য ছিল। আরিস্টটল তাঁর ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলতে ভালোবাসতেন। কথা বলতেন ছায়াঘেরা যে-বীথিপথ এথেন্সের অন্যতম উচ্চতর স্কুল লাইসিয়াম পর্যন্ত গিয়েছে সেই পথে পায়চারি করতে করতে। এই কারণে ছাত্ররা তাঁর একটি ডাকনাম দিয়েছিল—'পেরিপাটেটিক'। এটি একটি গ্রীক শব্দ, অর্থ 'পায়চারি করা'। তিনি যেখানে যেতেন ছাত্ররা তাঁর সঙ্গ ধরত, যতোটা সম্ভব তাঁর সান্নিধ্যে থাকত, যাতে একটি কথাও শুনতে ভুল না হয়।

বক্তৃতা শেষ হয়ে যাবার পরে অনেকেই বিভিন্ন কাজে ছড়িয়ে পড়ত, তারা ছিল কাজের লোক। কিন্তু জনকয়েক থাকত যারা সঙ্গে করে তুলট নিয়ে আসত এবং সেদিনকার শেখা সবকিছু লিখে রাখত।

আরিস্টটল যখন রাজ্য ও শাসনপ্রণালী সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থ প্রস্তুত করছিলেন তখন তাঁকে গ্রীসের একশো-আটান্নটি ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের সংবিধান অধ্যয়ন করতে হয়েছিল। বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে এবং বহু পুস্তক লিখতে গিয়ে তাঁকে হাজার হাজার পুস্তক ব্যবহার করতে হয়েছিল। এমন একটি বিপুল বোঝা বহন করবার মতো কাঁধ একমাত্র আরিস্টটলেরই ছিল। কিন্তু এমনকি তিনিও তাঁর ছাত্রদের সাহায্য ছাড়া এ-কাজটি সম্ভবত করতে পারতেন না।

সত্য-সন্ধানীদের এই ছোট দলটি প্রতিদিন তাদের লক্ষ্যের আরো একটু কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছত। প্রতিটি ভ্রমণ ছিল বিজয়ী সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতির মতো। তার আগে মাত্র তিন শতাব্দী হলো বিজ্ঞানীদের কথা শোনা যাচ্ছে। প্রায়ই তাঁদের মধ্যে মতের অমিল ঘটেছে—যেমন ঘটে গ্রীসের যুদ্ধরত নগরগুলির মধ্যে। আরিস্টটলকে তাঁর পূর্ববর্তী সকল বৈজ্ঞানিক কর্মীর বক্তব্য পাঠ ও বাছাই করতে হয়েছিল, তা থেকে মোটফল গ্রহণ করতে হয়েছিল, তারপরেই তিনি বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে নিজের অবদান রাখতে পেরেছিলেন।

তাঁর রচিত পুস্তকগুলির বিষয় অতি-ব্যাপক : গণিত, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, বিজ্ঞানের ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র, রাজনীতি এবং সর্বোপরি দর্শন। উদ্ভিদবিদ্যার রচনাটি প্রকাশ করেছিলেন থিওফ্রাস্টাস। তিনি ছিলেন, তাঁর অনুগামীরা যাকে বলত পেরিপাটেটিক স্কুল, তার নেতা হিসেবে আরিস্টটলের উত্তরাধিকারী। ইউডেমাসের হাতে গিয়েছিল বিজ্ঞানের ইতিহাস, আরিস্টোজেনাসের হাতে সমন্বয়, ডিকিয়ারকাসের হাতে ভূগোল।

আরিস্টটল তখনো ছিলেন তরুণ যখন মাসিডনের রাজা ফিলিপ একটি

চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আপনার জীবনকালে আমি যে বেঁচে থেকেছি তার জন্য দেবতাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কেননা আমি আশা করি, আপনার ছাত্র হিসেবে আমার পুত্র আলেকজাণ্ডার মাসিডন রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবার যোগ্যতা লাভ করবে।'

ফিলিপ ছিলেন মহান রাজা, গ্রীসের সকল যুদ্ধরত নগরকে—এমনকি স্বাধীনতাপ্রিয় এথেন্সকে পর্যন্ত তিনি একটি রাজ্যে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। স্বপ্ন দেখতেন বৃহত্তর রাজ্যজয়ের এবং আশা করতেন যে তাঁর শুরু করা কাজ আলেকজাণ্ডার শেষ করবে।

একজন রাজকুমারের শিক্ষক হওয়া বড়ো সহজ কাজ ছিল না, বিশেষ করে আলেকজাণ্ডারের মতো রাজকুমারের, যে সমগ্র বিশ্ব জয় করতে চায়।

আলেকজাণ্ডার আরিস্টটলকে শ্রদ্ধা করতেন এবং বিজ্ঞান অধ্যয়ন করতেন। নিজের শিক্ষককে তিনি পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি মিলিয়ে এত প্রচুর উপহার দিয়েছিলেন যে সেগুলি বয়ে নিয়ে যেতে দুটো গোরুর গাড়ি প্রয়োজন হতো। আলেকজাণ্ডার যদি তাঁর শিক্ষকের সঙ্গে থাকতেন তাহলে তিনিও অন্য বিজ্ঞানীদের সঙ্গে লাইসিয়ামের বীথিপথ দিয়ে হেঁটে বেড়াতেন আর তাঁর শিক্ষক তাঁকে চালিত করতে পারতেন বিশ্বের শেষ পর্যন্ত এক অভিযানে শুধু নয়, স্বর্গের নক্ষত্রখচিত রাজ্যেও, মহাশূন্যের অসীম বিস্তারেও। তিনি বিশ্ব জয় করতেন শুধু তার নিজের জন্য ও মাসিডোনিয়ার জন্য নয়, বিজ্ঞানের জন্যও, সকল মনুষ্যজাতির জন্যও।

কিন্তু আলেকজাণ্ডারের মনে এসব চিন্তার বিন্দুবিসর্গও ছিল না। তিনি চাইতেন বিশ্ব জয় করতে, যে-বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল এমনকি ভারতবর্ষের বনভূমিও—যেখানে বিশাল বিশাল হস্তিযূথ ঘুরে বেড়াত।

তাঁর এই বিশ্বজয়ের আকাঙ্ক্ষা কেন? শোনা যায়, অভিযানে বেরিয়ে পড়ার আগে তিনি সমস্ত দাসকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং সমস্ত ভূ-সম্পত্তি বিক্রি করেছিলেন। লোকে তাঁকে জিজ্ঞেস করত, নিজের জন্য তুমি কী রাখলে? তিনি জবাব দিতেন, আশা। অভিযানের সময়ে সঙ্গে নিয়েছিলেন দেবী আশার একটি মূর্তি। তারপরে সেই বহুদূরের দেশ ভারতবর্ষে পেঁছে আশা করেছিলেন বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদের—সোনা, সোনা, সোনা, আর বহুমূল্য মণিমুক্তার। দেবী আশার মূর্তিতে থাবা ছিল সিংহের।

তাঁর অনুগামীরা আশা করত ভারতবর্ষে তারা প্রত্যেকে লাভ করবে যা তিনি সবচেয়ে বেশি আশা করতেন, যার জন্য তিনি সবচেয়ে বেশি স্বপ্ন দেখতেন। যারা আগে থেকেই শত শত দাস ও বিপুল জমির মালিক ছিল তারা আশা করত আরো দাস ও আরো জমি। যারা আগে থেকেই নিঃস্ব ছিল তারা আশা করত ধনসম্পদ ও দাস, যা নিয়ে অবশেষে তারা মুক্তিলাভ করবে আগাসী দারিদ্র্য ও অভাব থেকে। স্বদেশ ও পরিবার ছেড়ে আসার সময়ে তারা অশ্রুপাত করেনি। অনেক আশা নিয়ে তাদের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ ছিল।

সৈন্যবাহিনী প্রত্যেকটি যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল। বিজিত দেশগুলিকে মাসিডোনিয়ার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন আলেকজাণ্ডার। কিন্তু তিনি এই সমস্ত দেশের অধিবাসীদের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। বিজয়ী সৈন্যবাহিনী যেই সরে যেত স্থানীয় অধিবাসীরা গড়ে তুলত নতুন দল। আচমকা তারা

ঝাঁপিয়ে পড়ত আর হতচকিত সৈন্যদের অবাক করে দিত। সৈন্যরা তাদের আক্রমণ করতে পারার আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে যেত। শেষকালে সেই সৈন্যদল এমনই হতাশ ও বিরক্ত হয়েছিল যে হাতের তলোয়ার ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সেই তলোয়ার ভোঁতা হয়ে যায়, তাতে মরচে ধরে। যে আশা তারা পোষণ করেছিল তা পূরণ হয়নি। তারা বিদ্রোহ করে ও স্বদেশে ফিরে আসে। সে এক ছিন্নভিন্ন অংশ মাত্র—আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে অভিযানে বেরিয়েছিল যে-দল তার অবশিষ্ট। শুধু এইটুকুই তাদের আনন্দ যে তারা স্বদেশে ফিরে এসেছে। কেননা তাদের সঙ্গীসাথীদের অনেককেই তারা ফেলে এসেছে মরুভূমিতে ও সমতলে—যারা এতদিনে দগ্ধ হাড় ছাড়া কিছু নয়।

আলেকজাণ্ডার বিশ্বজয় করতে পারেননি। আর ইতালি থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত যে বিশাল সাম্রাজ্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা বিনা গাঁথুনিতে একটির ওপরে আরেকটি সাজিয়ে তোলা ইঁটের মতো খসে পড়েছিল।

কিন্তু তাঁর সহযাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর চেয়ে ভাগ্যবান ছিলেন। আলেকজাণ্ডার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন একদল বিজ্ঞানী। যে সাম্রাজ্য তাঁরা জয় করেছিলেন বিজ্ঞানের পক্ষে তা স্থায়ী হয়েছিল একবছরের জন্য নয়, দশবছরের জন্য নয়, যুগের পর যুগ। উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা আশা করেছিলেন হাজার হাজার নতুন বৃক্ষ ও উদ্ভিদ তাঁরা খুঁজে পাবেন এবং পেয়েওছিলেন। ভূগোলবিদরা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন মানচিত্র করার জন্য নতুন নতুন দেশ, সফল হয়েছিলেন তাঁরা। স্থাপত্যবিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছিলেন কবর, মন্দির, প্রাচীর ও ফলকের গায়ে অমূল্য সব লিপি। সেগুলি নকল করে তাঁরা দেশে নিয়ে এসেছিলেন বিশ্লেষণ করার জন্য।

উদ্ভিদবিদ্যার জনক থিওফ্রাস্টাস এই সমস্ত বিজ্ঞানীর কাছ থেকে জেনেছিলেন আশ্চর্য সব নতুন গাছের কথা যার শাখাগুলি নিচের দিকে বাড়ে আর বাড়তে বাড়তে মাটির ভিতরে চলে যায়, এবং তার ফলে একটি গাছকেই দেখায় অরণ্যের মতো। জেনেছিলেন এমন সব গাছের কথা যারা রাতে ঘুমোয় ও দিনের বেলা জেগে ওঠে, এমন সব নলখাগড়ার কথা যা গাছের মতো লম্বা হয়। জেনেছিলেন কলাগাছ ও বাঁশের কথা।

শোনা যায়, আলেকজাণ্ডার যখন করিন্থ থেকে তাঁর অভিযানের পথে রওনা হচ্ছিলেন সে-সময়ে তাঁর সঙ্গে দার্শনিক ডায়োজিনিসের দেখা হয়। ডায়োজিনিকের পরনে ছিল ছেঁড়া কাপড় যা তিনি কয়েক পেন্স দিয়ে দাস-বাজারে কিনেছিলেন। কি শীত কি গ্রীষ্ম, ডায়োজিনিস বাস করতেন একটা খোলা গামলার মধ্যে। তাঁর সঙ্গে কথা বলে আলেকজাণ্ডার দারুন খুশি হয়েছিলেন। তখন এই দার্শনিকের জন্য কিছু করতে চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন দার্শনিক যা চাইবেন তাই তিনি পূরণ করতে প্রস্তুত। ডায়োজিনিস বলেছিলেন, 'তাহলে দয়া করে একটু সরে দাঁড়ান। আপনি আমার কাছ থেকে সূর্যকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছেন।' আলেকজাণ্ডার সরে দাঁড়িয়েছিলেন, তারপরে বলেছিলেন, 'আমি যদি আলেকজাণ্ডার না হতাম তাহলে ডায়োজিনিস হতে চাইতাম।'

২। বন্ধুত্ব ও শত্রুতা সম্পর্কে

এই বইয়ে আমরা মনুষ্যজাতির ইতিহাস বলতে বসিনি। আমরা বলছি, নিজের জগতের দেয়াল ভেঙে ফেলার পরে মানুষ কিভাবে কখনো এগিয়েছে কখনো পিছিয়েছে—সেই কাহিনী। আমাদের কাহিনী মন্থর হয়ে গিয়েছে, যখন আমরা পথে যেতে যেতে প্রতিটি নুড়ি ও প্রতিটি গাছ পরখ করে দেখার জন্য থেমেছি। কিন্তু আমরা যদি সারা সময় এমনি মন্থরভাবেই চলতাম তাহলে দেখতাম গাছে গাছে জঙ্গল আর চোখে পড়ছে না। যদি আমরা মনুষ্যজাতির ইতিহাসের দিকে তাকাই, মনে হতে পারে এই ইতিহাস হচ্ছে একটির পর একটি বিরামহীন রক্তাক্ত যুদ্ধের কাহিনী। বাবিলন, আসিরিয়া, মিশর ও পারস্যের রাজারা কতবারই-না গোটা বিশ্ব জয় করার জন্য সামরিক অভিযানে বেরিয়েছেন! কতবারই-না নিজেদের মন্দিরের গায়ে ফলাও করে নাম জাহির করেছেন : 'বিশ্বের চার মহাদেশের রাজা!', 'রাজাদের রাজা!', 'বিশ্বের রাজা!' যেখানেই তাঁরা দেখেছেন নদীতে বাঁধ দিয়ে সেচ দেবার জন্য জল আটক করা হয়েছে, সেখানেই তাঁরা সেই বাঁধ চূর্ণ করেছেন, আটক জল ছেড়ে দিয়েছেন, সমৃদ্ধ সব নগরকে বন্যার জলে ডুবিয়ে দিয়েছেন। যেখান দিয়ে গিয়েছেন কোনো কিছু অক্ষত রেখে যাননি—বর্ধিষ্ণু শহর চাপা পড়ে গেছে শুধু ক্ষয়ক্ষতি ও ধ্বংসস্তূপের নিচে।

এই সব বিজয়ীর মধ্যে কতজন বিশ্বের প্রভু হতে সমর্থ হয়েছিলেন?

আসিরিয়ার রাজারা নিজেদের রাজ্যের সীমানা সম্প্রসারিত করেছিলেন চারপাশের সকল দেশের মধ্যে—আর্মেনিয়ার পর্বতমালা থেকে নীলনদের জলপ্রপাত পর্যন্ত, পশ্চিমের থ্রেস থেকে পুবের ভারতবর্ষ পর্যন্ত, উত্তরের কৃষ্ণসাগর থেকে দক্ষিণের আরবদেশ পর্যন্ত।

রাজা আলেকজান্ডার জয় করেছিলেন পারস্য এবং বাবিলন এবং মিশর।

কিন্তু তাঁদের মধ্যে কোনো একজনও সারা বিশ্বকে নোয়াতে পারেননি। পারেননি জয় করতে। তাঁরা যতোটা ভেবেছিলেন তার চেয়েও অনেক বড়ো এই বিশ্ব।

তাঁদের জয়লাভ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। যেই-না তাঁরা সাম্রাজ্য খাড়া করেছেন অমনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তা ভাঙতে শুরু করেছে। পুরনো রাজ্যের ভগ্নাবশেষ থেকে উদ্ভূত হয়েছে নতুন রাজ্য। আর তখন সেই নতুন রাজ্যের রাজারা আবার 'বিশ্ব জয় করার' নিষ্ফল কাজে প্রয়াসী হয়েছেন। সমুদ্রের ওপর দিয়ে জাহাজ ভেসে গিয়েছে, জমির ওপর দিয়ে যাত্রীদল সফর করেছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের দেখা হয়েছে, মেলামেশা হয়েছে, হাতে হাত মিলেছে। এই হাতগুলি অবিরাম কাজ করে গিয়েছে, বছর থেকে বছরে, যুগ থেকে যুগে। তারা ব্যস্ত থেকেছে পৃথিবী থেকে সম্পদ আহরণের জন্য : সাইপ্রাসের দ্বীপে তামা, নুবিয়ায় সোনা, তারসাসের পর্বতমালায় রুপো, ফিনিসিয়ার সিডার অরণ্যে তাদের জাহাজের জন্য কাঠ, বালটিক উপকূলে রজন, ব্রিটেনের খনিতে টিন। জাহাজে করে ও মরুযাত্রীদলের সঙ্গে এই সমস্ত দেশে তারা পাঠাত গলানো ধাতু, সূক্ষ্ম বস্ত্র, পাত্র, পাকানো প্যাপিরাস। পারস্যের দ্রুতগামী সংবাদবাহকরা দেশ থেকে দেশে ডাক বহন করে নিয়ে

যেত। দেশ থেকে পৌঁছে গেল বর্ণমালার সঙ্গে সঙ্গে ওজন ও মাপ সম্পর্কে জ্ঞান এবং বছরকে দিনে সপ্তাহে ও মাসে ভাগ করার বিদ্যা। বিভিন্ন দেশ পরস্পরের কাছ থেকে গ্রহণ করল সংখ্যাতীত শব্দ। ইউরোপের যে-কোনো ভাষা থেকে সমস্ত বিদেশী শব্দ বাছাই করে বাদ দেবার চেষ্টা যদি করা হয় তাহলে দেখা যাবে, সেটা একটা অসম্ভব কাজ। উদ্যমী জাতি এবং বংশ-পরম্পরায় মানুষ যে সম্পদ জড়ো করেছে আমরা তা তাদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। তাকেই আমরা বলি সংস্কৃতি।

জাতিসমূহ পরস্পরের দিকে হাত বাড়িয়েছিল। এক জাতির যা ছিল না, অন্য জাতির তা ছিল। এক জাতি যা করতে পারত না, অন্য জাতি শিখেছিল কেমনভাবে সেটা করতে হয়। সম্পদ জড়ো হয়েছিল, যে সম্পদ গড়ে তুলেছিল শ্রমজীবী জনগণ। কিন্তু যেখানেই সম্পদ সেখানেই ছিল লুণ্ঠনকারীরা। যেখানেই ছিল শিল্পীজনোচিত উদ্যমী হাত সেখানেই ছিল এইসব লুণ্ঠনকারীও, যারা চাইত অন্যদের পরিশ্রমের ফল ভোগ করতে। লোভী চোখ থেকে বাঁচাবার জন্য লোকে তাদের ধনসম্পদ লুকিয়ে রাখত, মাটির নিচে পুঁতে রাখত। কিন্তু পরিশ্রমী হাতকে তো আর লুকিয়ে রাখা যায় না। গোটা একটা দেশকে কি আর লুকিয়ে রাখা যায়? লুণ্ঠন-কারীরা পৃথিবী চষে বেড়াত। তাদের প্রয়োজন ছিল যতো-না দেশের মাটি তার চেয়ে বেশি এই সমস্ত কর্মপটু হাত। হাজার হাজার মানুষকে তারা খুন করত অবশিষ্ট যারা বেঁচে থাকত তাদের দাস করার জন্য। সবচেয়ে মূল্যবান যে সম্পদ তারা লুণ্ঠন করতে পারত সেটা সোনা নয়, রুপো নয়—দাস। মিশরে এই দাসদের বলা হতো 'জ্যান্ত মড়া'। মৃত শত্রু দিয়ে কী আর লাভ হয়? কিন্তু জ্যান্ত শত্রুকে দাস হিসেবে ব্যবহার করা চলে। সকল দেশের শ্রমিকরা আরও বেশি বেশি সম্পদ উৎপাদন করে চলল কিন্তু তা শুধু এই লুঠেরাদের করতলগত হবার জন্যই।

কী লোভীই না তারা ছিল। কখনো আশ মিটত না। যদি তারা একটি নগর দখল করত তাহলে চাইত দশটি। আর দশটি নগর হাতে এসে গেলে চেয়ে বসত একশোটি। তারপরে যখন একশোটি নগর পেয়ে যেত তখন দখল করতে চাইত গোটা বিশ্ব! কর্মের গুরুত্ব ক্রমেই বেড়ে চলল আর নতুন যুদ্ধ একটির পর একটি অবিরাম হয়েই চলল। কর্মরত এই সমস্ত হাত ছাড়া লুণ্ঠনকারীদের চলা সম্ভব ছিল না। দাসদের হাতে তৈরি হচ্ছিল নতুন নতুন তলোয়ার, আর এই সমস্ত তলোয়ার ব্যবহৃত হচ্ছিল আরও দাস পাবার জন্য। দাসরা নির্মাণ করছিল যুদ্ধজাহাজ আর এই সমস্ত যুদ্ধজাহাজে চেপে আক্রমণকারীরা যুদ্ধ করার জন্য বেরিয়ে পড়ত। তলোয়ারের জোরে জয় করা হতো একটির পর একটি দেশ। কিন্তু বিশ্ব জয় করতে কেউ পারেনি।

গল্প শোনা যায়, আলেকজাণ্ডার জানতেন তলোয়ার দিয়ে তিনি গিঁট কাটতে পারেন, কিন্তু তলোয়ার দিয়ে গিঁট বাঁধতে পারেন না। পারস্যের সঙ্গে তাঁর দেশের বন্ধনকে দৃঢ় করার জন্য তিনি তাঁর বাহিনীর দশহাজার অফিসারের সঙ্গে পারস্যের মেয়েদের বিয়ে দিয়েছিলেন এবং পারস্যের রাজার কন্যাকে নিজে বিয়ে করেছিলেন। বলা হয়ে থাকে, ইতিহাসে যতো বিয়ের কথা আজ পর্যন্ত লেখা হয়েছে তার মধ্যে এমন রাজসূয় বিয়ের কথা আর একটিও নেই।

দার্শনিক ডায়োজিনিস বলতেন, তিনি বিশ্বের নাগরিক। কিন্তু আলেকজান্ডার চেয়েছিলেন বিশ্বকে জয় করতে এবং দেবতা হতে। মিশরের অধিবাসীদের বদলে দিতে চেয়েছিলেন তিনি এবং হাজার হাজার গ্রীককে প্রাচ্যে বসবাস করিয়েছিলেন। যেখানেই গিয়েছিলেন নতুন নতুন নগর স্থাপন করেছিলেন। প্রত্যেকটি নগরের ছিল একই নাম—আলেকজান্দ্রিয়া।

৩। পুরনো ও নতুন

এক সময়ে মানুষ ভাবত এথেন্স এক বিরাট নগর। বাস্তবিকপক্ষে, এথেন্স ছিল নগরেরও অধিক—দশহাজার গৃহ নিয়ে একটি রাষ্ট্র। কিন্তু এমন দিন এল যখন নগর-রাষ্ট্র এথেন্স এত বেশি জনাকীর্ণ হয়ে গেল যে সেখানে সমস্ত মানুষের ঠাঁই হওয়া সম্ভব ছিল না।

দাস-শ্রমে উৎপন্ন হচ্ছিল বিপুল পরিমাণ সামগ্রী। কিন্তু এই সমস্ত সামগ্রী কিনতে পারে এমন ক্রেতা নগরের বাজারে ছিল না। সেগুলি জাহাজে চাপিয়ে বিদেশে চালান দিতে হতো। সেই জাহাজ যে-বন্দরেই নোঙর করুক, সেখানে জাহাজ থেকে মাল নামানো হোক বা না-হোক, মালিককে কর দিতে হতো। শুল্ক-প্রাচীর খাড়া থাকত সর্বত্রই। সংকীর্ণ উপসাগরের কূলে যে-সব মানুষ বাস করত তারা এপার-ওপার ডাণ্ডা চালিয়ে দিত যাতে বিদেশী বণিকরা থামতে ও কর দিতে বাধ্য হয়।

অপরিচিত নগরে এমনকি সবচেয়ে ধনী ও সবচেয়ে খ্যাতিমান বিদেশীরও কোনো অধিকার থাকে না। বাড়ি বা জমি কিনতে পারে না সে। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে থেকে একজন পৃষ্ঠপোষক বার করতে হয় তার অধিকার ও সম্পত্তি রক্ষায় তাকে সাহায্য করার জন্য।

বণিকদের মধ্যে এমন কেউ কেউ ছিল যারা একসঙ্গে অনেকগুলি নগরের সঙ্গে বাণিজ্য করত এবং সওদাগরী জাহাজের পুরো বহর পাঠিয়ে দিত। এখন যদি প্রত্যেকটি ছোট নগরও বিদেশীদের বিরুদ্ধে শুল্ক মুদ্রা ও কানুন রাখে তাহলে সেটা তাদের পক্ষে লাভজনক হয় না। ব্যবসা বাড়িয়ে তোলার জন্য এই সমস্ত ধনী বণিকের প্রয়োজন হয় এমন এক রাষ্ট্র যার মধ্যে থাকবে শুধুই একটিমাত্র নগর নয়, অনেকগুলি নগর ও দেশ। যে-সব মহাজন বণিকদের সুদে টাকা ধার দিত তাদেরও একই প্রয়োজন। উৎপাদনকারীদেরও তাই। তাদের কারখানায় নিযুক্ত ছিল শত শত দাস, তারা সামগ্রী উৎপাদন করত শুধু দেশের বাজারে বিক্রি হবার জন্য নয়, দূর দূর নগরের জন্যও।

রাজ্যের সীমানাকে বাড়িয়ে তোলা যেতে পারে একমাত্র রাজ্যজয়ের মাধ্যমে। বিজিত দেশ থেকেও আসে দাস ও কাঁচামাল—পশম, চামড়া, লোহা ও তামা। ,

আর তখন শুরু হয়েছিল রাজ্যজয়ের জন্য অভিযান। এথেন্সের, আলসিবিয়াডিস তার জাহাজের বহর নিয়ে সিসিলির বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিল। স্বপ্ন দেখত, পশ্চিম ও পূর্ব গ্রীসের নগরগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করবে। কিন্তু এথেন্স-পক্ষীয়দের পরাজয়ে তার এই অভিযান শেষ হয়েছিল। বহু বছর পরে মাসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপ গ্রীক নগরগুলিকে ঐক্যবদ্ধ

করতে চেষ্টা করেছিলেন। পরে তাঁর পুত্র আলেকজাণ্ডার একই চেষ্টা চালিয়ে যান। আলেকজাণ্ডারের রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যে টুকরোগুলি রয়ে গেল তাও ছিল বিপুল। সিরিয়া, মাসিডোনিয়া ও মিশর সেই আগের মতো নগর রাষ্ট্র ছিল না : তারা ছিল বৃহৎ বৃহৎ দেশ।

বৃহৎ রাষ্ট্র মানেই শক্তিশালী রাষ্ট্র। শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রয়োজন ছিল রাজ্যজয়ের জন্য, দাস-মালিকদের ধনসম্পত্তি রক্ষা করার জন্য, শত্রুর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য। এসব করতে হলে গণতন্ত্র বর্জন করতে হয় এবং ফিরে যেতে হয় রাজতন্ত্রে। রাজার শাসন চলছিল মিশরে, সিরিয়ায় ও মাসিডোনিয়ায়। এই রাজাদের দেবতার মতো পুজো করা হতো।

নতুন রাষ্ট্রের প্রয়োজন ছিল নতুন দর্শন—একথা প্রমাণ করার জন্য যে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং বাছাই করা কয়েকজনই মাত্র শাসক হতে পারে। সাধারণ মানুষরা হচ্ছে মেষের পাল আর শাসকরা হচ্ছে মেষপালক। শাসকরা যেমন চায় সাধারণ মানুষের চিন্তাও হবে ঠিক তেমনটি। বিজ্ঞান চুলোয় যাক। দার্শনিকদের প্রমাণ করতে হবে যে বিজ্ঞান মনুষ্যজাতিকে নিয়ে এসেছে এক অন্ধ গলির মধ্যে, যেখান থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র পথ হচ্ছে দেবতাদের প্রতি বিশ্বাস। আর রাজার ক্ষমতাই হচ্ছে দেবতাদের দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা। দর্শনের ক্ষেত্রে এটা ছিল আত্মাদের ছায়াময় জগতে প্রত্যাবর্তন। মানুষের মুখে শোনা যেতে লাগল পূর্বপুরুষদের জীবনে ও বিশ্বাসে ফিরে যাওয়ার কথা। কিন্তু ইতিহাসের কথা অন্য, সেখানে অতীতে ফিরে যাওয়া ঘটে না।

প্লেটোর দর্শন প্রকৃতপক্ষে 'আমাদের পূর্বপুরুষদের বিশ্বাস' থেকে ভিন্ন। এই 'পূর্বপুরুষরা' আন্তরিকভাবে ও সরলভাবে দেবতায় বিশ্বাস করতেন, সেজন্য তাঁরা প্রমাণ করার চেষ্টা করতেন না যে দেবতাদের অস্তিত্ব আছে। প্লেটো চেষ্টা করেছিলেন তাঁর শিক্ষাকে বিজ্ঞানের আকার দিতে, যাতে সেই শিক্ষা প্রকৃত বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সইতে পারে।

'পূর্বপুরুষরা' সদসৎ নিয়ে তর্ক তুলতেন না। তাঁরা মনে করতেন, দেবতাদের ইচ্ছা মান্য করাটা সৎ, অমান্য করাটা অসৎ। কিন্তু সক্রেটিস চেয়েছিলেন নৈতিক নিয়মসমূহ প্রমাণ করতে, গণিতবিদ যেমন প্রমাণ করেন তাঁর উপপাদ্য। তাই সক্রেটিসের শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা হতো যেন প্রাচীন ধর্মের সঙ্গে তার সংঘাত রয়েছে। তাই সক্রেটিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হতো যে তিনি নতুন নতুন দেবতা প্রবর্তন করেছেন।

নতুন বিশ্বাস ও নতুন নিয়ম ছিল পুরনো থেকে পৃথক।

'পূর্বপুরুষদের' আমলে অভিজাতরা শাসন করত। কিন্তু এখন অভিজাত হয়ে উঠেছে উৎপাদনকারীরা, মহাজনরা, এবং সারা বিশ্বের সঙ্গে যারা বাণিজ্য করে সেই বণিকরা।

একসময়ে নগরে বিদেশী থাকলে তার প্রতি শত্রুর মতো আচরণ করা হতো। এখন এমন সব নগর গড়ে উঠেছে যেখানে প্রত্যেকেই বিদেশী। কিংবা আরো সঠিকভাবে বলতে হলে, প্রত্যেকেই স্থানীয় অধিবাসী—সে গ্রীক হোক, মিশরীয় হোক, ফিনিসীয় হোক।

আলেকজান্দ্রিয়া নগরটি একবার পরিদর্শন করলেই বোঝা যায় 'পূর্বপুরুষদের' সেকালের জীবন থেকে একালের নতুন জীবন কতটা আলাদা।

৪। চেনা জায়গাগুলিও অচেনা মনে হয়

নীলনদের তীরে ফিরে আসা যাক। একটা সময় ছিল যখন মিশর তার অধিবাসীদের কাছে মনে হতো এক সংকীর্ণ ক্ষুদ্র দেশ। সমুদ্র ছিল দুস্তর এক বাধা। তাদের প্রতিবেশীরা সকলেই ছিল শত্রুভাবাপন্ন, 'শয়তানের বংশ'।

তারপরে সমুদ্র হয়ে উঠেছিল জগতের দিকে উন্মুক্ত বিশাল এক তোরণ। আর এই সমুদ্রের তীরে দেখা দিয়েছিল বিরাট এক নগর—জগতের কেন্দ্র। নগরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আলেকজান্ডার। তাঁর সম্মানে নগরের নাম হয় আলেকজান্দ্রিয়া।

আলেকজান্দ্রিয়া তখনো অনেক দূরে, নাবিকরা রয়েছে দূর সমুদ্রে, তবুও তাদের তীক্ষ্ন চোখে ধরা পড়ে আলেকজান্দ্রিয়ার উঁচু আলোকস্তম্ভের ঝিকিমিকি আলো। আকাশছোঁয়া সেই আলোকস্তম্ভের চুড়োয় সমুদ্রের দেবতা পোজিডনের মূর্তি, কেশর নাড়িয়ে তিনি জগতের চারদিক থেকে আসা জাহাজগুলিকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। বন্দরে ভিড় করে রয়েছে দানাশস্যে ঠাসা বোঝাই বাণিজ্য-জাহাজের পাশাপাশি তিন-দাঁড়ী ফৌজী ডিঙি। একটি জাহাজ বন্দর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে না যেতেই অপর একটি জাহাজ ঢুকে পড়ছে। তীরভূমিতে দলে দলে লোক এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে, কথা বলছে ডজনখানেক বিভিন্ন ভাষায়—গ্রীক, হিব্রু, ফিনিসীয়, ল্যাটিন ও পারসিক। সোনা ও হাতির দাঁতের দেশ নুবিয়ার কালো-চামড়া মানুষরা দাঁড়িয়ে আছে সুগন্ধী সুরভির দেশ আরবের পাকা-দাড়ি শেখদের পাশাপাশি। আলেকজান্দ্রিয়ার নিজস্ব ভাষা আছে, কিন্তু সেই ভাষায় মিশে গিয়েছে গ্রীক, মিশরীয়, হিব্রু ইত্যাদি বহু বিভিন্ন ভাষার সমস্ত রকমের শব্দ।

সমুদ্রপথে আলেকজান্দ্রিয়া পৃথিবীর সকল অংশের সঙ্গে যুক্ত—বাইজানটিয়াম, এথেন্স, সিরাকুস, কার্থেজ, মার্সাই। প্রাচ্য থেকে জাহাজ-বোঝাই হয়ে আসে সুগন্ধী মশলা, হাতির দাঁত, এবং যুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য হাতি। একটি চওড়া নাব্য খাল লোহিত সাগরকে যুক্ত করেছে নীলনদের সঙ্গে। এই জলপথ দিয়ে জাহাজগুলি আলেকজান্দ্রিয়া ও ভূমধ্যসাগরে পেঁছে যায়। আলেকজান্দ্রিয়া থেকে প্রাচ্যে যায় শাসক টলেমি-দের মূর্তি-ছাপা সোনার মুদ্রা, গ্রীক পাত্র, ফুল দিয়ে সাজানো কাঁচের পেয়ালা, গলার হার, হাতের বালা। অন্যদিকে জলপথে সমুদ্র পার হয়ে এবং স্থলপথে মরুভূমি পার হয়ে চীন থেকে এসে পেঁছয় মনোরম, বাহারী রঙের প্রাচ্যদেশীয় শাল।

এই যে চীনদেশ, সেখানকার মানুষরাও তাদের জগতকে ঘিরে থাকা দেয়ালগুলি ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছিল। অনেক কাল আগে থেকেই তারা দেশের নদী দিয়ে নৌকো চালাচ্ছিল। এবারে খোলা সমুদ্র দিয়ে পশ্চিমের দিকে দূর থেকে আরও দূরে পাড়ি দিতে শুরু করেছে। বিখ্যাত চীনা সম্রাট চান্ মঙ্গোলিয়াও তুর্কিস্তানের মরুভূমি পার হয়ে যেতে পেরেছিলেন। তার আগে এই দুটি দেশের নাম চীনের কোনো মানুষই জানত না। চীনা

সৈন্যদল কাস্পিয়ান সাগরে পেঁাছেছিল। চীনা বণিক ও সন্ন্যাসীরা পেঁাছেছিল নীলনদে।

গ্রীকরা যাকে বলত প্রাচ্য, চীনাদের কাছে তা ছিল পাশ্চাত্ত্য।

যে দুটি দেশকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল পর্বত ও মরুভূমি তারা এই প্রথম মিলিত হলো এবং পরস্পরকে জানল। চীনা শিল্পীরা অলংকৃত গ্রীক পাত্র পরীক্ষা করে বলল, 'এই বিদেশীদের কাছে আমাদের কিছু শেখার আছে।'

পশ্চিমী জগতও বড়ো হয়ে উঠল।

একসময়ে লোকে ভাবত, হারকিউলিসের স্তম্ভই বুঝি জগতের শেষ। তার বাইরে শুধু অসীম সমুদ্র, যা জগতকে ঘিরে রয়েছে। তারপরে মার্সাইয়ের নাবিকরা সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে উত্তরের দিকে চলল এবং আবিষ্কার করল ব্রিটেন। তাদের মুখে শোনা গেল, ব্রিটেন ছাড়িয়ে গেলে পাওয়া যেতে পারে আরও একটি অজ্ঞাত দেশ—তুলে দ্বীপ।

লোকে এরপরে আর ভাবত না যে হারকিউলিসের স্তম্ভই জগতের শেষ। জগতের শেষ এখন দূরের সেই তুলে দ্বীপ।

আলেকজান্দ্রিয়ার বাজারে মেয়েরা রজন কিনত। রজনকে বলা হতো নদীর দেবতার 'পাষাণী অশ্রু'। আসত বালটিক থেকে।

আগেকার অন্যান্য নগরের মতো আলেকজান্দ্রিয়া এমনি এমনি গড়ে ওঠেনি। পরিকল্পনা মাফিক এই নগরকে গড়ে তোলা হয়েছে। দুটি প্রধান রাস্তা, প্রতিটি পঞ্চাশ পা চওড়া, নিয়মিত ব্যবধানে এই দুটি রাস্তাকে আড়াআড়ি পার হয়ে গিয়েছে অন্যান্য রাস্তা। সেগুলিও যথেষ্ট চওড়া, যাতে রথ ও ঘোড়সওয়ার চলাচল করলেও ঠাসাঠাসি না হয়। আড়াআড়ি রাস্তা-গুলির নাম দেওয়া হয়েছে গ্রীক বর্ণমালা থেকে—যথা, আল্‌ফা, বিটা, গামা, ডেলটা, ইত্যাদি।

নগরের এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে রয়েছে মন্দির ও প্রাসাদ। মন্দিরগুলির দেয়াল জুড়ে পাথরের ওপরে খোদাই করা লিপি। প্রধান মন্দিরটি নতুন এক দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গিত, পূত। তিনি সেরাপিস, আলেকজান্দ্রিয়ার রক্ষাকর্তা। জগতের অন্য সব নগরের মতো এই নগরেরও একজন রক্ষাকর্তা দেবতার প্রয়োজন হয়েছে।

আলেকজান্দ্রিয়ার মায়েরা ছেলেমেয়েদের কাছে গল্প করে কোনো এক সময়ে একজন টলেমি কী স্বপ্ন দেখেছিল : এক দীর্ঘকায় সুন্দর যুবা টলেমির কাছে এসে বলেছিল, 'পন্‌টুস নদীর তীরে আমি বাস করি, সেখানে তোমার একটি জাহাজ পাঠিয়ে দাও।' পরদিন সকালে টলেমি তার এই স্বপ্নের কথা পুরোহিতদের কাছে বলে। পুরোহিতরা জানায়, তারা কখনো এমন জায়গার নাম শোনেনি। টলেমি তার স্বপ্নের কথা একেবারে ভুলে যায়। কিন্তু সেই স্বপ্ন আবার দেখল সে, এবং একটি জাহাজ পাঠাবার হুকুম শুনল। এবারে স্বপ্নের ব্যাখ্যা চাইতে টলেমি উপস্থিত হলো ডেলফির দৈববাণীর কাছে। দৈববাণী জানাল, এই যুবা এক সুন্দর দেবতা, থাকেন সিনোপ নগরে, তিনি টলেমির কাছে নিজের একটি মূর্তি পাঠাতে চান। টলেমি তৎক্ষণাৎ জাহাজ পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু সিনোপের রাজা সেই মূর্তিটি দিতে রাজী হলো না। তখন সেই মূর্তি নিজের থেকেই বেদী

থেকে উড়ে জাহাজে এসে নামল। তিনদিনের মধ্যেই জাহাজ ফিরে এলো আলেকজান্দ্রিয়ায়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে আলেকজান্দ্রিয়ার রক্ষাকর্তা দেবতাও এসেছেন বিদেশ থেকে।

মিশরের এই নগরে সবকিছুই অন্য কোনো দেশ থেকে আমদানি করা। এমনকি রাজারা পর্যন্ত—টলেমিরা—মিশরীয় নয়। আগেকার দিনে একজন মিশরীয় একজন গ্রীকের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেত না। রাজা টলেমি ফারাও নাম নিয়েছিল এবং নিজের গ্রীক নামের সঙ্গে একটি মিশরীয় নাম জুড়ে দিয়েছিল, যার অর্থ : 'রা, নির্বাচিত ও আম্মনের প্রিয়জন'।

অতএব এই নতুন নগরে সব রকমের ভাষা, বিশ্বাস, আচার-আচরণ অবাধে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। একসময়ে সবগুলিই ছিল পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন—শুধু সমুদ্র ও পর্বতের দ্বারা নয়, সন্দেহ ও ঘৃণার দ্বারাও।

আলেকজান্দ্রিয়া ছিল জগতের কেন্দ্র, এবং তারই মধ্যে জগৎ প্রতিফলিত—যেমন প্রতিফলিত হয় আয়নায়।

অতীতে নাবিকরা দেশে ফিরে এসে অদ্ভুত সব জন্তু-জানোয়ার সম্পর্কে অবিশ্বাস্য সব কাহিনী বলত। এখন তারা নিজেরাই আলেকজান্দ্রিয়ার বিশাল চিড়িয়াখানায় গিয়ে সেইসব জন্তু-জানোয়ার সশরীরে দেখে আসতে পারে। সেখানে আসে হাতি, জিরাফ, উষ্ণমণ্ডলীয় আফ্রিকার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাপ।

উদ্ভিদ-উদ্যানও আছে একটি—বিশ্বের প্রথম। সেখানে এমন সব গাছ রয়েছে যা গ্রীসে থাকতে পারে এমন কথা অরণ্যের দেবতা প্যানও কল্পনা করতে পারেনি।

আলেকজান্দ্রিয়ার বিরাট গ্রন্হাগারে অমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য প্যাপিরাস গ্রন্হ রয়েছে হাজার হাজার। তাদের শুধু একটি তালিকা করতে হলেও বিরাট গ্রন্হ হয়ে যায়। এই গ্রন্হাগারের দায়িত্বে ছিলেন ইরাটোস্হিনিস। এথেন্সে আকাডেমিতে প্লেটোর অনেক ছাত্র ছিল। আরো বেশি ছাত্র ছিল আরিস্ট-টলের, তাঁর লাইসিয়ামে। কিন্তু, কি আকাডেমি কি লাইসিয়াম, কোনোটিকেই আলেকজান্দ্রিয়ার মিউজিয়ামের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। এই মিউজিয়ামটি ছিল কলামন্দির। আগেকার কালে মন্দির নিবেদিত হতো কেবলমাত্র দেবতাদের উদ্দেশে। কিন্তু এখানে এই আলেকজান্দ্রিয়ায় সবচেয়ে বড়ো মন্দিরটি বিজ্ঞানের উদ্দেশে নিবেদিত।

বিভিন্ন নগর থেকে বহু পণ্ডিতকে ডেকে পাঠাত রাজা, তারা বাস করত এই কলামন্দিরে। বিজ্ঞান ছাড়া অন্য কোনো বিষয় নিয়ে তাদের ভাবতে হতো না। তাদের কাজ, তাদের ভ্রমণ, তাদের পরীক্ষাকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত অর্থ তারা পেত রাজকোষ থেকে। সান্ধ্য আহারের জন্য প্রতিদিন তারা একসঙ্গে মিলিত হতো। আহারের পরে তারা বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করত।

পরাক্রান্ত এক রাষ্ট্র শাসন করত মিশরের রাজারা। তারা জানত বিজ্ঞান এক বিরাট শক্তি। গণিত ও বলবিদ্যার প্রয়োজন দুর্গ, যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ করার জন্য ; জ্যোতির্বিদ্যার প্রয়োজন নৌ-চলাচলের জন্য ; ভেষজ-

বিদ্যার প্রয়োজন জনগণের স্বাস্থ্যের জন্য। মিশরের রাজারা—টলেমিরা—কবি ও দার্শনিকদের প্রতিও উদার ছিল। কারণ, যেখানে বিজ্ঞানীরা সাহায্য করত তাদের সামরিক শক্তি ও তাদের সম্পদ গড়ে তোলার জন্য, সেখানে কবিরা গাইত তাদের গুণগান, আর দার্শনিকরা প্রমাণ করত তারা রাজ্যশাসন করে ঐশ্বরিক ক্ষমতার দ্বারা।

আলেকজান্দ্রিয়ার অধিকাংশ দার্শনিক ছিলেন প্লেটোর অনুগামী। কথাটা শুনলে প্লেটো খুশি হতেন। এথেন্সে তাঁর সমকালীনরা তাঁকে যতোখানি মূল্য দিত তার চেয়ে বেশি মূল্য দিত টলেমিরা।

আলেকজান্দ্রিয়ার রাজারা ডিমোক্রিটাসের অনুগামীদের সম্পর্কে সন্দিহান ছিল। তাকের ওপরে ডিমোক্রিটাসের বইগুলির ওপর ধুলো জমত। আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরিতে প্রায় কেউ-ই ডিমোক্রিটাসের বই পড়ত না। বহুকাল পরে-পরে কখনো-বা একজন পদার্থবিদ বা গণিতবিদ কোনো উপপাদ্য প্রমাণ করতে গিয়ে বা কোনো প্রাকৃতিক ব্যাপার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডিমোক্রিটাসের শিক্ষার উল্লেখ করতেন। কাজটি তাঁরা করতেন চুপিসাড়ে, কেননা এই নিরীশ্বরবাদী ও সমতায় বিশ্বাসী দার্শনিক মিউজিয়ামের রাজবংশীয় পৃষ্ঠপোষকদের সুনজরে ছিলেন না।

মিউজিয়াম সম্পর্কে তার প্রতিষ্ঠাতাদের যে ধারণা ছিল তদনুযায়ী মিউজিয়াম হওয়া উচিত ছিল অতীব বর্ধিত আকারে প্লেটোর আকাডেমি। বাস্তবে মিউজিয়ামটি প্লেটোর আকাডেমিও হয়নি বা আরিস্টটলের লাইসিয়ামও না। আকাডেমিতে ছাত্ররা কথা বলত ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করত। কিন্তু তারা কখনো হাতে-কলমে পরীক্ষাকার্য করেনি। অন্যদিকে বিজ্ঞানের এই নতুন মন্দিরে লোকে কাজ করত শুধু তাদের মাথা দিয়ে নয়, হাত দিয়েও। মাপ ও ওজন নেওয়া, ফোটানো-মেশানো-গলানো, সবই তারা করত। এখানে যে-সব লম্বা টেবিলের ওপরে কাজ হতো সেখানে দেখা যেতো শুধু প্যাপিরাস পাণ্ডুলিপি নয়, তার সঙ্গে যন্ত্রপাতিও। মানমন্দির-গুলিতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের হাতে থাকত পর্যবেক্ষণের যন্ত্রপাতি। তার সাহায্যে নক্ষত্রদের গতিবিধি দেখা যেত। তাছাড়া ছিল পদার্থবিদ্যার গবেষণাগার। সেখানে থাকত ফোটানো ও পরীক্ষা করার জন্য, মেশানো ও গলাবার জন্য কেটলি ও নল।

এখানে এই মন্দিরে নিষিদ্ধ কাজ করার সাহস পণ্ডিতদের ছিল। লাইব্রেরিতে তারা এমনকি হোমারের রচনা সম্পাদনা করত। 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি' থেকে কৃত্রিম স্তবকগুলি কেটে-ছেঁটে বাদ দিয়ে দিত। কেউ কেউ এতদূর পর্যন্ত যেত যে হোমারের অস্তিত্ব সম্পর্কেই সন্দেহ প্রকাশ করে বসত। ক্রীড়াঙ্গনে হিরোফিলাস মানুষের শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করতেন এবং সেজন্য এই ভয় তাঁকে করতে হতো না যে ঈশ্বরনিন্দা করার জন্য তিনি অভিযুক্ত হতে পারেন। হিরোফিলাস আবিষ্কার করেছিলেন যে মানুষের চিন্তার আধার হচ্ছে মস্তিষ্ক—হৃৎপিণ্ড নয়, যা আগেকার কালের বিজ্ঞানীরা ভাবতেন। তিনি জানতে পেরেছিলেন ধমনীগুলি ভরা থাকে রক্তে, বাতাসে নয়। সেই এম্‌পিডোক্লিসের সময় থেকেই ক্রোটোনার চিকিৎসক আল্‌ক-মিয়নের মনে হয়েছিল, জন্তু-জানোয়ারের চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্ক। কিন্তু আল্‌কমিয়ন পরীক্ষা করেছিলেন কেবলমাত্র জন্তু-জানোয়ারের দেহ।

আর হিরোফিলাস প্রাচীন বাধানিষেধ অমান্য করে মানুষের দেহ ব্যবচ্ছেদ করেছিলেন। গ্রীসের চেয়ে মিশরে এই পদক্ষেপটি নেওয়া সহজ ছিল। কেননা মিশরীয়রা সেই স্মরণাতীত কাল থেকে শবদেহকে ভেষজ-নিষিক্ত করার বিদ্যা প্রয়োগ করে আসছে।

এমনিভাবে হাজার হাজার হাত কাজ করেছিল মাথার কাজ সম্পূরণ করার জন্য। অন্যদিকে মাথা সবসময়ে হাতের কাজ পরখ করে এসেছে। হাত সাহায্য করেছে মাথাকে, মাথা সাহায্য করেছে হাতকে। এই প্রথম শুধু শ্রমিকরা নয়, বিজ্ঞানী ও মনীষীরাও ব্যবহার করেছে হাতিয়ার, তাতাল ও তুলাদন্ড। হাতের সাহায্যে তারা পরখ করতে চেয়েছে মাথা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে তার সত্যতা।

৫। মাথা ও হাত

বহু শতাব্দী ধরে মানুষের হাত মানুষের মাথাকে শিখিয়েছিল। হাত যতো বেশি বেশি সমর্থ হয়ে উঠেছে, মাথা ততো বেশি বেশি ধী-সম্পন্ন হয়ে উঠেছে। বাস্তব দক্ষতা লাভ করে যতোই প্রসারিত হয়েছে মন, ততোই কাজের ওপরে আরো বেশি খবরদারি গ্রহণ করতে শুরু করেছে মাথা।

তাই দেখা গেল, একটি মন্দির বা একটি পিরামিড নির্মাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রকান্ড একটি পাথরের চাঁই ওপরে তুলতে হাত যখন অসমর্থ হয় তখন মাথা তাকে সেই পাথরের চাঁইয়ের নিচে লিভার বা ভারোত্তোলন যন্ত্র স্থাপন করার জন্য নির্দেশ দিয়ে থাকে। কিন্তু লিভারের সাহায্যে পাথরের চাঁইটিকে মাটি থেকে ওঠানো যায় মাত্র, মন্দিরের চুড়োয় তোলা যায় না। তখন আবার মাথা এগিয়ে আসে, ভেবে দেখে যে পাথরের চাঁইকে ওঠাতে হচ্ছে ঢাল বেয়ে, তখন পাথরের চাঁইয়ের নিচে একটা কাঠের গুঁড়ি রাখার পরামর্শ দেয়। কেননা একটা জিনিসকে ঘষ্‌টে তোলার চেয়ে গড়িয়ে তোলা অনেক সহজ। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই ছিল বড়ো বেশি জটিল ও কষ্টকর।

তখন কাজটা করার জন্য আরো ভালো একটা উপায় বার করে মাথা। আবিষ্কার করে পুলি। একটা ওজন আরো সহজে ওপরে তোলা যায় যদি সেটা তোলা হয় পুলির মধ্যে দিয়ে গলানো তারের সাহায্যে। তখন দুই হাতেই চার বা আরো বেশি হাতের মতো ওজন তোলা যায়।

মাথা হাতকে সাহায্য করেছিল, কিন্তু হাত মাথাকে বিশ্রাম দেয়নি। নিত্যই নতুন নতুন কর্তব্য উপস্থিত করেছে মাথার সামনে।

সেচের জন্য নদী থেকে জল পাওয়াটা যখন হাতের পক্ষে শক্ত হয়ে ওঠে, মাথা তখন একটা আয়োজনের কথা ভাবে। একটি লিভার আটকানো হয় হাতল সহ একটি দণ্ডের সঙ্গে। হাতলটি হাত দিয়ে ঘোরানো হয়, হাতল ঘুরলে দণ্ড ঘোরে, আর দণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে কিনারে বালতি লাগানো একটি ছড়। এই হচ্ছে জল তোলার যান্ত্রিক আয়োজন সমন্বিত কুয়ো। আশ্চর্য এক আবিষ্কার। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই আবিষ্কারটি টিকে থেকেছে এবং হাতকে তার কাজে সাহায্য করেছে।

কিন্তু যখন আরো জমিতে চাষ শুরু হয় তখন আরো বেশি জলের

প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনই হচ্ছে সেরা শিক্ষক। মাথা ভাবতে থাকে : হাতকে একেবারে বাদ দিয়ে কি-ভাবে চালিয়ে যাওয়া যায়? জবাব পাওয়া যায় মানুষের চার-পা-ওলা চাকরদের কাছ থেকে। এই জীবগুলি স্মরণাতীত কাল থেকে মাল বহন করায় অভ্যস্ত। অতএব কুয়ো থেকে জল তোলার যান্ত্রিক আয়োজনে একটি ঘোড়া জুতে দেওয়া হয়। ঘোড়া চক্রাকারে ঘুরতে থাকে, সেই সঙ্গে ঘোরে হাতল। হাতলের ঘোরা একটি গিয়ারকে চালু করে আর তা থেকে ঘুরতে থাকে একটি দণ্ড। এই দণ্ডে জড়ানো থাকে একটি দড়ি আর দড়িতে বাঁধা থাকে একটি বালতি। এমনিভাবে মানুষের হাত আরো দক্ষতাপূর্ণ কাজের জন্য মুক্ত হয়ে যায়—যেমন, দণ্ডগুলি পালিশ করা ও গিয়ার কাটা। যতোই সময় যেতে থাকে ততোই জটিল থেকে জটিল-তর কাজ সামলাতে থাকে মাথা, আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে হয় হাতকেও।

নদী থেকে জল টেনে আনার কাজে মানুষ ঘোড়াকে লাগিয়েছিল। তারপরে সে ভাবতে থাকে ঘোড়ার সাহায্য ছাড়াই এ-কাজটি করা যায় কিনা। পশুকে দিয়ে কেন এত বেশি কাজ করানো? নদীর জলের প্রবাহই জলকে ওপরে তুলুক এবং ক্ষেতের মধ্যে ঢেলে দিক। অতএব হাতের ওপরে এসে যায় নতুন কাজের ভার—একটি চাকা তৈরি করা এবং নদীর মধ্যে সেটি বসানো। এই চাকার সাহায্যে হাতায় করে জল তোলার মতো নদীর জল উঠে আসে। নদীতে আছে প্রবাহ, তার গতিপথের দিকে। চাকায় লাগানো আছে ব্লেড আর চাকার কিনারা বরাবর হাতার মতো পাত্র। প্রবহমান জল ধাক্কা দেয় চাকার ব্লেডে আর তার ফলে চাকা ঘুরতে থাকে। মানুষ ঠিক এই জিনিসটিই চেয়েছিল। চাকা ঘুরতে থাকায় তার হাতার মতো পাত্রগুলি জল তুলে নিয়ে ওপরে উঠে যায় আর সেখানে একটা লম্বা পাত্রের মধ্যে জল ঢালে। এমনিভাবে মানুষের মাথা ও মানুষের হাত নদীর প্রবাহকে চালিত করে—লক্ষ লক্ষ বছর ধরে যা চলে আসছিল সেই নিচের দিকে নয়—ওপরের দিকে। ক্ষেতে জলসেচ করতে থাকে নদী নিজেই, আর সেই ক্ষেতে ফসল ফলে।

শরৎকাল ফসল কাটার সময়। ঝাড়াই হয়ে যাবার পরে শস্যকে পেষাই করতে হয়। বহু আগে পেষাই করা হতো ছোট যাঁতায় হাত দিয়ে ঘুরিয়ে। তবে এমনি একটি যাঁতায় একটি পরিবারকে খাওয়ানো যেত। কিন্তু যখন দরকার পড়ে পুরো একটি বাহিনীকে খাওয়াবার, যখন আলেকজান্দ্রিয়ার মতো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নগর গজিয়ে উঠতে থাকে—তখন দরকার হয় বিপুল পরিমাণ ময়দার। তখন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যাঁতা সমেত বড়ো বড়ো মিল তৈরি করতে হয়। সেই যাঁতার পাথরগুলি এতই ভারী যে হাত দিয়ে ঘোরানো সম্ভব নয়। তখন আবার মাথার ডাক পড়ে। লিভারের ব্যবহারে মানুষ তখন বেশ রপ্ত, সেই লিভারকেই কাজে লাগায়। পেষাই পাথরকে ঘোরাবার জন্য লিভার লাগিয়ে নেয়। সেই লিভারে হাত লাগায় এক বা দু-জোড়া নয় —চার, ছয়, আট জোড়া। তারা লিভারকে লম্বা একটি হাতলের মতো ব্যবহার করতে থাকে। হাতলটাকে বুকের ওপরে চেপে ধরে গোল একটি চক্রে ঘুরে চলে দাসরা এবং ভারী পাথরকে চালায়। কিন্তু তারপরে যতোই আরো বেশি ভারী পাথর ব্যবহৃত হতে থাকে ততোই তাদের চালানো হাতের পক্ষে আরো

বেশি শক্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তখন মানুষ আবার ভাবতে থাকে হাতের সাহায্য না নিয়ে কাজটা করা যায় কিনা। মাথা আবার সেই ঘোড়ার কথাই ভাবে, ঘোড়াকে জুতে দেয় লিভারের সঙ্গে। ঘোড়াগুলিও হুকুমমতো চক্রে ঘুরে চলে এবং ময়দা পেষাই হতে থাকে। মাঝে মাঝে ঘোড়াগুলিকে উস্‌কে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করার থাকে না।

আরো বড়ো পাথর ব্যবহৃত হয়। এতই বড়ো যে এমনকি তিনটি ঘোড়াও তাদের নড়াতে পারে না। কিন্তু ততোদিনে ঘোড়ার চেয়েও আরো শক্তিশালী এক শ্রমিককে পেয়ে গিয়েছে মানুষ—কেননা মানুষ তার আগেই নদীকে পোষ মানিয়েছে। জল-চাকা থেকে সে হাতার মতো পাত্রগুলি খুলে নেয়, থাকে শুধু ব্লেডগুলি। নদী প্রবাহিত হয়, চাকায় ঠেলা দেয়, চাকা ঘোরে, ঘুরন্ত চাকা দণ্ড ঘোরায়, ঘুরন্ত দণ্ড সেই গীয়ার চালু করে, চালু-হওয়া গীয়ার চালিত করে দ্বিতীয় একটি দণ্ড, আর দণ্ডে বসানো থাকে পাথরটি। জল-চালিত যাঁতাকল প্রথম যখন আবিষ্কৃত হয়, মানুষের সে এক বিরাট ছুটির দিন। কঠোর শ্রমের কাজ কলে সম্পন্ন হচ্ছে, তাদের হাত লাগাতে হচ্ছে না, এতে মানুষ ভারি খুশি। তখন কি তারা ভাবতে পেরেছিল এই যাঁতাকলটি ভবিষ্যতের শত-শত যন্ত্রের পূর্বগামী মাত্র, আর সে-সব যন্ত্রে শুধু শস্য পেষাই হবে তা নয়—লোহা ঢালাই হবে, শিলা চূর্ণ হবে, কাপড় বোনা হবে। এইসব যন্ত্র মানুষের হয়ে কাজ করে দেবে—মানুষকে খাওয়াবে, পরাবে, বহন করে নিয়ে যাবে, আকাশে তুলবে।

৬। জ্ঞানী ব্যক্তিদের পথ

বিজ্ঞানের উদ্দেশে নিবেদিত আলেকজান্দ্রিয়ার কলামন্দিরে পরীক্ষাকার্য-ভিত্তিক বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছিল। এটা কখনো সম্ভব হতো না যদি-না হাজার হাজার কাঁচ ও তামার কর্মী এবং কামার ও কুমোর থাকত।

পরীক্ষাকার্য-ভিত্তিক বিজ্ঞানের প্রথম আবির্ভাব ঘটল আলেকজান্দ্রিয়ায় —সেটা কেন? এথেন্সে নয় কেন? আর কেন এই ব্যাপারটি ঘটল খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় অব্দে? অন্য কোনো সময়ে কেন নয়?

এটা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়।

মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় অব্দে, তার কারণ লাইসিয়াম খোলা হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ অব্দে। আর আরিস্টটলের লাইসিয়ামের অস্তিত্বই থাকত না যদি-না তার আগে থাকত প্লেটোর আকাডেমি।

আর মিউজিয়াম যে এথেন্সে না হয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেটাও কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়। এথেন্সে সমস্ত কাজ করানো হতো দাসদের দিয়ে, স্বাধীন মানুষদের দিয়ে নয়। কাজকে অবজ্ঞা করা হতো দাসসুলভ একটা ব্যাপার হিসেবে। আলেকজান্দ্রিয়ায় তা নয়। সেখানে স্বাধীন মানুষদের ছিল নিজস্ব কারখানা আর সেই কারখানায় কাজ করত তাদের ছেলেরা ও ভাড়া-করা শ্রমিকরা। আলেকজান্দ্রিয়ার গর্ব ছিল এই যে সেখানে কেউ কর্মহীন নয়। এমনকি কানা-খোঁড়া-অন্ধরাও, তাদের

প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও, সাধ্যমতো কিছু না কিছু কাজ করত। তাই বিজ্ঞানীরাও যে হাত গুটিয়ে বসে থাকেননি তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

মিউজিয়ামকে বলা হতো মন্দির, কিন্তু সেটা ছিল অনেকটা কারখানার মতো। তাছাড়া কারখানা শুধু একটিমাত্র নয়, অনেকগুলির একটা জোট—নগরের এক সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক মহল। তার এক অংশে কাজ করতেন পদার্থ-বিজ্ঞানীরা অন্য এক অংশে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা, অপর এক অংশে বল-বিজ্ঞানীরা। অল্পদিনের মধ্যেই এই মহলে জনাধিক্য ঘটে গেল, কেননা মূল একটি কাজকে ক্রমেই আরো বেশি দলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছিল।

জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সভাপতিত্ব করতেন বিভিন্ন বিভাগের প্রধানরা। গণিত বিভাগের সদস্য ছিলেন ইউক্লিড, বলবিদ্যা বিভাগের—আর্কিমিডিস।

এমনকি রাজা ও রাজপুত্ররাও সেখানে শিক্ষালাভ করতে আসতেন। রাজপুত্র ক্লডিয়াস টলেমাউস একবার ইউক্লিডকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, গণিত শেখার সংক্ষিপ্ত পথ কিছু আছে কিনা। ইউক্লিড জবাব দিয়েছিলেন, 'গণিত শেখার কোনো রাজকীয় পথ নেই।'

লাইসিয়ামের বীথিপথে আরিস্টটল তাঁর ছাত্রদের নিয়ে গিয়েছিলেন জ্ঞানী ব্যক্তিদের পথ বরাবর বহুদূর পর্যন্ত।

আরো দূর পর্যন্ত গিয়েছিল আলেকজান্দ্রিয়ার ছাত্ররা। পথ তাদের নিয়ে গিয়েছিল পর্বতের চুড়োয়। তারা পৃথিবী পরিক্রমা করেছিল, সেতু খাড়া করেছিল চন্দ্র ও সূর্যের দিকে, নক্ষত্রলোকের দিকে বহুদূর পর্যন্ত যাত্রা করেছিল।

একসময়ে মানুষ ভাবত, পর্বতগুলি আকাশ পর্যন্ত চলে গিয়েছে। তারা বলত, অলিম্পাসের মেঘেঢাকা চুড়োয় দেবতারা বাস করে। বলত, প্রমিথিউসকে বেঁধে রাখা হয়েছে ককেসাসের একটা শিখরে। সেই শিখর এত উঁচু যে পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় সূর্য ডুবে যাবার পরেও সেখানে আরো চারঘন্টা সূর্যের আলো থেকে যায়।

পর্বতের উচ্চতা কে মাপতে পারে? এমন কোনো দৈত্য আছে কি যে তার হাত পর্বতের চুড়ো পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে সক্ষম? এমনি একটি দৈত্যকে পাওয়া গেল।

আলেকজান্দ্রিয়ার বিজ্ঞানী ছিলেন ইরাটোস্থেনিস, তিনি কোণের মাপ নিয়েছিলেন, ত্রিভুজের পরিমাপ করেছিলেন, বাণ্ডিল বাণ্ডিল প্যাপিরাস আঁক কষে ভরিয়ে ফেলেছিলেন। পর্বতের চুড়োয় তিনি ওঠেননি, একেবারে সমতল জমিতেই ছিলেন, তবুও পর্বতের উচ্চতার মাপ নিয়েছিলেন। তিনি তখনই জানতেন কেমনভাবে এই মাপ নিতে হয়। শুরু করেছিলেন আরিস্টটলের শিষ্য ডিকিয়ারকাস। হিসেবটা চালিয়ে গিয়েছিলেন ইরাটো-স্থেনিস। তিনি আবিষ্কার করলেন যে পর্বতগুলি আর যাই হোক তেমন উঁচু নয়। বলা চলে, পৃথিবীর উপরিতলে খানিকটা অমসৃণতা—গাছের ওপরে যেমন হয়ে থাকে গাছের ছাল।

আর পৃথিবীর উপরিতল সম্পর্কেই বা কতটুকু জানা গেল। এমন কে আছে যে পুরো রাস্তাটা একটা চক্কর দিয়ে আসতে পারে? সবচেয়ে সাহসী যে নাবিক এমনকি সেও ভূ-গোলক একপাক ঘুরে আসার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। কিন্তু ইরাটোস্থেনিস জানতেন, পৃথিবী একপাক ঘুরতে

কতখানি দূরত্ব পার হতে হবে তা জানতে হলে এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবার কোনো প্রয়োজন নেই। যাওয়া দরকার শুধু আলেকজান্দ্রিয়া থেকে সিয়েন পর্যন্ত। সিয়েনে সূর্য যখন ঠিক মাথার ওপরে—অর্থাৎ খ-মধ্যবিন্দুতে—আলেকজান্দ্রিয়াতে সূর্য তখন খ-মধ্যবিন্দু থেকে একটি বৃত্তের এক-পঞ্চমাংশ দূরে। অতএব আলেকজান্দ্রিয়া থেকে সিয়েনের দূরত্ব পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘোরার মোট দূরত্বের এক-পঞ্চমাংশ। সিয়েন থেকে আলেকজান্দ্রিয়ার দূরত্ব হচ্ছে পাঁচহাজার স্টাডিয়া বা প্রায় ৪৮৫ মাইল। তার মানে, পৃথিবীর সম্পূর্ণ পরিধি হচ্ছে ২,৫০,০০০ স্টাডিয়া বা প্রায় ২৪,০০০ মাইল।

এমনিভাবে মানুষ শিখল যা সে দেখতে পাচ্ছে না তাকে মাপতে। পৃথিবীর মাপ নেবার জন্য তাকে তাকাতে হচ্ছে সূর্যের দিকে। আড়াই লক্ষ স্টাডিয়া! ভূগোলবিদ্‌রা বললেন, এই পরিধির মাত্র এক-চতুর্থাংশে মানুষের বসবাস রয়েছে—হারকিউলিসের স্তম্ভ থেকে ইতালি পর্যন্ত, ইতালি থেকে গ্রীস পর্যন্ত, গ্রীস থেকে গঙ্গানদীর তীর পর্যন্ত।

পৃথিবীর যে-অংশে মানুষের বসবাস, তার বাইরে কী আছে?

কেউ কেউ ভাবত, ভারতবর্ষ পর্যন্ত সারাটা পথ শুধু সমুদ্র। অন্যরা জোর দিয়ে বলত, বাইরে মহাসাগরে যেখানে মানুষ কোনোদিন যায়নি সেখানে আছে এক সুখী দ্বীপ, যেখানকার মানুষরা এখনো বাস করে স্বর্ণযুগে।

পৃথিবীর বিশাল বিস্তৃতি থেকে, সমুদ্র ও পর্বত থেকে, পথ সোজা চলে গিয়েছে আকাশের দিকে, চন্দ্র ও সূর্যের দিকে।

কে পাড়ি দেবে এই পথ আর বলবে কত দূরে রয়েছে চন্দ্র, কত বিশাল এই সূর্য?

বিজ্ঞানীরা আবার সফরে বেরিয়ে পড়লেন। যাত্রা শুরু করলেন তাঁদের মানমন্দির থেকে। তাঁদের হাতে আকাশের মাপ নেবার জন্য হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি। জ্যোতির্বিজ্ঞানী বসে আছেন মানমন্দিরে আর আস্তে আস্তে একটা চাকা ঘোরাচ্ছেন, তাঁর চোখ রয়েছে চাকার ওপরে ফুটিয়ে তোলা ভাগ-বিভাগের দাগের ওপরে। এই বিজ্ঞানী হচ্ছেন সামোস-এর আরিস্টার্কাস। তাঁর জীবনকাল আরিস্টটলের একশো বছর পরে। আরিস্টটল শিখিয়ে-ছিলেন থিওফ্রাস্‌টাসকে, থিওফ্রাস্‌টাস স্ট্রাটনকে, স্ট্রাটন আরিস্টার্কাসকে।

প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান কখনো বাপ থেকে ছেলের অধিকারে আসেনি. যেমন এসে থাকে কুলক্রমাগত সম্পত্তি। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির জন্ম হয়েছে সবসময়েই সংগ্রামের মধ্যে। শিষ্যরা অনেক সময়েই গিয়েছেন তাঁদের গুরুর বিরুদ্ধে। আরিস্টটল তর্ক করেছিলেন প্লেটোর সঙ্গে। ডিমোক্রিটাস সম্পর্কে আরিস্টটলের সঙ্গে স্ট্রাটনের মতভেদ ছিল। আর স্ট্রাটনের শিষ্য আরিস্টার্কাস ছিলেন ডিমোক্রিটাসের আরো বেশি উৎসাহী সমর্থক। ডিমোক্রিটাসের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন, পৃথিবী একমাত্র জগৎ নয়, সমগ্র বিশ্বের তুলনায় পৃথিবী একটি বিন্দু মাত্র, জগতের সংখ্যা অগণিত।

রাতের পর রাত, দিনের পর দিন, আরিস্টার্কাস আকাশের গম্বুজে চোখ দিয়ে ঘুরে বেড়ালেন। কখনো হাতে তুলে নিচ্ছেন তাঁর আঁকজোক ও নক্‌শা, কখনো আবার চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন আকাশের তারার দিকে। চন্দ্র

পর্যন্ত দূরত্ব মাপলেন, চন্দ্র থেকে সূর্য পর্যন্ত, আর জানলেন পৃথিবী থেকে চন্দ্র যতোটা দূরে তার চেয়ে সূর্য আরো কত বেশি দূরে। কিন্তু তাঁর হিসেব সঠিক হয়নি। পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্ব সম্পর্কে তিনি প্রায় সঠিক ছিলেন, কিন্তু সূর্যকে তিনি ভেবেছিলেন প্রকৃতপক্ষে যতোটা তার চেয়ে অনেক কাছের হিসেবে, এবং অনেক ছোট হিসেবে।

তিনি কাজ করেছিলেন অনুন্নত যন্ত্রপাতি নিয়ে, তাঁর পক্ষে সঠিক হওয়া শক্ত ছিল। তবে তিনিই প্রথম আকাশের মাপ নেবার চেষ্টা করেছিলেন।

আরিস্টার্কাস আকাশে ঘুরে বেড়াতেন নিজের ঘরে ঘুরে বেড়াবার মতো, হঠাৎ এসে পড়া অতিথির মতো নয়। আকাশের মাপ তিনি নিয়েছিলেন এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এবং কি-ভাবে সেটি বিন্যস্ত তার একটি ছক তৈরি করেছিলেন। ক্রমেই তাঁর এই প্রত্যয় হচ্ছিল যে পৃথিবী নয়, সূর্যই বিশ্বের কেন্দ্র। সূর্যকে ঘিরে গ্রহগুলি ঘোরে শরৎকালের পাতার মতো। আর পৃথিবী হচ্ছে এমনি একটি গ্রহ মাত্র।

এই সিদ্ধান্ত সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হিসাবকে সরল করে তুলল। আরিস্টার্কাস জানতেন একথা বিশ্বাস করতে লোকের বহু সময় লেগে যাবে। তারা এই চিন্তাতেই অভ্যস্ত যে আমাদের এই পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্র। কী করে আশা করা চলে যে লোকে এই বিশ্বাস সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেবে?

এমনকি জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাও আরিস্টার্কাসের কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করলেন না। তাই যদি হতো, তাঁরা বললেন, তাহলে তারাগুলিকে দেখে মনে হতো তারা যেন দৃষ্টির সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, যেমন অদৃশ্য হয় জাহাজ-বাইরের-সমুদ্রে-বেরিয়ে-যাবার-সময়ে গাছপালা ও পাহাড়ের চুড়ো। আরিস্টার্কাস জবাব দিলেন, তারাগুলি পৃথিবী থেকে এতই দূরে যে খানিকটা অস্পষ্ট হলেও পৃথিবী থেকে তাকিয়ে তা টের পাওয়া যায় না, যেমন টের পাওয়া যায় না গাছের অস্পষ্টতা যখন আমরা সেই গাছ থেকে কয়েক ফুট দূরে সরে আসি।

আরিস্টার্কাস ছিলেন প্রাচীন জগতের গোড়ার দিকের কোপারনিকাস, তিনি তাঁর সময় থেকে এগিয়ে ছিলেন। আনাক্সাগোরাসের মতো, সক্রেটিসের মতো, আরিস্টটলের মতো, তিনিও অভিযুক্ত হয়েছিলেন যে তিনি নিরীশ্বরবাদী। বহু কাল ধরে, বহু শতাব্দী ধরে মানুষ আরিস্টার্কাসের শিক্ষার প্রতি কোনো মনোযোগ দেয়নি।

কিন্তু কয়েক শত বছর পরে, খ্রীষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতকে, ক্লডিয়াস টলেমাউস একটি বিশাল গ্রন্থ রচনা করেছিলেন—পৃথিবী ও আকাশ সম্পর্কে ত্রিশখণ্ডে সম্পূর্ণ একটি গ্রন্থ। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি রাইন থেকে ভারতবর্ষ ও চীন পর্যন্ত একটি মানচিত্র দিয়েছিলেন। নক্ষত্রসমূহের একটি তালিকা করেছিলেন ও প্রত্যেকটি নক্ষত্রের পৃথক ঠিকানা দিয়েছিলেন। বিশ্বের একটি নতুন নক্শা করেছিলেন এবং দীর্ঘকাল চিন্তা করেছিলেন এই নতুন নক্শায় পৃথিবীকে ঠিক কোথায় স্থাপন করবেন।

কয়েক শত বছর আগেই আরিস্টার্কাসের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু টলেমাউস তাঁর সঙ্গে বিতর্ক চালিয়ে গেলেন। তাঁর তত্ত্বের বিরুদ্ধে আরও নতুন নতুন যুক্তি খুঁজে পেতে লাগলেন। টলেমাউস বললেন: পৃথিবী চলে বেড়াচ্ছে, তাই যদি হয় তাহলে তার ফলে মেঘের চলনও অন্যরকম হয়ে যায়—

মেঘগুলি একই ধারে জড়ো হয়ে ওঠে। একটা পাথর আকাশে ছুঁড়লে সেই পাথর আর একই জায়গায় ফিরে আসে না, খানিকটা পিছিয়ে এসে পড়ে। কেননা, পাথরটা যতোক্ষণ আকাশে ছিল সেই সময়ে নিচের পৃথিবী খানিকটা সরে গিয়েছে। টলেমাউস জানতেন না পৃথিবীর ওপরে সবকিছু পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে চলে এবং পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না বা পৃথিবীকে ছেড়ে যেতে পারে না। টলেমাউস এমনি আরো অনেক সিদ্ধান্ত করলেন এবং শেষপর্যন্ত স্থির করলেন যে পৃথিবী অবশ্যই একজায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। টলেমাউসের জবাব আরিস্টার্কাস দিতে পারলেন না—মৃতরা কখনো কারও সঙ্গে তর্ক করে না—কিন্তু নক্ষত্রসমূহ নিজেরাই তাঁর হয়ে জবাব দিল।

সেই একই মানমন্দিরের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ধৈর্যের সঙ্গে গ্রহদের গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন। তাঁরা দেখলেন, এই গ্রহগুলি কখনো সামনের দিকে এগিয়ে আসছে, কখনো পিছনের দিকে সরে যাচ্ছে। এই যে ব্যাপারটা সহজেই ব্যাখ্যা করা যায় যদি আরিস্টার্কাসকে মেনে নেওয়া হয়, আর ব্যাখ্যা করাটা খুবই দুরূহ হয়ে পড়ে যদি টলেমাউসের বক্তব্য বিশ্বাস করতে হয়। কিন্তু টলেমাউস নির্বিচারে নিজের তত্ত্বকে আঁকড়ে রইলেন। একেবারে নক্ষত্রদের সঙ্গেই তর্ক জুড়ে দিলেন। তাঁর তত্ত্বকে খাড়া করার জন্য তাঁকে আকাশের মানচিত্র নিয়ে ভেলকি দেখাতে হয়েছিল এবং এমন একটি মানচিত্র বসাতে হয়েছিল যা সম্পূর্ণ তাঁর কল্পনা থেকে তৈরি। চন্দ্রকে তিনি পৃথিবীর চারিদিকে না ঘুরিয়ে ঘুরিয়েছিলেন কাল্পনিক একটি বিন্দুর চারদিকে। অন্যান্য গ্রহের জন্যও তাঁকে অতি অদ্ভুত সব চলন তৈরি করতে হয়েছিল।

এ-ধরনের ঘটনা ইতিহাসে বহুবার ঘটেছে। কেননা, যে-জিনিসের সঙ্গে আমরা অভ্যস্ত তাকে বিশ্বাস করাটাই বেশি সহজ। সেটাই আমাদের কাছে অতীব সরল। এই সরলতার জন্যই আমরা অতি বিস্তারিত ও কাল্পনিক ব্যাখ্যা খাড়া করতে প্রস্তুত থাকি। এমন সব ব্যাখ্যা যা অবলম্বন করে আমরা আঁকড়ে থাকতে পারি আমাদের পরিচিত ও পুরনো দৃষ্টিভঙ্গি এবং আমাদের প্রাচীন রীতিনীতি ও বিশ্বাস।

যাই হোক, খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় অব্দে আরিস্টার্কাসের কথায় ফিরে যাওয়া যাক।

তিনি ভাবতেন, নক্ষত্রগুলি কি পৃথিবী থেকে অনেক দূরে? সমগ্র বিশ্বের মাপ কে নেবে?

আর্কিমিডিস এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আলেকজান্দ্রিয়ার কলামন্দিরে যাঁরা শিক্ষালাভ করেছেন তিনি তাঁদের একজন। বাস করতেন সিসিলির সিরাকুস-এ। বিশ্বের আকার সম্পর্কে তাঁর মহান রচনাকে উৎসর্গ করেছিলেন দেশের রাজার নামে। বিশ্বের একটি মাপ নির্ণয় করতে চেয়েছিলেন তিনি। লিখেছিলেন :

'হে রাজা, এমন মানুষও আছে যারা মনে করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণার সংখ্যা গণনা করা অসাধ্য। কিন্তু আমি চাই বালুকণার সংখ্যা গণনা করতে

শুধু সিরাকুসের নয়, শুধু সিসিলির নয়, জনবসতিপূর্ণ ও জনবসতিহীন সমগ্র জগতের।'

তারপরে তিনি হিসেব করতে লাগলেন বালুকণার সংখ্যা কত হলে তা দিয়ে সারা পৃথিবী ঢেকে দেওয়া চলে। শুধু তাই নয়, সারা বিশ্ব ভরিয়ে তুলতে হলে কত বালুকণা চাই। তিনি তখনো ভাবতেন তারাখচিত গম্বুজটি যে গোলক তৈরি করেছে সেটাই বিশ্বের সীমানা। তা থেকে তিনি হিসেব করলেন, সারা বিশ্ব ভরিয়ে তুলতে হলে বালুকণা চাই একের পিঠে তেষট্টিটি শূন্য সংখ্যক। সংখ্যাটি বিরাট, কিন্তু অনন্তের সঙ্গে তুলনায় তা কতটুকু!

এমন সময় আসবে যখন মানুষ আকাশের মধ্যে এতদূর পর্যন্ত ভেদ করবে যে এমনকি আলো পর্যন্ত সেখান থেকে পৃথিবীতে পৌঁছতে সময় নেবে লক্ষ লক্ষ বছর, যে আলোর বেগ অন্য সবকিছুর চেয়ে বেশি। কিন্তু তখনো তাদের সামনে থেকে যাবে অনন্ত।

কিন্তু আর্কিমিডিস তখনো পর্যন্ত এমন এক বিশ্বের কল্পনা করতে পারেননি যা অনন্ত। পৃথিবীর মাপজোক তিনি আকাশেও ব্যবহার করে চল্‌লেন, তা সত্ত্বেও উপলব্ধি করেছিলেন পৃথিবী ও তারার মধ্যে থেকে গিয়েছে বিশাল এক দূরত্ব।

বাঁ-দিকে বালুকণা, ডানদিকে একটি পর্বত। কী এক ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ জগতে মানুষ বাস করত সে-সময়ে। তবুও তখনই জানা হয়ে গিয়েছিল যে আকাশের সীমানা এক-কোটি স্টাডিয়া দূরে। আর জানা গিয়েছিল যে সারা জগৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণায় তৈরি।

ডিমোক্রিটাসের শিক্ষা ছিল এই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অদৃশ্য কণিকায় সবকিছু তৈরি। আর্কিমিডিস এই শিক্ষার কথা জানতেন। ওই ক্ষুদ্র কণিকাগুলি যে নিয়মের দ্বারা চালিত তা আবিষ্কার করার জন্য তিনি ছোট জিনিসের জগতের দুয়ারে উপস্থিত হলেন। সেই দুয়ার খোলা বড়ো সহজ ছিল না। এমনকি সবচেয়ে ভারী হাতুড়ির ঘায়েও একটি শিলা এই সমস্ত কণিকায় পরিণত হয় না। বরং জল নিয়ে কাজ করাটা আরো সহজ। অতএব আর্কিমিডিস জলের জগতটি পর্যবেক্ষণ করলেন। এবং অল্পদিনের মধ্যেই আবিষ্কার করলেন যে এই জগতেরও আছে নিজস্ব নিয়ম। এজন্য তাঁকে যে লম্বা লম্বা পাড়ি দিতে হয়েছে তাও নয়। এইটুকু মাত্র করেছেন যে একপাত্র জলের মধ্যে নিজের হাতটি ডুবিয়েছেন। আর তখনই নিজেকে আবিষ্কার করেছেন আশ্চর্য এক জগতে যেখানে জিনিসের কোনো ওজন নেই।

এই অস্বাভাবিক জগতে সবকিছুই আরো হালকা। কোনো কোনো জিনিস জলের নিচে ডুবে না গিয়ে ভেসে ওঠে জলের ওপরে। অন্যগুলি ঝুলে থাকে জলের মাঝখানটিতে—তলদেশ ও উপরিতলের মধ্যে। তলদেশে গিয়ে পড়ে একমাত্র সবচেয়ে ভারী জিনিসগুলি। ব্যাপারটা কেন ঘটছে তা বুঝে ওঠা খুবই শক্ত হতো যদি-না আর্কিমিডিস জানতেন যে সবকিছু তৈরি হয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অদৃশ্য কণিকায়।

জল যে পাত্রের মধ্যে থাকে সেই পাত্রের আকার ধারণ করে—তার কারণটা

আর্কিমিডিস নিজের কাছে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করলেন। এই যুক্তি দেখালেন যে জল তৈরি হয়েছে ওইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকায়, যেমন মানুষের ভিড় তৈরি হয় পৃথক পৃথক মানুষ দিয়ে। ভিড় যে উদ্যানের মধ্যে থাকে সেই উদ্যানে খাপ খেয়ে যায়—সেই একই নিয়মে চালিত হয়ে জল যে পাত্রের মধ্যে থাকে সেই পাত্রের আকার ধারণ করে।

কাঠের একটা চিল্‌তে জলের মধ্যে ছুঁড়ে আর্কিমিডিস নিজেকে প্রশ্ন করলেন, কাঠের এই চিল্‌তে কেন জলের ওপরে ভাসছে, একটা পাথর কেন ডুবে যায়। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, যেহেতু জল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকায় তৈরি অতএব ওপরের দিকের কণিকাগুলি নিচের দিকের কণিকাগুলির ওপরে চাপ দেয়। কাঠের চিল্‌তেটা ঠিক তার নিচের কণিকাগুলির ওপরে কম চাপ দেয়, যতোটা চাপ দেয় জল নিজে তার চেয়ে—কেননা কাঠ জলের চেয়ে হাল্‌কা। বেশি চাপে থাকা কণিকাগুলি কম চাপে থাকা কণিকাগুলিকে ঠেলা মারে। অতএব কাঠের গায়ে লেগে থাকা কণিকাগুলির ঠেলায় কাঠ জলের ওপরে ভেসে ওঠে।

আর কঠিন বস্তু যখন তার ওজনের সম-পরিমাণ জল স্থানান্তরিত করে তখন সমতা পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হয়।

এমনিভাবে, বিভ্রান্ত অবস্থায় যখন তিনি সন্ধান করছিলেন কেন কোনো কোনো জিনিস ভাসে তখনই আর্কিমিডিস সেই সূত্রটি আবিষ্কার করলেন যা তাঁর নামে খ্যাত। হাজার হাজার বছর পরে, আজ, স্কুলের প্রত্যেকটি ছাত্র এই সূত্র জানে।

গণিতে ও বলবিদ্যায় দুরূহতম সব সমস্যার সমাধান করেছিলেন আর্কিমিডিস। তারপরে জানতে পারলেন, বহু বছর আগে এই সমস্ত সমস্যার অনেকগুলি সমাধান করেছিলেন ডিমোক্রিটাস। আর্কিমিডিস যখন আলেকজান্দ্রিয়ায় বাস করছিলেন তখন তিনি ডিমোক্রিটাসের নাম বড়ো একটা শোনেননি। কেননা প্রাচীন সেই দার্শনিকের পরিচিতি ছিল নিরীশ্বরবাদী হিসেবে এবং ধরে নেওয়া হতো যে বিজ্ঞানীরা তাঁদের আলোচনায় তাঁর রচনার কোনো উল্লেখ করবেন না। আর্কিমিডিস যখন সিরাকুসে ফিরে এলেন একমাত্র তখনই তিনি ডিমোক্রিটাসের গ্রন্থ পড়তে শুরু করলেন। সেই গ্রন্থে সন্ধান পেলেন সেই চাবিকাঠির যার প্রয়োজন তাঁর ছিল। এই চাবিকাঠিটি হচ্ছে অবিভাজ্য পরমাণু সম্পর্কিত ডিমোক্রিটাসের ব্যবস্থা।

আর্কিমিডিস তাঁর বন্ধু ইরাটোস্থেনিসের কাছে একটি চিঠি লিখেছিলেন। ইরাটোস্থেনিস রাজার পৃষ্ঠপোষকতাকে মূল্য দিতেন এবং ঈশ্বর-অবিশ্বাসী ডিমোক্রিটাসের শত্রু ছিলেন। তিনি শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও দার্শনিক নন, রাজার পারিষদও। এসব কথা আর্কিমিডিস ভালোভাবেই জানতেন। কিন্তু তিনি মনে করতেন, ডিমোক্রিটাসের পদ্ধতি ব্যবহার করে তিনি যে অগ্রগতি লাভ করতে পেরেছেন তা ইরাটোস্থেনিসকে জানানো তাঁর কর্তব্য।

তিনি লিখেছিলেন, 'আমি মনে করি আপনি একজন যথার্থ বিজ্ঞানী ও শীর্ষস্থানীয় দার্শনিক। অতএব আপনার কাছে আমি ব্যাখ্যা করে বলতে চাই উপপাদ্যের সমাধানে একটি বিশেষ পদ্ধতি কতখানি কাজের হয়েছে।

পদ্ধতিটির প্রথম উল্লেখ করেছেন, ডিমোক্রিটাস। আমি স্থির করেছি পদ্ধতিটি আমি লিখে ফেলব কেননা আমার ধারণা হয়েছে এ-কাজটি করলে গণিত-বিজ্ঞানে একটি বড়ো রকমের কাজ করা হবে। আমার মনে হচ্ছে, আমার সমকালীনদের মধ্যে অনেকে এবং আমার পরবর্তীরা এই পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হলে নতুন নতুন উপপাদ্য খাড়া করতে পারবেন, যা আমার মাথায় আসেনি।'

আর্কিমিডিস জানতেন মিউজিয়ামের অন্য পণ্ডিতরা তাঁর এই চিঠি পড়বেন। বিজ্ঞানের স্বার্থে তাঁদের বিরুদ্ধে এবং প্রত্যেকের বিরুদ্ধে বেরিয়ে আসতে তিনি ভীত ছিলেন না। এইভাবেই তিনি সবসময়ে কাজ করতেন। তাঁর কোনো কোনো কাজে হিসেবের ভিত্তি হিসেবে তিনি এমন কোনো তত্ত্বকে গ্রহণ করতেন যা আলেকজান্দ্রিয়ার সকল জ্ঞানী ব্যক্তি অগ্রাহ্য করেছেন।

সে-সময়ে তিনি যা বলেছিলেন তা এই : 'সামোসের আরিস্টার্কাস একটি রচনা লিখেছেন যাতে কতকগুলো অনুমান রয়েছে, এই সমস্ত অনুমান থেকে এই সিদ্ধান্ত টানা যায় যে আমরা যতোটা অনুমান করেছি তার চেয়েও এই জগৎ বহুগুণ বড়ো। আরিস্টার্কাস মনে করতেন, নক্ষত্র-সমূহ ও সূর্য অনড় এবং পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে।'

অতএব ডিমোক্রিটাসের পথই হয়ে উঠেছিল বিজ্ঞানের প্রধান রাজপথ। এই পথ ধরেই অগ্রসর হয়েছিলেন প্রাচীন জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ দুই মনীষী— আরিস্টার্কাস ও আর্কিমিডিস।

কিন্তু আর্কিমিডিস শুধু বিজ্ঞানী ছিলেন না। উপরন্তু ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর সময়ে ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরিকে একজন বিজ্ঞানীর পক্ষে সম্মানজনক কাজ বলে মনে করা হতো না। কারিগরি নিয়ে সময় নষ্ট করার জন্য প্লেটো তাঁর বন্ধু আর্কাইটাসকে তিরস্কার করেছিলেন। আর্কাইটাস এমন এক কাঠের পায়রা তৈরি করেছিলেন যা সত্যি সত্যি উড়তে পারত। প্লেটো মনে করতেন, এসব কাজ একজন দার্শনিকের পক্ষে বেমানান। কারিগরিটা নিতান্তই একটা হাতের কাজ মাত্র, হাতের কাজ যারা করে তারাই কারিগরি নিয়ে মেতে থাকুক। এক্ষেত্রে আর্কিমিডিস প্লেটোকে অমান্য করেছিলেন। কারিগরিকে যথার্থ বিজ্ঞান করে তোলার জন্য তিনি যথাসাধ্য করেছিলেন।

কারিগরির কান্ডকারখানা দেখে লোকে হতভম্ব হয়ে যেত এবং কিছুই বুঝতে পারত না। একটা হাতলের ওপরে সামান্য একটু চাপ দিয়ে বিশাল একটি ওজন তোলা যাচ্ছে এ-ব্যাপারটা তাদের কাছে অলৌকিক মনে হতো—যেন ম্যাজিক। তারা ভাবত প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে হাতলটা কাজ করছে।

আর্কিমিডিস হাতলের নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন এবং হাতে-কলমে দেখিয়েছিলেন, অলৌকিক শক্তি নয়, প্রকৃতির নিয়মই কাজ করছে।

আর্কাইটাসের মতো চলন্ত খেলনা তৈরি করেননি আর্কিমিডিস। তিনি নির্মাণ করেছিলেন প্রকৃত যন্ত্র। তামা দিয়ে একটি জ্যোতির্ষিক গোলক তৈরি করেছিলেন যেটি একটি লুকনো জলচালিত মোটরের সাহায্যে চালিত হতে পারত। গোলকটি যখন চলত দর্শকরা দেখতে পেত ভোরবেলা

সূর্য কি-ভাবে চন্দ্রের স্হান গ্রহণ করে, গ্রহণের সময়ে চন্দ্র কি-ভাবে পৃথিবীর ছায়ার আড়ালে চলে যায়, এবং গ্রহগুলি কিভাবে আকাশে ঘুরে বেড়ায়।

আলেকজান্দ্রিয়ায় থাকার সময়েই তিনি পেঁচকলের উন্নতিসাধন করেছিলেন। পেঁচকল হচ্ছে একটি মিশরীয় যন্ত্র যা দিয়ে ক্ষেতে সেচ দেওয়া চলে। পরবর্তীকালে আর্কিমিডিসের পেঁচকল খনিতে বসানো হয়েছিল। স্পেনের খনি-কর্মীরা প্রায়ই মাটির নিচে জলস্রোতের সামনে পড়ে যেত। ঢালু খাদের মধ্যে জলকে ঘুরিয়ে দিয়ে জলস্রোতের তীব্র প্রবাহকে তারা হ্রাস করত। আর্কিমিডিসের পেঁচকলের সাহায্যে তারা সমস্ত জল নিষ্কাশিত করতে পারতো।

আর্কিমিডিস একটি বই লিখেছিলেন যাতে দেখানো হয়েছিল বাড়ির খুঁটিগুলিকে যে-ওজন ধরে রাখতে হয় সেই ওজন হিসাব করার উপায়। গৃহনির্মাণে এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সাহায্য।

সেইসব দিন আর ছিল না যখন যে-কোনো ছুতোর মিস্ত্রী একটা জাহাজ বানাতে পারত।

আর্কিমিডিস যেখানে থাকতেন সেই সিরাকুসে বন্দর ছেয়ে থাকত জাহাজের বহরে। সেই জাহাজে থাকত ঢাকা ডেক, গ্যালারি, ব্যায়ামচর্চার কামরা, ডেকের উপরে উঁচু গম্বুজ—যেমন দেখা যায় নগরের প্রাচীরের ওপরে। এমনি একটি জাহাজ নির্মাণ করতে হলে পাকা ইঞ্জিনিয়ার হওয়া চাই। আর যখনই কোনো ইঞ্জিনিয়ারের ওপরে এমনি একটি জাহাজ নির্মাণ করার ভার পড়ত, সে আর্কিমিডিসের সঙ্গে পরামর্শ করত।

শোনা যায়, একবার একজন ইঞ্জিনিয়ার এত বিশাল একটি জাহাজ নির্মাণ করেছিলেন যে তাকে জলে ভাসানো যাচ্ছিল না। সিরাকুসের সমস্ত লোককে ডেকে এনে জাহাজ-টানার কাজে লাগিয়ে দেওয়া হলো, তবুও জাহাজ এতটুকুও নড়ল না। তখন সাহায্যের জন্য তারা গেল আর্কিমিডিসের কাছে। আর্কিমিডিসের কাছে এটা কোনো নতুন সমস্যা নয়, কেননা তিনি তার আগেই লিভারের নিয়ম আবিষ্কার করেছেন। জাহাজ নড়ানো আর বেশি কথা কি, তিনি নাকি বলেছিলেন, 'লিভার বসাবার একটি ব্যবস্হা যদি করে দিতে পারো তাহলে আমি এই জগতটাকেই নড়িয়ে দিতে পারি।'

তখন তিনি সেই জাহাজের চারদিকে তৈরি করলেন লিভার ও ব্লকের বিরাট ব্যবস্হা। তারপরে একশো জোড়া হাত রশিতে টান লাগাল আর সেই জাহাজ মসৃণভাবে পিছলে পিছলে গিয়ে পড়ল নদীতে। এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখে সিরাকুসের রাজা হিয়েরো বলে উঠলেন, 'আমি হুকুম জারি করছি, এখন থেকে আর্কিমিডিস যা বলবে তাই বিশ্বাস করতে হবে।'

একসময়ে লোকে গালভরা গল্প বলত হারকিউলিস সম্পর্কে এবং পৃথিবীকে যে নিজের কাঁধের ওপরে ধরে রেখেছে সেই অ্যাটলাস সম্পর্কে। এখন তারা বলতে লাগল টাইটানদের সম্পর্কে নয়, তার বদলে আর্কিমিডিস সম্পর্কে।

রাজা এক স্যাঁকরাকে ডেকে পাঠিয়ে নিজের জন্য একটি সোনার মুকুট তৈরি করতে দিলেন। কিন্তু তাঁর ভয় ছিল স্যাঁকরা হয়তো ঠকাবে এবং মুকুটের মধ্যে সোনার বদলে কিছুটা রুপো চালিয়ে দেবে। ব্যাপারটা যাতে

ধরতে পারা যায় সেজন্য তিনি একটা কিছু ব্যবস্থা করতে চাইলেন, অতএব ডেকে পাঠালেন আর্কিমিডিসকে। এই সমস্যা নিয়ে আর্কিমিডিস দিনরাত্রি ভাবতে লাগলেন। সবসময়েই ভাবছেন—টেবিলে খেতে বসেছেন, তখনো; রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়েছেন, তখনো; বাথটবে গা ডুবিয়ে স্নান করছেন, তখনো। শোনা যায়, যখন তিনি স্নান করছিলেন তখনই সমস্যার সমাধান তাঁর মাথায় এসে যায় আর উলঙ্গ অবস্থাতেই বাড়ির দিকে ছুটতে থাকেন আর চিৎকার করতে থাকেন, 'ইউরেকা! আমি পেয়ে গিয়েছি'!

তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, তিনি যখন জলের টবে আস্তে আস্তে গা ডুবোচ্ছিলেন, কিছুটা জল টবের কিনারার ওপর দিয়ে উপচে পড়েছিল। এ থেকে তাঁর মাথায় একটা চিন্তা এসে গেল। কানায় কানায় জলে ভর্তি একটা গামলার মধ্যে রাজার মুকুটের ঠিক সমান ওজনের একতাল সোনা তিনি ডোবালেন। কিছুটা জল গামলার কিনারের ওপর দিয়ে উপচে পড়ল। সোনার তাল জলের মধ্যে ঠিক তার সমান আয়তন বা আকারের জায়গা দখল করে নিয়েছে। মুকুটটি যদি খাঁটি সোনার হয় তাহলে এই মুকুটটির বেলাতেও একই ব্যাপার হওয়া উচিত। কিন্তু আর্কিমিডিস যখন মুকুটটি জলভর্তি গামলার মধ্যে ডোবালেন তখন আরো বেশি পরিমাণ জল উপচে পড়ল। তার মানে, সোনার তাল যতোখানি জল সরাচ্ছে তার চেয়ে বেশি সরাচ্ছে রাজার মুকুট। তার কারণ, রাজার মুকুটের আয়তন বা আকার আরও অধিক। রুপো সোনার চেয়ে হাল্‌কা, রাজার মুকুটে এই রুপো সোনার সঙ্গে মেশানো হয়েছে।

পরীক্ষাকার্যটি আর্কিমিডিস বারে বারে করে দেখলেন। প্রতি বারে একই ফল পাওয়া গেল। রুপো মেশানো মুকুটটি প্রতি বারেই বিশুদ্ধ সোনার তাল যতোটা জল সরায় তার চেয়ে বেশি জল সরাতে লাগল। সবাই অবাক হয়ে গেল, সবচেয়ে বেশি সেই স্যাঁকরা। সে ছিল অতি দক্ষ কারিগর, সে ভেবেছিল সে যে সোনার সঙ্গে রুপো মিশিয়েছে সেটা কেউ ধরতে পারবে না।

সাধারণ লোকেরা—বিজ্ঞানের বিষয়ে যারা কিছুই জানত না—তারা ভাবল এটা একধরনের রূপকথা। বহু বছর পরে বিজ্ঞানে অজ্ঞ একই ধরনের লোকেরা নিউটনের আপেল সম্পর্কে একই ধরনের কথা বলেছিল। নিউটনের আপেল গাছ থেকে মাটিতে পড়েছিল এবং এ-থেকে নিউটন মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের সূত্র লাভ করেছিলেন।

রোমানরা যখন সিরাকুস আক্রমণ করল, স্বদেশকে রক্ষা করার জন্য আর্কিমিডিস তাঁর বিজ্ঞান ব্যবহার করলেন। এ-বিষয়ে ঐতিহাসিক প্লুটার্ক যা লিখে গিয়েছেন তা এই :

মার্সেলাস তাঁর সমগ্র বাহিনী নিয়ে সিরাকুসের দিকে এগিয়ে এলেন। তাঁর হুকুমে আটটি বড়ো জাহাজ শেকল দিয়ে বেঁধে নেওয়া হলো আর সেগুলির ওপরে রাখা হলো বর্শা ও পাথর নিক্ষেপ করার জন্য একটি ইঞ্জিন। সেগুলিকে নিয়ে আসা হলো নগরের একেবারে পাঁচিল পর্যন্ত। মার্সেলাস ধরে নিয়েছিলেন যে তাঁর এই অভিযান সফল হবে, কেননা এই অভিযানের জন্য তিনি অনেক যত্নের সঙ্গে বেশ বড়ো আকারে প্রস্তুত হয়েছিলেন এবং এ-কাজে তাঁর নামডাকও ছিল খুব।

কিন্তু আর্কিমিডিস ও তাঁর যন্ত্রের কাছে এটা ছিল তুচ্ছ ব্যাপার মাত্র। রাজা হিয়েরো যথেষ্ট সময় থাকতেই বুঝতে পেরেছিলেন বলবিদ্যার দাম ও গুরুত্ব কতখানি। যথেষ্ট সময় থাকতেই আর্কিমিডিসকে তিনি নানা ধরনের যন্ত্র বানিয়ে রাখতে বলেছিলেন যা দিয়ে অবরোধের সময়ে আত্মরক্ষা ও আক্রমণ উভয় কাজই সম্পন্ন হতে পারে। এতদিনে সিরাকুসের লোকের কাছে সেই সব যন্ত্র ও তাদের আবিষ্কারকের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হলো।

রোমানরা যখন দু-দিক থেকে নগর অবরোধ করল সিরাকুসের অধিবাসীরা ভয় পেয়ে গেল। ভয় থেকে তারা হয়ে গেল নির্বাক, তারা বিশ্বাস করতে পারছিল না যে এমন দুর্ধর্ষ শক্তি প্রতিরোধ করা সম্ভব। আর ঠিক এমনি সময়ে আর্কিমিডিস তার যন্ত্র চালু করে দিলেন। বিভিন্ন ধরনের তীর ও অস্বাভাবিক আকারের পাথর প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে অস্বাভাবিক হিংস্রতায় শত্রুর পদাতিক বাহিনীর মধ্যে এসে পড়ল। এমনই শক্তি এই আঘাতের যে কোনো কিছুতেই প্রতিহত হয় না। সামনে যা কিছু পড়ল এই আঘাতে গুঁড়িয়ে গেল এবং শত্রুপক্ষের বাহিনী ছত্রখান হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে নগরের পাঁচিল থেকে জাহাজগুলির ওপরে বেরিয়ে এল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লাঠি। কতকগুলি জাহাজ ডুবল লাঠিগুলি থেকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ওজন সেই সমস্ত জাহাজের ওপরে পড়ার ফলে। অন্য জাহাজ-গুলিকে তারা লোহার হাত বা সারসের ঠোঁটের মতো ঠোঁট দিয়ে শূন্যে তুলে নিল, ডগার দিক থেকে খাড়া করে ঝুলিয়ে সমুদ্রের নিচে ডুবিয়ে দিল। মার্সেলাস যে যন্ত্রটি জাহাজগুলির ওপরে স্থাপন করেছিলেন, যে যন্ত্রটি তিনি নগরের পাঁচিলের কাছে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন, তার নাম 'সাম্বুকা'। যন্ত্রটিকে কাছাকাছি নিয়ে আসার কোনো সুযোগই পাওয়া গেল না। কেননা, পাঁচিলের পিছন থেকে দশ ট্যালেন্ট ওজনের একটা পাথর এসে পড়ল। তারপরে আরো একটা। তারপরে আরো একটা। প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে আর প্রচণ্ড জোরে সেগুলি যন্ত্রটির ওপরে এসে পড়ল আর বলটু ও জোড় সমেত যন্ত্রটি ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

মার্সেলাস তো একেবারে হতভম্ব। তক্ষুনি সিদ্ধান্ত করলেন যে অবিলম্বে পিছনে হটে যেতে হবে। সৈন্যদের হুকুম দিলেন যুদ্ধ থেকে ক্ষান্ত থাকতে। কিছুটা দূর পর্যন্ত তারা হটে যেতে পারল। কিন্তু তীরগুলি পিছনে পিছনে ছুটে এসে তাদের ঘায়েল করতে লাগল। পদাতিক বাহিনীর বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল। ধ্বংস হলো বহু জাহাজ। অথচ মার্সেলাসের সৈন্যরা শত্রুপক্ষের কোনোই ক্ষতি করতে পারল না। আর্কিমিডিসের অধিকাংশ যন্ত্র ছিল নগরের পাঁচিলের পিছনে। মনে হতে পারত রোমানরা যেন দেবতাদের সঙ্গে লড়াই করছে, তাদের দুর্ভাগ্যের আর শেষ নেই, শত্রুদের এমনকি চোখের দেখাটুকুও দেখতে পাচ্ছে না।

নিজের কারিগর ও যন্ত্রবিদদের কাছে তামাসা করে মার্সেলাস বললেন, এই অঙ্কবিদের সঙ্গে লড়াই এবারে বন্ধ করা উচিত। দেখে মনে হচ্ছে কেউ যেন আমাদের জাহাজগুলি নিয়ে লোফালুফির খেলায় মেতেছে, আর আমাদের দিকে এতবেশি তীর ছুঁড়ছে যে পুরাণের ব্রিয়ারয়েসের মতো একশো-হাতওলা দৈত্যরাও এতটা পারত না।

তাঁর বিবরণে প্লুটার্ক বিজ্ঞানের শক্তিকে এবং একশো-হাতওলা দৈত্য

ব্রিয়ারয়েসের চেয়েও ক্ষমতাবান যে অঙ্কবিদ তাঁকে তারিফ করেছেন। কিন্তু প্লুটার্ক একথা বুঝতে পারেননি যে আর্কিমিডিসের ক্ষমতার উৎস শুধু বিজ্ঞান নয়, তার চেয়েও বেশি। তাঁর হাতের সংখ্যা একশো নয়, হাজার হাজার। নিজের নগরকে তিনি রক্ষা করেছিলেন সকল জনগণের সঙ্গে হাত মিলিয়ে। এই কারণেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন দৈত্য। প্লেটোর যথার্থ অনুগামীর মতো তিনি রাষ্ট্রের আত্মাকে স্থাপন করেছিলেন রাষ্ট্রের দেহের বিরুদ্ধে। রাষ্ট্রের আত্মা হচ্ছে রাজা ও সেনাপতিরা, দার্শনিক ও পণ্ডিতরা—তারাই সবার ওপরে শাসনকর্তা। আর জনগণ হচ্ছে শুধুই দেহ—আত্মার বশীভূত।

কিন্তু বিজ্ঞানীকে কি আর জনগণ থেকে ও মনুষ্যজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়? আর্কিমিডিস ছিলেন সিরাকুসের নাগরিক, যে জনগণ নগরটি নির্মাণ করেছিলেন তাদের বংশধর। ইতিহাসে তাদের নাম থাকেনি। কিন্তু তারা ও তাদের আপনজনেরাই শ্রম দিয়ে নির্মাণ করেছিল ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাট, বাঁধ ও জাহাজ, ফলের বাগান ও আঙুরক্ষেত। আর আর্কিমিডিস এদেরই বাঁচিয়েছিলেন। হাজার হাজার হাত তৈরি করেছিল আর্কিমিডিসের যন্ত্র, আর্কিমিডিসের অনেক আগে হাজার হাজার মন চিন্তা করেছিল লিভার ব্লক ও ভারসাম্যের নিয়ম নিয়ে।

তাঁর বিবরণের শেষে প্লুটার্ক বলেছেন কেমনভাবে দীর্ঘকাল অবরোধ করে রাখার পরে রোমানরা সিরাকুস দখল করতে পেরেছিল। তাদের সাহায্য করেছিল বিশ্বাসঘাতকরা। তাদের পক্ষে তারা পেয়েছিল ধনবানদের, আর্কিমিডিস ও অবরুদ্ধ নগরের অন্যান্য নেতা জনগণের যে-দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন সেই দলের শত্রুরা।

রোমান সৈন্যরা নগরের মধ্যে হানা দিল। ভয়ংকর প্রতিশোধ নিল তারা নগরের অধিবাসীদের ওপরে। আর্কিমিডিসকেও খুঁজে বেড়াল। যখন খুঁজে পেল তিনি বালির ওপরে নক্‌শা আঁকছিলেন, গণিতের কোনো সমস্যার সমাধান করছিলেন। সৈন্যদের দেখে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'সাবধান, আমার ছবি যেন নষ্ট না হয়!' নিজের সম্পর্কে সবকিছু তখন ভুলে গিয়েছিলেন, ভাবছিলেন শুধু বিজ্ঞান সম্পর্কে। কিন্তু তাঁর ছবি নিয়ে সেই অজ্ঞ রোমান সৈন্যদের কতটুকু আর মাথাব্যথা! নিজের ছবিকে বাঁচাবার জন্য আর্কিমিডিস সেই ছবির ওপরে উপুড় হয়ে পড়লেন। সেই অবস্থাতেই রোমান সৈন্যরা তাঁকে হত্যা করল।

সিরাকুস রোমের অধীনে চলে গেল। রোমানরা বিশেষভাবে নজর রাখল আর্কিমিডিসের নাম তাঁর স্বদেশে কখনো যেন উচ্চারিত না হয়। কেননা আর্কিমিডিস ছিলেন তাদের চরমতম শত্রু! আর্কিমিডিসের কবরের ওপরে আগাছা জন্মে গেল।

রোমান লেখক ও রাষ্ট্রনেতা সিসেরো জানিয়েছেন, বহু বছর পরে কেমনভাবে তিনি আর্কিমিডিসের কবর খুঁজে পেয়েছিলেন।

'সিসিলিতে থাকার সময়ে আমি সিরাকুসে আর্কিমিডিসের কবর সম্পর্কে জানবার জন্য কৌতূহলী ছিলাম। কিন্তু খোঁজখবর করতে গিয়ে দেখি, স্থানীয় লোক এ-সম্পর্কে এতই কম জানে যে কেউ কেউ বেশ জোর দিয়েই বলল যে আর্কিমিডিসের কবরের কোনো চিহ্নই এখন আর নেই। আমি

কিন্তু কিছুতেই হাল না ছেড়ে আমার অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে লাগলাম এবং শেষপর্যন্ত আগাছায় ও ঘাসে ঢাকা তাঁর কবরের ফলকটি খুঁজে পেলাম। আমি আগেই জানতে পেরেছিলাম এই ফলকের ওপরে খোদাই করা আছে কয়েকটি কবিতা এবং কবিতার নিচে একটি গোলক ও নলের ছবি। এই সূত্র ধরেই ফলকটি খুঁজে পেয়েছিলাম।

'সিরাকুসের তোরণের বাইরে গিয়ে আমি দেখলাম, চারদিকে খোলা মাঠ আর তার মধ্যে ছড়ানো ছিটানো অনেকগুলি কবর। তন্নতন্ন করে আমি খুঁজলাম, শেষকালে পেয়ে গেলাম আগাছার আড়াল থেকে অল্প একটু বেরিয়ে আসা ছোট একটি গম্বুজ। তার ওপরে আঁকা রয়েছে একটি গোলক ও নলের ছবি, যা আমি খুঁজছিলাম।

'সিরাকুসের যে-সব লোক আমার সঙ্গে এসেছিল তাদের আমি সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়ে দিলাম—কবরের যে ফলকটির সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি তা নিঃসন্দেহে আর্কিমিডিসের। তারপরে লোকজন ডেকে যখন আগাছা কেটে ফেলা হলো, পুরো ফলকটি আমরা দেখতে পেলাম। তার একেবারে তলার দিকে কিছু লেখা খোদাই করা রয়েছে—কবিতার লাইন। কালের প্রভাবে কয়েকটি লাইন অত্যন্ত অস্পষ্ট, কয়েকটি লাইন একেবারেই লুপ্ত।

'দেখা যাচ্ছে, গ্রীসের সবচেয়ে গৌরবমণ্ডিত নগরগুলির অন্যতম এই যে সিরাকুস, যেখান থেকে জগৎ এতজন মনীষীকে পেয়েছে, সেখানকার মানুষ জানেও না সেই মনীষীদের মধ্যে যিনি উজ্জ্বলতম প্রতিভা তিনি কোথায় সমাধিস্থ রয়েছেন।'

সিরাকুসে আর্কিমিডিসের স্মৃতিটুকুও মুছে ফেলতে সমর্থ হয়েছিল রোমানরা। তাদের মহান বিজয় উপলক্ষে তারা উৎসব করেছিল। কিন্তু পৃথিবী থেকে তাদের বিজয় মুছে গিয়েছে। আর্কিমিডিসের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি বেঁচে আছে। যখনই কোনো জাহাজনির্মাতা একটি জাহাজ নির্মাণ করে, প্রাচীন জাহাজনির্মাণকারী আর্কিমিডিসের সাহায্য তাকে নিতেই হয়। যারা গৃহনির্মাণ করে তাদের অবশ্যই ব্যবহার করতে হয় তাঁর আবিষ্কারগুলি। যারা যন্ত্র উৎপাদন করে তাদের তো লিভারের নিয়ম বাদ দিয়ে চলারই উপায় নেই।

এই মহান ইঞ্জিনিয়ার এখনো জনগণকে যুদ্ধের সময়ে তাদের মাতৃভূমি-রক্ষায় সাহায্য করেন, যেমন সাহায্য তিনি করেছিলেন নিজের মাতৃভূমি-রক্ষায়।

৭। মানুষের হাতে মৃত জিনিসের প্রাণসঞ্চার

আর্কিমিডিস নিহত হয়েছিলেন। কিন্তু অন্য ইঞ্জিনিয়ার ও বিজ্ঞানীরা তাঁর কাজ চালিয়ে গেলেন, প্রকৃতির অন্ধ শক্তিগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে শিখলেন।

এইসব বিজ্ঞানীর রচনাতেই আমরা পাই হাওয়া-কল ও পাম্পের প্রথম বর্ণনা। বাঁধ তুলে জলস্রোতের গতিপথ রুদ্ধ করা হলো, আর জলকে বাধ্য করা হলো উঁচু দিকে প্রবাহিত হতে। তারপরে স্থাপন করা হলো হাওয়া-কল ও জল-চাকা। বাঁধের জল ব্যবহার করে মিলের চাকা ঘোরানো হলো।

আর চাকা যখন ঘুরতে লাগল, জলের ছিটে উঁচু হয়ে উঠল স্তম্ভের আকারে—যাঁতাকলের পেষাইয়ের সঙ্গে যুক্ত হলো মিলের চাকার উল্লসিত গান। আগেকার হস্তচালিত যাঁতাকল থেকে পেষাইয়ের যে একঘেয়ে আওয়াজ পাওয়া যেত তার সঙ্গে এই শব্দের কতই না তফাৎ!

মেয়েরা বলল, 'পুরনো ধরনের হাতে-চালানো কলে আমরা বহুকাল ধরেই দাসীগিরি করেছি। এবারে জলদেবীরা আমাদের হয়ে কাজ করুক।'

অন্য এক ভাবেও জল ব্যবহার করা হচ্ছিল। প্রথম শোষণ-পাম্প ও পাইপ স্থাপন করা হলো। এই পাম্প ও পাইপের কাজ পুরোপুরি নির্ভর করত লিভারের নিয়মের ওপরে। পাম্প করে জল ওঠানো হতো আর সেই জল দিয়ে নেভানো হতো আগুন, জল রূপান্তরিত হতো বাষ্পের মেঘে।

এমনিভাবে জল মানুষের বশে এল।

কিন্তু বাষ্পও কি তাই? আর বাতাস?

বাতাস তো বহুকাল ধরেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে জলের মধ্যে দিয়ে পালতোলা নৌকো চালাবার জন্য। কিন্তু বাষ্পকে তখনো পর্যন্ত একেবারেই পোষ মানানো যায়নি। এবারে মানুষ চেষ্টা করল বাষ্পকে নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং বাষ্পকে দিয়েও কাজ করিয়ে নিতে।

আলেকজান্দ্রিয়ার বিজ্ঞানী হিরো করলেন কি, এক কেটলি জল আগুনের ওপরে বসালেন, কেটলির মুখ এত শক্তভাবে বন্ধ করে দিলেন যে একফোঁটা জলেরও বেরিয়ে আসার পথ থাকল না। বাষ্প বেরিয়ে আসতে পারত নির্দিষ্ট পথ ধরে—পাত্রের বাইরের দিকে পেঁচানো দুটি তামার নলের মধ্যে দিয়ে। এই দুটি নলের মধ্যে বাষ্প ছুটত প্রচণ্ড থেকে প্রচণ্ডতর বেগে। এই যান্ত্রিক আয়োজনটি হিরো অন্য বিজ্ঞানীদেরও দেখিয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করলেন। নল থেকে আওয়াজ বেরিয়ে আসছে আর হিস্-হিস্ ও শিস দেবার মতো আওয়াজ বেরিয়ে আসছে—সঙ্গীতের সুর তোলা এই খেলনা দেখে সকলেই মজা পেলেন। তখনকার মতো খেলনাই বটে, কিন্তু এই খেলনাই ছিল বাষ্পীয় ইঞ্জিনের অগ্রদূত—দু-হাজার বছর পরে যে বাষ্পীয় ইঞ্জিনকে বাতাসের চেয়েও বেগে মানুষকে বহন করতে হয়েছিল।

বাষ্পের অদৃশ্য ও অস্থির কণিকাগুলিকে হতে হয়েছিল মনুষ্যজাতির সবচেয়ে বিশ্বস্ত দাস, তাকে মুক্ত করতে হয়েছিল সমস্ত রকমের বিরক্তিকর খাটুনি থেকে। তার হয়ে তারা খনন করে, বোনে, খনি থেকে সোনা তোলে, লোহা ঢালাই করে। বাষ্পীয় শক্তির সাহায্য নিয়ে মানুষ অনায়াসেই বাষ্পীয় পোতে ভূ-গোলককে চক্কর দিতে পারবে। হিরো তাঁর এই নতুন-পাওয়া শক্তিকে ব্যবহার করেছিলেন শুধুমাত্র পুতুল-খেলার মূর্তিগুলি নাড়াবার জন্য নয়। আরো একটি বাষ্পচালিত যান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার চতুর উদ্ভাবনা করেছিলেন। এই ব্যবস্থাপনায় মন্দিরের দরজা খুলে যেত। লোকে ভাবত দরজা বুঝি ম্যাজিকের মতো আপনা থেকে খুলে যাচ্ছে।

বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে শুরু করেছিল কিসে ভালো হয়—যাকে মনে হচ্ছে নিষ্প্রাণ তার মধ্যে প্রাণসঞ্চার।

মানুষ বিরাট ছিল, প্রবল ছিল তার বিচারবুদ্ধি। কিন্তু তখনই যদি প্রকৃতির ওপরে তার বিজয় নিয়ে উৎসব করা হতো তাহলে সেটা বড়ো তাড়াতাড়ি হতো। আসলে তার বিজয়ের স্তুতিগান হচ্ছে সেই বিরাটের—অর্থাৎ খোদ মানুষের—দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগের গানে ধুয়ো মাত্র।

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে রোড্‌স দ্বীপের বন্দরে সূর্য-দেবতার একটি মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল। ব্রোঞ্জে তৈরি সূর্যদেবতার এই বিশাল মূর্তিটি তৈরি করতে রোড্‌স-এর শিল্পীদের কুড়িবছর সময় লেগেছিল। মূর্তিটি মানুষের চেয়ে কুড়িগুণ বড়ো। এটিকে মনে করা হতো বিশ্বের সাতটি বিস্ময়ের একটি। কিন্তু পৃথিবীর সামান্য একটু কম্পনের ফলেই মূর্তিটি পড়ে গিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং ব্রোঞ্জের বিশাল এক ধ্বংসস্তূপ ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। দু-শো উট লেগেছিল সেই ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য।

প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনতে মানুষের তখনো বহু বাকি।

সে ভাগ্যের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে চেয়েছিল। প্রাচীন রীতিনীতি ভেঙে দিয়েছিল। বিদ্রোহ করেছিল পূর্বপুরুষদের প্রাচীন অনুশাসনের বিরুদ্ধে। কিন্তু বংশধরদের ওপরে পূর্বপুরুষদের—জীবিতদের ওপরে মৃতদের—আধিপত্য থেকে গিয়েছিল। প্র-পিতামহদের অনুশাসনের প্রতি অনুগত থেকে এথেনীয়রা আনাক্‌সাগোরাসকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল, আরিস্টটলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছিল যে আরিস্টটল দেবতাদের অপমান করেছেন, আরিস্টটল লাইসিয়াম ত্যাগ করেছিলেন কিন্তু এথেনীয়রা তাঁর অনুপস্থিতিতেই তাঁর বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড বহাল করে রেখেছিল—এমনকি যখন তিনি সেখানে ছিলেন না তখনো। আরিস্টার্কাসকে তারা এই বলে অভিযুক্ত করেছিল যে আরিস্টার্কাস নিরীশ্বরবাদী, কেননা তিনি 'বিশ্বের হৃৎপিণ্ডকে স্থানচ্যুত করেছিলেন'।

গ্রীক গণতন্ত্রের সেরা দিনগুলিতে যে-কোনো দার্শনিক খুশিমতো শিক্ষা দিতে পারতেন ও চিন্তা করতে পারতেন। কিন্তু এই দিনগুলি শেষ হয়ে গিয়েছিল। মিশরে, সিরিয়ায় ও ম্যাসিডোনিয়ায় শাসন করতেন রাজা, জনগণ নয়। রাজার কর্মচারীরা ও ডেপুটিরা শক্ত হাতে ধনী বণিকদের ও মহাজনদের ক্ষমতা রক্ষা করতেন। এই ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ করার মতো কিছু ঘটলে তাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হতো এবং নির্মমভাবে শাস্তি দেওয়া হতো। কাজেই এটা অবাক হবার মতো ব্যাপার নয় যে স্বাধীনভাবে চিন্তাশীল যে-কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিরীশ্বরবাদের অভিযোগ আনা হতো। লোককে বলা হতো, দেবতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যারা যাচ্ছে তাদের জন্য কঠোর শাস্তি তোলা রইল।

রোড্‌স-এ আরো একটি মূর্তি ছিল, লাওকোওয়েনের। লাওকোওয়েন ছিলেন ট্রোজান পুরোহিত। ছিলেন দেবতাদের দাস, তবুও তাদের একটি অনুশাসনের বিরুদ্ধে যাবার সাহস দেখিয়েছিলেন। শাস্তি হিসেবে দুটি বিশাল সাপ এসেছিল এবং তাকে পেঁচিয়ে ধরে দম বন্ধ করে মেরে

ফেলেছিল। শিল্পী তার মূর্তি তৈরি করতে গিয়ে সেই সময় বেছে নিয়েছিল যখন বিশাল সাপদুটি তাঁকে পেঁচিয়ে ধরছে। বৃথাই তিনি চেষ্টা করছেন তাদের বেষ্টনী থেকে মুক্ত হতে। শরীরের প্রতিটি মাংসপেশী দিয়ে এজন্য তিনি চেষ্টা করছেন। তিনি তাদের একটুও নড়াতে পারছেন না আর তারা তাঁর ধমনীতে প্রাণঘাতী বিষ ঢেলে দিচ্ছে। তাঁর দুটি অলপবয়স্ক পুত্র তাঁর সঙ্গে রয়েছে। পিতার মতো তাদের ভাগ্যেও একই পরিণতি অপেক্ষা করছে। অনুনয়ের দৃষ্টিতে তারা তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। এমনও তো হতে পারে, তাঁর মতো এমন বিশাল ও শক্তিশালী মানুষও তাদের রক্ষা করতে, মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারছে না। কিন্তু এই একতরফা সংগ্রামে তাদের পিতাই তো এখন অসহায়।

রোড্স-এর অধিবাসীরা এই মূর্তির দিকে তাকাত আর এই ভেবে শিউরে উঠত যে ভাগ্যের কাছে মানুষ কত অসহায়। ভাগ্যের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে গিয়ে মানুষ এখনো পর্যন্ত বিজয়ী হতে পারেনি। দাসত্বের শ্বাসরোধী বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারার আগে এখনো অনেক দুঃখভোগ তার জন্য অপেক্ষা করছে। দাসত্বের শ্বাসরোধী বন্ধন লাওকো-ওয়েনের মূর্তির দুটি সাপের মতো তাকে জড়িয়ে ধরেছে।

শেষপর্যন্ত জয়ী হবে কে?

মানুষ কি পারবে সাপের মতো বেষ্টনী চূর্ণ করতে এবং নিজেকে মুক্ত করতে?

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিজয়ী ও বিজিত

১। রাস্তা রোমের দিকে

'সকল রাস্তা রোমের দিকে'—প্রাচীন প্রবাদে তাই বলা হয়। আর ইতিহাসের পথ ও মনুষ্যজাতির পথও গিয়েছে রোমের মধ্যে দিয়ে।

রাষ্ট্র হিসেবে এথেন্সের অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু এথেন্স টিকে ছিল—সেই দূর অতীতের জীবন্ত সাক্ষী, যখন রাষ্ট্র ছিল নদী ও পর্বত বেষ্টিত ক্ষুদ্র এক উপত্যকা।

রোমের উত্থান শুরু হলো সেই সময়ে যখন আর পর্বত ও সমুদ্রের ঘেরাটোপে দেশের সীমানা আবদ্ধ নয়। এমনকি ইতালির উত্তরে প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে থাকা আল্‌প্‌সও তখন আর রোমের পরাক্রান্ত সমৃদ্ধির পথে বাধা হয়ে থাকতে পারেনি। এই নগর বড়ো হতে শুরু করল প্রথমে তার সীমানা সারা ইতালির দিকে ছড়িয়ে দিয়ে। তারপরে আল্‌প্‌স্‌ পেরিয়ে পৌঁছে গেল গল্‌-এর (ফ্রান্সের প্রাচীন নাম) অন্ধকার অরণ্যে ও দক্ষিণে সিসিলিতে। রোমের রাস্তাগুলি যেমন আরও ছড়িয়ে পড়ে তেমনি এই নগর থেকে বেরিয়ে রাজপথগুলি চলে গিয়েছে সকল দিকে—চওড়া ও সিধে সমস্ত রাজপথ, সমতল পাথর দিয়ে মোড়া, তার ওপরে শক্ত বালুর আস্তর বিছানো। রোমের এই রাস্তাগুলি সবই শুরু হয়েছে রোমের প্রধান চক 'ফোরাম'-এ একটি সোনা-মোড়া স্তম্ভ থেকে। তারা চলে গিয়েছে সকল দিকে—দক্ষিণে সিসিলিতে, উত্তরে রাইনে, পশ্চিমে স্পেনে, পূর্বে বাইজান-টিয়ামে। মাঝখানে যদি নদী পড়ে তাহলে সেই নদীর ওপরে তৈরি হয় শক্ত পাথরের পুল এবং রাস্তা এগিয়ে চলে। সামনে যদি সমুদ্র এসে যায় তাহলে সেই রাস্তা থেমে যায় ও পিছনদিকে ফিরে আসে। কিন্তু তবুও রাস্তা চলে যায় এথেন্সে, আফ্রিকায়, ব্রিটেনে। গ্রীসের উপনিবেশগুলিতে রোমানরা পেয়ে গেল তৈরি করে রাখা নৌকো এবং তারা সেগুলি দখল করল। রোমানরা নিজেদের জন্য যে নৌবহর তৈরি করল সেটা কুড়ুলের সাহায্যে নয়, তলোয়ারের সাহায্যে।

সকল রাস্তা রোমের দিকে। আর এই সমস্ত রাস্তা বরাবর চলেছিল সমুদ্রপথে ভারী বোঝাই করা জাহাজ, স্থলপথে যাত্রীদল। মানুষ আগেই জেনে গিয়েছে কেমনভাবে খাল কেটে সমুদ্রের সঙ্গে সমুদ্র যোগ করতে হয়। এমনিভাবে একটি খাল কেটে লোহিত সাগরকে যুক্ত করা হলো নীলনদের সঙ্গে। আর এই খাল দিয়ে জাহাজ চলল নীলনদের দিকে, আর তারপরে

আলেকজান্দ্রিয়ায়। সেখান থেকে চীনা সিল্ক জাহাজে করে পাঠানো হতো রোমে। রোমের গৃহিণীরা যখন এই সমস্ত দামী সিল্ক নাড়াচাড়া করত তখন একবারও ভাবত না কোন্ হাত এই কাপড় বুনেছে এবং কোন্ চোখ সূক্ষ্ম ছুঁচের কাজ তুলতে গিয়ে টনটন করেছে।

কোথায় সেই দেশ যেখান থেকে সিল্ক আসত?

ভূগোলবিদরা নিজেরাও এ-প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারতেন না। তারা ভাবতেন দেশ আছে দুটি। একটিতে বাস করে সিনাইরা—এ-দেশে যাওয়া যায় একমাত্র সমুদ্রপথে। অন্য দেশে বাস করে সেরাইরা। সেটি প্রাচ্যের এক মরুভূমিতে, সেখানে যেতে হয় স্থলপথে দীর্ঘ পথ পার হয়ে। এ-ধারণা কারও বিন্দুমাত্র ছিল না যে এই দুটি দেশ প্রকৃতপক্ষে একটি—চীন।

প্রাচ্যেও, ভারতবর্ষে ও চীনে, রোম যে কোথায় সে-সম্পর্কে লোকের ধারণা ছিল খুবই অস্পষ্ট।

বিশ্বের দূর-দূর অংশগুলি তখনো পর্যন্ত ঝাপসা কুয়াশায় আবৃত ছিল। রোমের মানুষ বলত, ভারতবর্ষকে পুরোপুরি ঘিরে আছে হাতির দাঁতের উঁচু একটি দেয়াল। এই কারণেই সে-দেশের ভিতরে যাওয়া এত কঠিন। হাতিকে তারা বলত 'সর্প ষাঁড়'। হাতি রোমানদের কাছে ছিল এক অদ্ভুত জানোয়ার। তারা এটিকে ভাবত সাপের মতো হাতওলা ষাঁড়।

কিন্তু যতোই বছর কাটতে লাগল রোমানরা এই সমস্ত দূর দেশের ভিতরে গভীর থেকে আরো গভীরে প্রবেশ করল। মালাবার উপকূলে ভারতীয় দেবতাদের উদ্দেশে নির্মিত মন্দিরের পাশাপাশি পাওয়া গিয়েছে সম্রাট অগাস্টাসের সম্মানে নির্মিত রোমান মন্দির।

সম্রাট অগাস্টাসের হুকুমে রোমে নির্মিত হলো বিশাল এক অট্টালিকা। সম্রাট অগাস্টাস সেই অট্টালিকায় স্থাপন করলেন রোম সাম্রাজ্যের মস্ত একটি মানচিত্র। রোমানরা গর্ব করে বলত, এই হচ্ছে বিশ্বের প্রথম মানচিত্র। মানচিত্রে ছিল বিশ্বের সকল দেশ—উত্তরের তুল্ থেকে ভারতবর্ষের গঙ্গা পর্যন্ত।

মিশর থেকে রোমানরা নিয়ে আসত দানাশস্য ও পালিশ-করা পাথর, বইয়ের জন্য প্যাপিরাস, কারুকাজ-করা কাঁচের পাত্র। গ্রীস থেকে তারা পেত পারিয়ান মার্বেল, কোরিন্থিয়ান ব্রোঞ্জ। চিওস থেকে সুরা, হাইমেটাস থেকে মধু, সামোস থেকে ময়ূর, মেনোস থেকে হাঁস। এইসব হাঁস ও ময়ূর শোভা পেত ধনী রোমানদের সুন্দর সুন্দর বাগানে। স্পেন পাঠাত দানাশস্য ও সুরা, মোম ও পিচ, রুপো ও সোনা এবং স্পেনদেশীয় শুক্তি। গাউল পাঠাত গম ও সুরা। দাসরা পরত লাল গেলিক কাপড়ের জামা। দূরে সেই টেম্স নদীর তীরে ছিল লন্ডন; ব্রিটেন থেকে আসত টিন; এলবে নদীর তীর থেকে রজন। দুরন্ত নদী রা (ভল্গা)-র তীরে, উরাল ও আল্-তাইয়ের ঢালুতে শিকারীরা নেকড়ে শিকার করত এবং হন্যে হয়ে সোনা মেশানো বালি খুঁজে বেড়াত। কাস্পিয়ান সাগরের তীরে স্তেপভূমিতে যাযাবররা ঘুরে বেড়াত চাকা লাগানো তাঁবুর মধ্যে, যেগুলি দেখতে অনেকটা ঢাকা-দেওয়া ডিঙির মতো। ভল্গার তীরে ও আজভ সাগরে তারা নিয়ে আসত পশুলোম ও সোনা। সেখান থেকে গ্রীক নাবিকরা দামী জিনিসগুলি নিয়ে যেত বাইজান্টিয়াম ও রোমে। মরুভূমি পার হয়ে ও পর্বতের

ওপর দিয়ে উটের দীর্ঘ সারি চলত। প্রাচ্য থেকে, ভারতবর্ষ ও আরব থেকে, মধ্য এশিয়া ও চীন থেকে তারা নিয়ে আসত সুগন্ধী নির্যাস ও ধূপ, সিল্কের কাপড় ও চীনা পাত্র।

প্রাচ্য থেকে আরো একটি পথ ছিল—সমুদ্র দিয়ে। সিংহলের কাছাকাছি এলাকা থেকে নারকেল গাছের ছাল দিয়ে তৈরি চ্যাপটা-তলাওলা নৌকো ঝড় ও ঝঞ্ঝার বিরুদ্ধে লড়াই করত। তারা নিয়ে আসত গাঁটরি গাঁটরি চীনা সিল্ক। ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে, মালাবারে, তারা মালগুলি বোঝাই করত মিশরীয় নৌকোয়। দক্ষ চালকরা নৌকোগুলি চালিয়ে নিয়ে যেত বিপদসংকুল উপসাগর ও সাগর পেরিয়ে। স্কটল্যান্ড ছাড়িয়ে উত্তরের দিকের কোনো দ্বীপ থেকে চীন পর্যন্ত পাড়ি দিতে নাবিকদের সুদীর্ঘ সময় লেগে যেত।

রোম ছিল বিশ্বের কেন্দ্র এবং সমস্ত পথ গিয়েছিল রোমের দিকে। সমস্ত নদী মাল বয়ে আনত রোমে—উত্তরে তানাইস (ডন) থেকে. পুবে ওক্সাস (আমু দরিয়া থেকে), দক্ষিণে নীলনদ থেকে, পশ্চিমে টেম্স থেকে। সমস্ত বন্দর ও জেটি—কোল্‌চিসে, ভারতবর্ষে, মিশরে, প্যালেস্টাইনে —ছিল রোমে যাবার পথে স্টেশন মাত্র।

নানা জায়গা থেকে রোমে এই-যে সব সম্পদ আনা হতো তার বিনিময়ে রোম কী দিত? রপ্তানী করার মতো রোমের বিশেষ কিছু ছিল না। রোমের সমুদ্র-বন্দর ওস্ট্রিয়ায় জাহাজে বোঝাই করা হতো সুরা ও তেলের পিপে এবং পশমের থলে। উত্তরের দিকে গাউল-এ পাঠানো হতো রোমান কারিগরদের তৈরি শিল্প-সামগ্রী। কিন্তু বিশ্ব রোমে যা পাঠাত তার তুলনায় এসব জিনিসের দাম আর কতটুকু। প্রাচ্য থেকে—ভারতবর্ষ ও চীন থেকে—যে-সব জিনিস আসত, রোমানরা তার দাম দিত সোনা ও রুপো দিয়ে। রোমান সোনা ও রুপোর একটি স্রোত—দিনার ও সেস্‌তেরাতি—মিলিত হতো চুনী, পান্না ও নীলকণ্ঠমণির সঙ্গে। দু-হাজার বছর পরে, সিন্ধু ও গঙ্গা তীরের মাটিতে রোমান মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। কখনো কখনো পাওয়া গিয়েছে নকল বা জাল মুদ্রা। ভারতবর্ষের মানুষ বুঝতে পারত না কোন্‌টা আসল মুদ্রা আর কোন্‌টা জাল—ভারতবর্ষের মানুষকে ঠকাতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করত না রোমানরা।

এই অর্থ রোমানরা কোথা থেকে পেত?

দু-শো বছর ধরে তারা বিজিত জাতিগুলির ওপরে লুঠপাট চালিয়েছিল। যেহেতু রোম তাদের জয় করেছে, শুধু এই কারণেই রোমকে রাজস্ব দিতে হতো তাদের। প্রত্যেকটি বিজিত নগরকে রাজস্ব দিতে হতো হাজার ট্যালেন্ট। বস্তুতপক্ষে, বিজয়ীদের সমস্ত খরচ বহন করত বিজিতরা। সোনা-বোঝাই জাহাজ অনবরত হাজির হতো রোমে। কখনো কখনো জাহাজডুবি হতো, আর জাহাজের সোনা চিরকালের মতো পড়ে থাকত সমুদ্রের নিচে—সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও জীবের মধ্যে।

সৈন্যদলের নায়করা রোমে ফিরে আসত লক্ষপতি হয়ে। এমনকি সাধারণ সৈনিকরাও মোটা রকমের লুঠের ভাগ পেত। অভিজাত পরিবারের সন্তানরা নাছোড়বান্দা পাওনাদারদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য খুশিমনেই যুদ্ধে চলে যেত, আর যুদ্ধে জয়লাভ করে ফিরে আসত অঢেল

অর্থ নিয়ে, পাওনাদারের কাছে যতো ধার থাকত ফিরিয়ে দিত তার দ্বিগুণ, আর তারপরেও বাকিটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারত আলস্যে।

যুদ্ধে খুবই পটু ছিল সীজারের সৈন্যদল। সব যুদ্ধেই তারা জয়লাভ করেছিল। পথে যদি কোনো খরস্রোতা নদী পড়ে, তারা সঙ্গে সঙ্গে তার ওপরে পুল তৈরি করে নেয় এবং এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে মার্চ করে এগিয়ে চলে। বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে সবচেয়ে ঘন জঙ্গলও পার হয়ে যায়, যে জঙ্গলে হয়তো প্রতিটি গাছের আড়ালে শত্রু লুকিয়ে ছিল। মনে হয় এসব তারা করত যাতে গাউল মহাজনদের হাতে ঠিকমতো থাকে। রোমানরা হাসতে হাসতে বলত, গাউলে একটি পেনি বা একটি সিস্টেরিয়াসও নড়ে না যদি-না তার ফলে মহাজনদের হাতের মুঠোর মধ্যে কিছু থেকে যায়—অর্থাৎ, এইসব ব্যবসায়ীর হিসাবের খাতায় মোটা অঙ্কের জমা।

জেলাগুলিতে লুঠপাট চালাত একদল লোভী মহাজন ও কর-আদায়কারী। রোম আর প্রজাতন্ত্র নেই, হয়ে উঠেছে সাম্রাজ্য। জেলাগুলির ক্ষেত্রে তার অর্থ সোজা কথায় এই দাঁড়াত যে জেলাগুলি এখন লুণ্ঠিত হয় সম্রাটের দ্বারা। দলে দলে আমলা সৈন্যদল সহ জেলাগুলিতে হাজির হতো এবং জেলার প্রত্যেকটি মানুষের হিসেব নিত, যাতে কেউ কর ফাঁকি দিতে না পারে। তারা দেখেছিল, জেলাগুলিতে বাস করে প্রতি একজন রোমানে পনেরোজন অ-রোমান।

রোমের রাস্তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর লোভী রোমান হাত কোন্ জিনিসকে মুঠোয় পাবার জন্য সবচেয়ে আগ্রহী ছিল? কোন্ জিনিসের প্রয়োজন ছিল তাদের সবচেয়ে বেশি? তাদের লোভ ছিল যা-কিছু কল্পনা করা যায় সবকিছুর ওপরেই। কিন্তু সবচেয়ে বেশি করে তারা চাইত দাস, যে দাসকে দিয়ে মাঠের কাজ করানো যায় যাতে জমি অকর্ষিত না থাকে। পৃথিবীর সমস্ত জায়গা থেকে দাস নিয়ে আসা হতো রোমের বাজারে বিক্রি করার জন্য। তাদের কারও কারও পায়ে চকখড়ি ঘষে দেওয়া হতো, তা থেকে বোঝা যেত তাদের ধরা হয়েছে সমুদ্রে। কারও কারও মাথায় থাকত সবুজ পাতার মুকুট, তা থেকে বোঝা যেত তাদের ধরা হয়েছে রাইন নদীর তীর থেকে। তাদের চোখ হতো নীল, চুল ও দাড়ি সোনালী। আর যাদের চুল কালো ও কোঁকড়ানো তারা আসত আফ্রিকা থেকে।

রোমানরা নিজেদের স্বাধীনতা ক্রয় করত অন্যদের দাস করে তোলার জন্য দাম দিয়ে। তাদের স্বাধীনতার মূলে ছিল দাসত্ব—এই ঘটনা তাদেরও দাস করে তুলেছিল।

কোনো বিরতি না দিয়ে যুদ্ধের পর যুদ্ধ চলত। প্রত্যেকে লড়াই করত অন্য প্রত্যেকের সঙ্গে—স্বাধীন মানুষরা দাসদের বিরুদ্ধে, ধনীরা গরিবদের বিরুদ্ধে, বিজয়ীরা বিজিতদের বিরুদ্ধে।

মনে হতে পারত, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটছে। কিন্তু ইতিহাস কখনো পুনরাবৃত্ত হয় না। সবকিছু বদলায়। একই নদীতে দু-বার নামা যায় না। গ্রীকরা যা কখনো করতে পারেনি রোমানরা তাই করেছিল। ভূমধ্যসাগরের চারপাশের সমস্ত দেশ তারা জয় করেছিল।

মিশরের কোনো এক জায়গায় কিংবা গাউলে কৃষকরা বীজ বপন করত, ফসল কাটত, গম পেষাই করত, তারপরে কোনো দাম না নিয়েই তা পাঠিয়ে

দিত রোমে। পাঠাত সেই মানুষদের কাছে যাদের প্রয়োজন ছিল, একদল উপোসী ছেলেমেয়ে ছাড়া নিজেদের বলতে যাদের আর কিছু ছিল না। রোমের যারা পুরোদস্তুর নাগরিক তারা বহুকাল হলো কাজ করা বন্ধ করেছিল। কাজ করাকে তারা অবজ্ঞার চোখে দেখত। কাজ করবে শুধু দাসরা। রোমানদের আগে গ্রীকরাও ঠিক এই রকমটিই করেছিল। রোমের এই মানুষরা অভাবী ছিল, উপোস করে থাকত, কিন্তু কাজ করত না, তার বদলে রোমের রাস্তায় রাস্তায় অলসভাবে ঘুরে বেড়াত। আর ঈর্ষাকাতর চোখে তাকিয়ে থাকত সেই ধনীদের দিকে যারা মূল্যবান সুসজ্জিত শিবিকায় চেপে রাস্তা দিয়ে চলে যেত।

এই শিবিকাগুলি বয়ে নিয়ে যেত লাল উর্দি পরা দাসরা। শিবিকাগুলি ঘিরে কালো-পা দাসদের ভিড় জমে থাকত, ভিড় জমে থাকত সেই মানুষদেরও যারা তাদের রোজকার রুটির জন্য ধনীদের ওপরে নির্ভর করত। ধনীরা চাইত, তারা যখন রাস্তায় বেরোবে তখন যেন এইসব অনুচর ও দাসরা তাদের সঙ্গে থাকে—যাতে বোঝা যায় তারা কত ধনী ও সম্মানিত।

শিবিকা থামে। শিবিকার দু-দিকেই দাসরা ছুটে যায়, তারা জানে না কোন্ দিক থেকে প্রভু নামবে। সিল্কের পর্দা ঠেলে একপাশে সরিয়ে দেওয়া হয়। ভিড়ের মানুষরা দেখে, সাদা আলখাল্লা পরা একজন মানুষ, আলখাল্লার এমনই সূক্ষ্ম উপকরণ যে মনে হয় কাঁচ দিয়ে তৈরি। আলখাল্লার নিচে লাল পিরাণ। সে একটি পা বাড়ায়, তার পায়ে লাল চামড়ার জুতো, তাতে হাতির দাঁতের বকলস। এই ধরনের জুতো পায়ে দিতে পারে একমাত্র ধনী অভিজাতরা, যারা গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কাজ করে। ধনী মানুষটির মুখে বিরক্তির ছাপ। সে বিরক্ত। নগরের সবাই বিরক্ত। তবে কেউ কেউ উপোসী, অন্যদের অতিভোজন। উপোসীরা যাতে বিদ্রোহ না করে সেজন্য সরকার থেকে তাদের বিনামূল্যে রুটি দেওয়া হয়। আর আনন্দ দেবার জন্য দেখানো হয় সার্কাস।

একদা তাদের পূর্বপুরুষরা কাজ করার জন্য দাবি করেছিল জমি। এখন তাদের অধঃপতিত বংশধররা চায় শুধু রুটি আর সার্কাস। জমির বদলে রুটি। কাজের বদলে সার্কাস।

২। মানুষ ও জীবজন্তু

আর এই সমস্ত সার্কাসে গিয়ে কী দেখে তারা? ট্রেনার চাবুক চালাচ্ছে আর সেই চাবুকের তাড়নায় বুনো জন্তুরা একে অপরের সঙ্গে লড়াই করছে। জন্তুগুলি এমন নির্বোধ নয় যে একে অপরের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, ঝাঁপিয়ে পড়ার দিকে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যেতে হয়। জন্তুরা পরস্পরকে হত্যা করছে, শুধু এইটুকু দেখেই জনতা কিন্তু সন্তুষ্ট নয়। তারা দেখতে চায় মানুষের রক্তপাত। তারা অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করে কখন অপরাধী কয়েদী ও আসামীদের নিয়ে আসা হবে এবং তাদের রক্ত-পিপাসু চোখের সামনে পশুদের দিয়ে ভক্ষণ করানো হবে। তারপরেও তারা আরো উত্তেজনাকর দৃশ্যের জন্য অপেক্ষা করে থাকে—তা হচ্ছে

মানুষের সঙ্গে মানুষের আমরণ লড়াই, গ্ল্যাডিয়েটরদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যখন মানুষের সঙ্গে মানুষের লড়াই চলতে থাকে যতোক্ষণ-না একজন সার্কাসের বালুকাময় মেঝের ওপরে মরে পড়ে থাকে।

এই যে এতসব দর্শক, তাদের মধ্যে কি কেউ, একজনও কেউ নেই যে প্রতিবাদ করে?

হ্যাঁ আছে, একজন—দার্শনিক সেনেকা। পীড়াদায়ক এই সমস্ত দৃশ্য দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে উঠে তিনি সার্কাস থেকে বেরিয়ে আসেন ও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যান—এমনকি সম্রাটের কাছ থেকেও বিদায় না নিয়ে। বাড়ি ফিরে সচিবের কাছে মুখে মুখে বলে যান আর তাই শুনে সচিব লেখে :

'দুপুর নাগাদ আমি সার্কাসে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম রক্তাক্ত দৃশ্য-গুলি সব শেষ হবে। আশা করেছিলাম উপভোগ করার মতো কিছু দেখতে ও শুনতে পাব, যাতে লোকের চোখ এতক্ষণের দেখা রক্তাক্ত দৃশ্যগুলি থেকে বিশ্রাম পায়। কিন্তু তেমন কিছুই হলো না! চাবুক আর আগুন দিয়ে মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হলো নিজের সঙ্গীর সঙ্গে লড়াই করার জন্য।...

'হে রোমানগণ, তোমাদের সঙ্গী মানুষদের বিরুদ্ধে এই সমস্ত অপরাধের জন্য যারা দায়ী তারা যে সর্বনাশের মধ্যে পড়বে তা কি তোমরা দেখতে পাও না?'

কথা বন্ধ রেখে একটুক্ষণ পায়চারি করেন। ভাবেন, কী করতে পারেন তিনি? কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবেন সমর্থনের জন্য? মানুষকে এই শিক্ষা দেবার চেষ্টা করা, যে শত্রুকে ক্ষমা করো আর দাসদের প্রতি ক্ষমাশীল হও—ব্যাপারটা কতই না অসম্ভব!

সবাই শুধু হেসেছিল যখন তিনি বলেছিলেন, দাসরাও তাদের মতোই মানুষ, তাদের মতোই মায়ের পেট থেকে দাসদেরও জন্ম, দাসরাও ভালোবাসে এই একই আকাশ, নিঃশ্বাসে নেয় একই বাতাস, বাঁচে ঠিক তাদেরই মতো, আর পরিশেষে আশা করে সেই একই মৃত্যু।

এই দাসগুলি কি দাস ছিল? না, তারা ছিল মানুষ, সাথী। জগতের সকল মানুষ পরস্পরের ভাই। গোটা জগৎ তাদের পিতৃভূমি। কিন্তু তাঁর শ্রোতারা এই সমস্ত কথা থেকে কী বুঝেছিল?

আমি কী করব, সেনেকা ভাবেন। জগতকে নতুন করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করব? অনর্থক সময় নষ্ট শুধু...সকলের জন্য অপেক্ষা করছে একই ভাগ্য, চাওয়া হোক বা না-হোক। আর প্রার্থনা দিয়ে ভাগ্যকে নড়ানো যায় না। ভাগ্যের কোনো অনুভূতি নেই—না করুণার, না সহমর্মিতার। আকাশের তারাগুলিকে অবশ্যই ভাগ্যের কাছে মাথানত করতে হবে। পৃথিবীর মানুষকেও তাই করতে হবে—নতিস্বীকার করতে হবে প্রকৃতির নিয়মের কাছে। মানুষের করার শুধু এইটুকুই আছে যে নিজের সমস্ত সাহস সঞ্চয় করতে হবে আর ভাগ্য তাকে যা-ই দিক, সমস্ত কিছু নিস্পৃহ-ভাবে সহ্য করতে হবে।

৩। মানুষকে ঠিক করতে হবে কোন্‌টা ভালো—দাসত্ব না মৃত্যু

কোন্‌টা ভালো? বীরের মতো ও নিস্পৃহভাবে ভাগ্যের মার সহ্য করা, না, শেক্‌সপীয়র যেমন বলেছেন, 'দুঃখের সাগরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা, বিরোধিতা করে তার অবসান ঘটানো?' মানুষের পক্ষে কোন্‌টা ভালো—লড়াই করা, না, দাসত্বের মধ্যে থাকা? মানুষ কি সবিনয়ে কপাল বাড়িয়ে দেবে যাতে কপালের ওপরে দাসত্বের ছাপ দেগে দেওয়া যায়, আর তারপরে এই ভেবে সান্ত্বনা লাভ করবে যে শত্রুর কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছে দেহ মাত্র, কিন্তু আত্মা রয়েছে মুক্ত? নাকি হাতে তলোয়ার নিয়ে বিজয়ীদের বিরুদ্ধে তারা মোক্ষম লড়াই চালিয়ে যাবে?

হাজার হাজার মানুষ জবাব দেয়, দাসত্ব করার চেয়ে বরং মৃত্যুবরণ করা ভালো।

ঐতিহাসিক প্লুটার্ক বিস্ময়ের সঙ্গে লিসিয়ার ক্ষণথুসের নাগরিকদের কথা লিখেছেন, যাদের কাছে দাসত্বের চেয়ে আত্মহত্যা শ্রেয় বলে মনে হয়েছিল :

'আত্মহত্যা করার জন্য আবেগে আপ্লুত হয়েছিল শুধু পুরুষ ও নারীরা নয়, এমনকি ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরাও যেন মরবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। কাঁদতে কাঁদতে তারা ঝাঁপ দিচ্ছিল আগুনে, গড়িয়ে পড়ছিল উঁচু পাহাড়ের চুড়ো থেকে, বাপ-মায়ের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়াচ্ছিল যাতে তলোয়ার চালিয়ে তাদের হত্যা করা যায়।

বিজয়ীরা নিজেরাও শিউরে উঠেছিল। রোমান সেনানায়করা কথা দিয়েছিল জীবন্ত কাউকে ধরে আনতে পারলেই পুরস্কার দেওয়া হবে। তবুও জীবন্ত ধরা দিয়েছিল অতি অল্প কয়েকজনই।

শুধু লিসিয়ার মানুষরাই এইরকম কাণ্ড করেছিল, তা নয়। হাজার হাজার মানুষ শেষপর্যন্ত লড়াই চালিয়ে গিয়েছিল। এমনকি বিজিত হবার পরেও পরাভূত হতে চায়নি, বিজয়ীদের বিরুদ্ধে অনবরত বিদ্রোহ করেছিল। বিদ্রোহের পরে বিদ্রোহ হচ্ছিল, ঢেউয়ের পরে ঢেউ-এর মতো। কোনো এক জায়গায় একটি অভ্যুত্থান হয়তো দমন করা গেল, সঙ্গে সঙ্গে অন্য এক জায়গায় শুরু হয়ে গেল আর একটি অভ্যুত্থান। রোমান গভর্নমেন্টের পরাক্রান্ত শক্তি সেইসব বিদ্রোহ দমন করেছিল ঠিকই, কিন্তু প্রতিটি আঘাতে সেই গভর্নমেন্ট দুর্বল হচ্ছিল, দুর্বল হচ্ছিল সেই দাস-ব্যবস্থা যার আওতায় সেই গভর্নমেন্ট কাজ করছিল।

রোমের পক্ষে তার সৈন্যবাহিনীকে সাম্রাজ্যের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটোছুটি করানো ক্রমেই অতি বেশি মাত্রায় শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ছুটোছুটি করবার মতো সৈন্যও খুব বেশি ছিল না। জার্মানির—আর গলেরও—উপজাতিদের ব্যবহার করেছিল রোমানরা। কিন্তু প্রায়ই এমন হতো যে এই সমস্ত জার্মান ও গলিক সৈন্যবাহিনী রোমান সৈন্যবাহিনীর পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করার বদলে রোমান সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধেই অস্ত্র উদ্যত করেছে।

পশ্চিমে ও উত্তরে বর্বর উপজাতিদের সঙ্গে আপসরফা করতে হয়েছিল

রোমানদের। পূবে বাস করত এমন সব মানুষ যারা আগেই সংস্কৃতির পথে বহুদূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছে, আর রোমানদের তখনো বর্বর অবস্থা ঘোচেনি। তাদের কাছ থেকে এবং গ্রীস হয়ে ফিনিসীয়দের কাছ থেকে রোমানরা পেয়েছিল বর্ণমালা। সেই পূবে, বিশ্বের চৌরাস্তায়, জন্ম হয়েছিল বিজ্ঞানের। পূবের এই মানুষদের সঙ্গে আপস করাটা পশ্চিমের ও উত্তরের বর্বরদের সঙ্গে আপস করার চেয়েও রোমানদের পক্ষে বেশি দুরূহ ছিল।

ইতিহাসের গতিপথে এশিয়া মাইনরের ছোট দেশ জুডিয়া বহুবার প্রমাণ দিয়েছিল যে সে আকারে ছোট হতে পারে, কিন্তু আত্মিক শক্তিতে বিরাট। জুডিয়ার স্কুলে শিক্ষকরা তাদের ছাত্রদের কাছে বলত কি ভাবে ডেভিড গোলিয়াথকে জয় করেছিল। বর্শা দিয়ে নয়, তলোয়ার দিয়ে নয়, জয় করেছিল তার আত্মার শক্তি ও তার বিশ্বাস দিয়ে। রোমের সঙ্গে তুলনায় জুডিয়া হচ্ছে গোলিয়াথের বিরুদ্ধে ডেভিডের মতো।

রোমান সৈন্যবাহিনী যখন মার্চ করে চলত তাদের পায়ের তলায় মেদিনী কাঁপত। যতো পাকাপোক্ত দেয়াল হোক আঘাত হেনে তা ভেঙেচুরে দেবার মতো দশাসই যন্ত্র থাকত সঙ্গে। থাকত দুর্গপ্রাকার ভাঙার জন্য বিশাল মুষল, পাথর ও তীর ছোঁড়ার ব্যবস্থা। যন্ত্রগুলো ঝনঝন করে উঠত ও কাতর আওয়াজ তুলত। এইসব বিশাল বিশাল যন্ত্র যখন একযোগে আঘাত করত তখন সবচেয়ে দুর্ভেদ্য প্রাচীরও ভেঙে পড়ত।

সৈন্যবাহিনী দূর থেকে আরও দূরে এগিয়ে যেত। আর এগিয়ে চলার নির্মম গতিপথে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে যেত নগরের পর নগর। যেখানে একসময়ে ছিল ফুলেভরা বাগান, আঙুরের ক্ষেত আর জলপাই গাছ, সেখানে পড়ে থাকত শুধু ধূ-ধূ মরুভূমি। ভারতবর্ষকে পরাভূত করার পরে তারা ফিরে এসেছিল পন্টু, ককেসাস ও সীথিয়ানের দিকে। স্বদেশে ফিরেছিল জার্মানির মধ্যে দিয়ে আর এমনিভাবে রোমান সাম্রাজ্যের চক্রটি সম্পূর্ণ করেছিল।

বিশ্বের সীমানা ছিল মহাসাগর। তাকে তারা চেয়েছিল রোমান সাম্রাজ্যের সীমানা করে তুলতে। এই ছিল রোমানদের প্রতি তাদের অধিনায়ক গাইয়ুস জুলিয়াস সীজারের শেষ আদেশ।

কিন্তু ছোট জুডিয়া তাদের পথের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল, যখন তারা ভারতবর্ষে গিয়েছিল। কী করতে পারে সেই তুচ্ছ ছোট দেশটি পরাক্রান্ত রোমান দৈত্যের বিরুদ্ধে? জুডিয়ার এমন কোনো পাথরের দেয়াল ছিল না যা দিয়ে আক্রমণ ঠেকানো যেতে পারত। তার ছিল শুধু বিশ্বাস—সত্যে, ন্যায়নিষ্ঠায়, আত্মার শক্তিতে। জুডিয়ার মানুষরা ছিল ইহুদী, তারা বিশ্বাস করত ঈশ্বরে। রোমানরা যে দেবতাদের পুজো করত, ইহুদীদের ঈশ্বর তাদের থেকে আলাদা। ইহুদীরা ঈশ্বরের কোনো মূর্তি তৈরি করত না। তারা বলত, ঈশ্বর অদৃশ্য, যেমন অদৃশ্য সত্য।

রোমানরা এই অদৃশ্য ঈশ্বর সম্পর্কে একেবারেই কোনো ধারণা করতে পারত না। তাদের মনে হতো জুডিয়ার মন্দিরগুলি বড়োই অদ্ভুত আর শূন্য—চোখে পড়বার মতো একটি মূর্তিও সেখানে নেই। রোমান ধর্ম রোমান আইনের মতোই সরল ও যথাযথ, রোমান সৈন্যবাহিনীর শৃঙ্খলাবদ্ধ

সংগঠনের মতো। আইনের ক্ষেত্রে রোমানরা ছিল মস্ত বিশেষজ্ঞ। তারা জানত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যাথার্থ্য। দেবতাদের শ্রেণীবন্ধ করা হয়েছিল সর্বোচ্চ জুপিটার থেকে নিচের সবচেয়ে অকিঞ্চিৎকর দেবতা পর্যন্ত সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসে। সবকিছুর নিজস্ব বিশেষ দেবতা ছিল। দেবতা ছিল ঘোড়াদের, দেবতা ছিল ভেড়াদের, দেবতা ছিল মাঠের, দেবতা ছিল সুরার। দেবতা ছিল অর্থের—এই দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাতে যেন কিছুতেই ভুল না হয়, তবেই-না চোরের হাত থেকে অর্থ বাঁচবে। দেবতা ছিল দরজার শুধু নয়, দরজায় লাগানো কবজারও। কুমোররা প্রার্থনা জানাত কুমোরদের দেবতার কাছে, যারা সাবান বানাত তারা সাবানপ্রস্তুতকারকদের দেবতার কাছে। রোমানরা এমনকি বিদেশী দেবতাদের পুজো করতেও প্রস্তুত ছিল—যেমন, মিশরের আইসিস, পারস্যের মিথ্রাস। আর তারপরে সম্রাট যখন নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র সীজার অক্টাভিয়ানকে দেবতার মর্যাদায় উন্নীত করেন, রোমানরা তাকে পুজো করতেও একপায়ে খাড়া ছিল। এই নতুন দেবতার সম্মানে বিশেষ একটি বেদী তৈরি করা হয়েছিল এবং এই বেদীর সেবা করার জন্য নিযুক্ত হয়েছিল পুরোহিত। তারা এই দেবতার নাম দিয়েছিল অগাস্টাস—আশীর্বাদদাতা। তার পুজো দিতেও শুরু করেছিল, তাকে স্থান দিয়েছিল জুপিটারের পাশে। আর অগস্টাস এটাই চেয়েছিল—সারা সাম্রাজ্যের জন্য একজন দেবতা। এতে মানুষ একসূত্রে বাঁধা থাকে। পার্থিব ও ঐশ্বরিক শক্তি একজন সর্বমান্য দেবের হাতে থাকাটা সুবিধেরও।

যখনই নতুন কোনো সম্রাট হতো, তাকে অভিনন্দিত করা হতো এই আওয়াজ তুলে : 'তুমি সীজার! তুমি অগস্টাস! তুমি দেবতা!'

লোকে জানত সম্রাটের ক্ষমতা অসীম, যেমন অসীম জুপিটারের ক্ষমতা। সম্রাট ভালো হলে প্রজাদের প্রতি সদয় হন, প্রজাদের সঙ্গে করুণাঘন ব্যবহার করেন। সম্রাট নির্দয় ও শয়তান হলে তাঁর নিষ্ঠুরতাকে বাধা দিতে পারে বা দমন করতে পারে এমন ক্ষমতা কারও নেই।

রোমান ইতিহাস পড়তে পড়তে আমরা মার্কাস অরেলিয়াস ও সম্রাট কমোডাসের নাম পাই। মার্কাস অরেলিয়াস ছিলেন একজন বিরাগী দার্শনিক—সেনেকার শিক্ষার অনুগামী। এমনকি সিংহাসনে বসেও তিনি দার্শনিক থাকতে পেরেছিলেন। গ্ল্যাডিয়েটরদের লড়াই তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সার্কাসে যখন যেতেন সারাক্ষণ বই পড়তেন, রঙ্গভূমির দিকে একবারও তাকাতেন না। তিনি এমনভাবে জীবন কাটাতে চাইতেন যাতে অন্য রোমানদের কাছে তিনি উত্তম জীবনযাপনের এক আদর্শ দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারেন।

তাঁর পুত্র কমোডাস ছিলেন একেবারে অন্যরকম। তিনি আবার শুরু করে দিয়েছিলেন গ্ল্যাডিয়েটরদের লড়াই, বন্য পশুদের ছেড়ে দেওয়া হলো যাতে পরস্পরকে হত্যা ও ভক্ষণ করতে পারে, বুনো জানোয়ারদের মুখে তুলে দেওয়া হলো জীবন্ত মানুষ।

একদিন সার্কাসে কমোডাস একটা তলোয়ার তুলে নিয়ে এক কোপে একটা উটপাখির মাথা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। একটি কথা বলেননি, তাঁর সঙ্গে একই ঘেরা জায়গায় যে-সব পারিষদ বসেছিল তাদের শুধু দেখিয়ে-ছিলেন ব্যাপারটা। তারা শিউরে উঠেছিল, কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল

তিনি কী বলতে চান—তাদের মধ্যে যে-কেউ যে-কোনোদিন একই অবস্থায় পড়তে পারে।

যাই হোক, জুডিয়ায় জেরুজালেমের অবরোধের কাহিনীতে ফিরে যাওয়া যাক।

সম্রাটকে দেবতা হিসেবে পুজো করতে ইহুদীরা একেবারেই নারাজ, যদিও প্রত্যেক রোমান প্রজার ক্ষেত্রে এটা কর্তব্য বলে মনে করা হতো। ইহুদীদের বড়ো বেশি ভক্তি তাদের একক অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতি, যিনি সবকিছুর স্রষ্টা। ইহুদীরা বলত, ঈশ্বর হচ্ছে চেতনা, অসীম, অনন্ত এবং নিজের জ্ঞানে, শক্তিতে, উৎকর্ষে, পবিত্রতায় ও সত্যে অপরিবর্তনীয়।

আর তাই ছোট্ট জুডিয়া বিরাট রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সাহস পেল।

রোমানরা একটি বাহিনী পাঠাল। তারা ভেবেছিল সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে জেরুজালেম দখল করে নেবার জন্য একটি বাহিনীই যথেষ্ট। কিন্তু সেই বাহিনী বাধ্য হলো পিছু হটতে—বিশৃঙ্খল অবস্থায় ও ইহুদীদের দ্বারা তাড়িত হয়ে। রোমানদের সমস্ত আক্রমণের অস্ত্র বিজয়ী ইহুদীদের হাতে পড়ল। রোমানদের সোনালী ঈগল, যেটিকে রোমান সৈন্যরা দেবতার মতো ভক্তি করত, সেটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল।

কয়েক মাস পরে কয়েক লিজান (তিন থেকে ছয় হাজার সৈন্য নিয়ে এক লিজান) সৈন্য নিয়ে রোমানরা আবার আক্রমণ করল। এই সৈন্যদলের কাছে ইহুদীদের সীডার ও পাইন গাছ, আঙুরের ক্ষেত ও জলপাইয়ের ডাল দাঁড়াতেই পারল না। কিন্তু এমনকি সবচেয়ে ছোট দুর্গটিও রোমান সৈন্য-বাহিনীর বিরুদ্ধে দুর্দমনীয় প্রতিরোধ তুলে দাঁড়াল। মাসের পর মাস নিষ্ফল অবরোধ চালিয়ে যেতে হলো। আরো একবার চেষ্টা করার জন্য রোমানরা তৃতীয় একটি সৈন্যদল পাঠাল। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাদের স্বীকার করতে হলো যে অতি শক্তিশালী শত্রুর হাতে তারা পড়েছে। মিশর তারা জয় করেছিল দুই লিজান সৈন্য নিয়ে, জার্মানিকে পদানত করেছিল মাত্র চার লিজান সৈন্য নিয়ে, জেরুজালেম অবরোধ করতে পাঠিয়েছিল সম্রাটের পুত্রের অধিনায়কত্বে দশ লিজান সৈন্য।

জুডিয়াকে পদানত করার জন্য রোমানরা সবরকম চেষ্টা করল, কেননা জুডিয়াকে যদি অপরাজিত থাকতে দেওয়া হয় তাহলে অন্য জাতিরা নিশ্চয়ই বিদ্রোহ করবে। ইতিমধ্যেই জার্মানি ও গল্-এ অস্থিরতার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। জেরুজালেমের চারদিকে চারটি উঁচু মাটির দেয়াল ছিল। কিন্তু রোমান কাছিমরা তাদের ব্রোঞ্জের বর্ম মোড়া গা ও লোহার মুণ্ডুওলা কাঠের গুঁড়ি নিয়ে এই দেয়ালগুলির বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে হামলা চালানো সত্ত্বেও দেয়ালগুলি অটল রইল। ইহুদীরা এই সমস্ত ধাতব কাছিমের নিচে মাটির মধ্যে সুড়ঙ্গ খুঁড়েছিল, ফলে নিচের মাটি হাঁ হয়ে গেল আর সবশুদ্ধ গ্রাস করে বসল। দেখে মনে হতে পারত, লোহার মুণ্ডু বসানো ভারী গুঁড়িগুলির ওজন সহ্য করার ক্ষমতা মাটির ছিল না। রোমানরা যখন দেখল হামলা চালিয়ে নগরটি দখল করতে পারছে না, তখন ঠিক করল তাদের অনাহারে মারবে। জেরুজালেমের চারদিক ঘিরে উঁচু দেয়াল তুলে তারা বাইরের জগতের সঙ্গে নগরের সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করে দিল।

জেরুজালেম উপোসী রইল। উপোসী মানুষ এত বেশি সংখ্যায় মরতে লাগল যে তাদের সকলকে কবর দেবার সময় পাওয়া গেল না। বাইরের দিকে একটা নালার মধ্যে মড়াগুলি ছুঁড়ে ফেলা হলো। কেউ পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলেই রোমানরা তাকে ক্রুশবিদ্ধ করছিল। নগরের চারদিক ঘিরে কাঠের ক্রুশ দেখা দিল। নেকড়ে শেয়াল আর চিতাবাঘদের মধ্যে মড়া নিয়ে ভোজ লেগে গেল। শেষকালে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে জন্তুগুলিও আর খেতে পারছে না।

কিন্তু জেরুজালেম আত্মসমর্পণ করল না।

পুরনো দেয়ালের ভিতরের দিকে ইহুদীরা নতুন দেয়াল তুলল। রোমান কাছিমরা যেই-না একটি দেয়াল গুঁড়িয়ে ফেলছে অমনি দেখা যাচ্ছে ভিতরের দিকে আরো একটি দেয়াল। উঁচু দেয়ালের ওপরে গড়ে তোলা একটি মন্দিরের কাছে এসে হাজির হলো রোমানরা। সারা দুনিয়া ঢুঁড়ে এমন একটি দুর্গ দখল করার কথা তারা কি কখনো ভাবতে পেরেছিল। তার ছাদ তৈরি হয়েছে ঝকমকে সোনা দিয়ে, তার স্তম্ভ—মার্বেল পাথর কুঁদে, তার দেয়াল—সীডার ও সাইপ্রাস দিয়ে, তার মেঝে—মোজাইক করা ফলক দিয়ে।

আর এমনি জায়গাতেই এসেছে রোমানরা, যাদের ধারণা জগতে তারাই একমাত্র সত্যিকারের মানুষ। রোমানদের চোখে জগতের আর সবাই বর্বর।

কিন্তু আসল বর্বর কারা? যারা গড়ে তুলেছে—তারা? না, যারা ধ্বংস করতে এসেছে—তারা?

একদল মানুষের রয়েছে মন্দির, যা নিয়ে তাদের গর্ব, যা তাদের কাছে সব পুণ্যের সেরা পুণ্য, তাদের পিতৃভূমির হৃদয়। অন্য দলের রয়েছে শুধুই লুটপাটের লালসা। তারা চায় শুধু লুট করতে ও এই সম্পদ ধ্বংস করতে।

ছয়দিন ও ছয়রাত্রি ধরে রোমানরা তাদের লোহার মুন্ডু দিয়ে মন্দিরের দেয়ালে ঘা মারতে লাগল। লম্বা লম্বা মই তৈরি করল মন্দিরের উঁচু দেয়ালের ওপরে ওঠার জন্য। ইহুদীরা মই ঠেলে ফেলে দিল, সেই সঙ্গে সৈন্যদেরও। শেষপর্যন্ত রোমানরা মন্দিরে প্রবেশ করল। কিন্তু বেদীর কাছে পৌঁছতেই ঝাঁকে ঝাঁকে তীর এসে পড়ল তাদের ওপরে—তীরগুলো ছুঁড়ছিল মন্দির রক্ষা করার ভার যাদের ওপরে তারা। দুর্গটি একটি মন্দির এবং শেষপর্যন্ত মন্দিরই থেকে গেল। প্রধান পুরোহিত বেদীতে আসীন হলেন। মানুষগুলি যখন জবাই ও খুন হচ্ছিল তখনো তারা পবিত্র সঙ্গীত গেয়ে চলেছে।

মন্দিরে আগুন জ্বলছিল। শেষপর্যন্ত যারা বেঁচে ছিল তারা মন্দিরের ছাদ থেকে সোনার ধারালো টুকরো ভেঙে নিয়ে শত্রুদের লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল। তারপরে শেষ ধর্মীয় গানে গলা মেলাল।...

রোমানরা ধ্বংসস্তূপ থেকে খুঁড়ে খুঁড়ে বার করল সাতনরী বাতিদান ও পবিত্র পাত্র। তারা চেয়েছিল এই পবিত্র আধারগুলি টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলতে, যেমন ইহুদীরা তাদের সোনালী ঈগল চূর্ণবিচূর্ণ করেছে। মন্দির ধ্বংস হয়ে গেল কিন্তু থেকে গেল ঈশ্বরের প্রতি ইহুদীদের অবিচল বিশ্বাস। থেকে গেল তাদের অটল সাহস।

কয়েক বছর পরে ইহুদীরা আবার রোমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উঠল। ততোদিনে একজন ত্রাতা এসে গিয়েছেন। তার নাম বার কোচ্‌বা—'নক্ষত্রের পুত্র'। তিনি দুর্গ নির্মাণ করেছেন, সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলেছেন ও তাদের অস্ত্রসজ্জিত করেছেন। এবারে রোমানরা হাজির করল ব্রিটেন থেকে তাদের সেরা বাহিনী, জুলিয়াস সীজারের অধিনায়কত্বে—যিনি তাদের সবচেয়ে দক্ষ নেতা। কিন্তু ইহুদীরা আত্মসমর্পণ করল না। তারা এমন সব দুর্গ নির্মাণ করল যেগুলি মাটির নিচের সুড়ঙ্গ দিয়ে একটির সঙ্গে অপরটি যুক্ত।

একজন ঐতিহাসিক লিখেছেন, 'অতি হতভাগা এই লোকগুলো! নিজেদের দেশ থেকে যখন ওদের তাড়িয়ে দেওয়া হয় তখন ওরা যা করে তাতে মনে হয় দেশের জমিতেই ওরা নিজেদের কবর দিতে চাইছে। আর যাই হোক, বশ্যতা স্বীকার কিছুতেই নয়।'

ইহুদীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামার সাহস রোমানদের কখনো হয়নি। একটির পর একটি দুর্গ তারা অবরোধ করে রেখেছে এবং অবরুদ্ধ দুর্গে খাদ্য ও পানীয় পৌঁছতে দেয়নি। মাটির নিচের যুদ্ধ বহুকাল ধরে চলেছিল। অবশেষে শেষ দুর্গ অধিকার করে নেওয়া হলো। বার কোচ্‌বা নিহত হলেন। জুডিয়া মরুভূমিতে পর্যবসিত হলো। পুরুষরা নিহত, নারী ও শিশুরা বন্দী। রোমান দাস-বাজারে ইহুদী দাসরা ঘোড়ার চেয়েও শস্তা দামে বিকোতে লাগল।

ইহুদীরা তাদের পিতৃভূমি হারিয়েছে, কিন্তু হারায়নি তাদের পবিত্র গ্রন্থ। তা হচ্ছে বীরদের সম্পর্কে তাদের স্তোত্র, তাদের ঐতিহ্য, তাদের ভবিষ্যদ্বাণী, তাদের জ্ঞানী ব্যক্তিদের উক্তি ও চিন্তা সম্বলিত পাণ্ডুলিপি। নির্বাসনের দিনগুলিতে তারা এই সমস্ত গ্রন্থ ও ভবিষ্যদ্বাণী পাঠ ও অধ্যয়ন করল, স্বপ্ন দেখল এমন এক সময়ের যখন মানুষ আর পরস্পরের সঙ্গে লড়াই ও পরস্পরকে খুন করবে না, যখন এমনকি পশুরাও পোষ মানবে ও বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে যাবে : 'যখন নেকড়ে ও ভেড়া এক সঙ্গে বাস করবে...এবং ছোট একটি শিশু তাদের পথ দেখাবে।'

ইহুদীরা দেশ থেকে দেশে বিতাড়িত হয়েছিল। ইহুদীদের ওপরে একের পর এক জাতি নির্যাতন চালিয়েছিল।

উত্তরকালে জার্মান বর্বরদের আক্রমণে রোমের পতন হয়েছিল। গ্রন্থ হয়ে উঠেছিল দুর্লভ। সে-সময়ে যারা নাকি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তাদের মধ্যেও লিখতে বা পড়তে জানত অতি অল্প কয়েকজন মাত্র।

তাহলে কারা এই এতগুলি শতাব্দী ধরে তাদের বংশধরদের জন্য রক্ষা করে রেখেছে তাদের জ্ঞানী ব্যক্তিদের বাণী, তাদের অতীত অভিজ্ঞতার ইতিহাস? ইহুদীরা—যাদের কাছে গ্রন্থ ছিল জীবনের চেয়েও মূল্যবান।

৪। যে ভয়াল পাঠশালায় মানুষকে পাঠ নিতে হয়েছিল

মানুষের পথ গিয়েছে রোমের মধ্যে দিয়ে। এই পথ অশেষ ক্লেশের, বিপুল গৌরবের ও বিরাট লজ্জার। সেখানে মহত্ত্ব ছিল নীচতা থেকে এক-পা মাত্র তফাতে। আইন রক্ষা করছিল লুঠেরাদের শান্তিতে ও

নির্‌বেগে লুটপাট চালিয়ে যাবার অধিকার। সম্রাটের শক্তি যতোই বাড়ছিল ততোই তার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছিল বন্দী দাসদের ক্রোধকে ভয় পাওয়ার আরো বেশি বেশি লক্ষণ।

মানুষকে পাঠ নিতে হয়েছিল এক ভয়াল ও ভয়ংকর পাঠশালায়। তবুও সেটি ছিল এমনই এক পাঠশালা যেখানে সে কিছু শিখতেও পেরেছিল।

রোমান আইনে একমাত্র রোমান নাগরিকদের অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা ছিল। বর্বর ও দাসদের কোনো অধিকার আইনে স্বীকৃত ছিল না। তবুও রোমান বিধিতে নাগরিকদের অধিকার ও দায়দায়িত্বের কথা এত স্পষ্ট ও যথাযথভাবে বিবৃত ছিল যে বহু শতাব্দী পরে যখন একজন নাগরিকের অধিকার হয়ে উঠেছে সর্বজনের অধিকার তখনো লোকে রোমান বিধি থেকে শিক্ষা নিয়েছে।

যদিও রোমান শৃংখলা-বিধি সৃষ্টি হয়েছিল রোমান সৈন্যবাহিনীকে সংযত রাখার জন্য, কিন্তু পরবর্তীকালে এই শৃংখলা বিধিই হয়ে উঠেছে পিতৃভূমি রক্ষায় নিযুক্ত সকল সৈন্যবাহিনীর কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ। রোমানদের সাহস ও শৃংখলা সম্পর্কে প্লুটার্ক যে-কথা বলেছেন তা এই :

'কতিপয় শত-সেনানায়ক, সৈন্যবাহিনীর উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা একটি জলাভূমিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল এবং শত্রুদের দ্বারা প্রায় পরাজিত হতে চলেছিল। সীজার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন, আর তখন একজন সেনানায়ক ঝাঁপিয়ে পড়ে বর্বরদের সংগে প্রচণ্ড লড়াই শুরু করে দিল। অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে সে শত-সেনানায়ককে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাল। তারপরে যখন জলাভূমি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছিল তখন নিজের বর্মটি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। নিরাপদে ফিরে আসবার পরে সীজার ও তাঁর অনুচরেরা প্রশংসাসূচক হর্ষধ্বনি তুলে তাকে অভিনন্দন জানান। কিন্তু সেই সেনানায়ক দুই চোখে সলজ্জ অশ্রু নিয়ে সীজারের সামনে আভূমি প্রণত হয় এবং বর্ম ব্যতিরেকে সীজারের সামনে উপস্থিত হতে হয়েছে বলে মার্জনা ভিক্ষা করে।'

প্রত্যেক যোদ্ধার কাছে এ এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত!

রোমান সেনানায়কদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ সেই সীজার নিজে সবসময়ে তাঁর সৈনিকদের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিলেন। মানুষটি ছিলেন রুগ্ন, কিন্তু নিজের অসামর্থ্য জয় করতে চেষ্টা করতেন অবিরাম কাজের মধ্যে থেকে ও ঘরের বাইরে কাটিয়ে। সবসময়ে যাতে অগ্রসর হতে পারা যায় সেজন্য শিবিকার মধ্যে কিংবা অমসৃণ যানের মধ্যে শয়ন করতেন। সৈন্য-বাহিনী পরিদর্শন করার জন্য ঘোড়ার পিঠে যখন ঘুরতেন তখন তাঁর দু-পাশে দু-জন সচিবও ঘোড়ার পিঠে চলত। দু-জনকে একই সংগে দুটি চিঠির বয়ান মুখে মুখে বলে যেতেন। সময়ের মূল্য জানতেন তিনি।

একবার তিনি খবর পেলেন যে গলরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। সে-সময়ে নদীগুলি জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে গিয়েছিল। কোনো কোনো জায়গায় জংগলের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পথ পুরু বরফে পুরোপুরি ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। কোনো কোনো জায়গা বন্যায় ভেসে গিয়েছিল। তবুও দেখা গেল, বিদ্রোহ যেখানে ঘটছে ঠিক সেই জায়গাতেই সীজার ও তাঁর

সৈন্যবাহিনী এসে হাজির, একেবারেই আচমকা—অন্তত ব্যাপার দেখে তাই মনে হলো—সম্ভবত তিনি আগে থেকেই খবর পেয়ে গিয়েছিলেন।

সীজার এমনিভাবেই সবসময়ে কাজ করতেন, শত্রু সন্দেহ করার আগেই তার ওপরে বজ্রের মতো নেমে আসতেন।

দশ বছরের মধ্যে সীজার গল্-এর আটশো শহর আচমকা আক্রমণ করে দখল করে নিলেন, তিনশো উপজাতিকে বশীভূত করলেন। গল্‌রা বীরের মতো প্রতিরোধ করেছিল। এমনকি নারী ও শিশুরাও মৃত্যুবরণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করেছিল। কিন্তু সীজারের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে এঁটে ওঠা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

সীজার বহু জাতিকে জয় ও পদানত করেছিলেন। একমাত্র গল্-য়েই হত্যা করেছিলেন দশলক্ষ মানুষ এবং দাস হিসেবে নিয়ে এসেছিলেন আরো দশলক্ষ। তাঁর সৈন্যবাহিনী উপস্থিত হলেই গ্রামের মানুষদের মধ্যে শুরু হয়ে যেত হাহাকার ও কান্না—কেননা সীজারের সৈন্যবাহিনীর রক্তপাত ও লুটতরাজ চোখের সামনে দেখতে পেত তারা। তবুও স্বীকার করতে হবে, মানুষের ইতিহাসে সীজার ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি। বহু শতাব্দী পরেও সৈন্যবাহিনীর নেতারা শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে স্বদেশকে রক্ষা করতে গিয়ে সীজারের কাছ থেকে যুদ্ধের কলাকৌশল শিখেছে।...

হ্যাঁ, রোম ছিল এক ভয়াল পাঠশালা। এটি তৈরি হয়েছিল দাসদের হাতে—এমনিতে হয়নি, নির্মাণ করতে হয়েছিল। তারপরে হাজার হাজার বছর ধরে রোমের ধ্বংসাবশেষ দেখে লোকে স্তম্ভিত হয়েছে। পয়ঃপ্রণালীর সুবিশাল তোরণগুলি দেখে তারা অবাক হয়। উঁচু উঁচু তিনটি পাথরের পুল একটির ওপরে আরেকটি দাঁড়িয়ে আছে। এই ত্রয়ীর একদিক থেকে দেখতে পাওয়া যায় দূরের পাহাড়ের পাদদেশ, তোরণের মধ্যে দিয়ে আবছা। অন্যদিকে এটি চলেছে দিগন্তের রেখা বরাবর, তার মধ্যে বিশাল বিশাল পাথরের তোরণ। এই পয়ঃপ্রণালীর সাহায্যে পার্বত্য ঝরনার শীতল জল রোমে নিয়ে আসা হতো।

ইতালিতে ও ফ্রান্সে এখানে-ওখানে দেখা যায় ছেলেমেয়েরা এখনো পাথরের ধাপের ওপরে খেলা করছে। এগুলি একসময়ে ছিল থিয়েটারের বেঞ্চি, যেখানে হাজার হাজার দর্শক একসঙ্গে বসতে পারত। রোমের ইতিহাস পড়বার সময়ে ছেলেমেয়েরা একথা জানতে পেরে অবাক হয় যে কোনোরকম যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়াই এই সমস্ত বিশাল বিশাল কাঠামো তৈরি হয়েছে।

একসময়ে রোমানরা ঠিক করেছিল ইতালিতে একটি বিশাল হ্রদ তৈরি করবে যাতে একটি জলাভূমির জল নিকাশ করা যায়। এই জলাভূমি থাকার জন্য মারাত্মক জ্বর হতো। এই জলাভূমিতে কোনোরকম ফসল ফলানো যেত না। এই প্রকল্পে কাজ করতে নেমেছিল তিরিশ হাজার লোক এবং হ্রদের নির্মাণকার্য এগারো বছরে শেষ করেছিল। হ্রদের জল গিয়ে পড়ত তাইবার নদীতে। হ্রদের চারদিক ঘিরে তৈরি হয়ে গেল সুন্দর সুন্দর উদ্যান ও ক্ষেত। জলাভূমির চিহ্নমাত্র রইল না। কিন্তু এখনকার ছেলে-মেয়েরা যখন রোমের ইতিহাস পড়ে তখন কল্পনাও করতে পারে না সেই দাসদের পাণ্ডুর মুখ, জ্বরে পুড়ে যাওয়া গা, কঙ্কালসার শরীর। প্রকল্পে

কাজ করতে করতে যে হাজার হাজার শ্রমিক মারা পড়েছিল তাদের কবরের কথা এই শিশুরা চিন্তা করতে পারবে না। সম্ভবত তাদের মনে ভেসে উঠবে সম্পূর্ণ অন্য এক চিত্র : ইতালির পরিষ্কার আকাশ আর বিশাল এক হ্রদ যার জল গিয়ে পড়ছে তাইবার নদীতে, সেখান থেকে সমুদ্রে।

কোন্ চিত্রটি ঠিক? দুই-ই। রোমের ইতিহাস বিপুল অগ্রগতি ও অশেষ ক্লেশের ইতিহাস।

৫। ইতিহাস বাদী ও প্রতিবাদী—দুই-ই

রোমের কথা যখন ভাবি তখন যেমন আমাদের মনে পড়ে গলায় ফাঁস লাগানো ও শেকল দিয়ে দঙ্গলসুদ্ধ বাঁধা দাসদের কথা, যেমন মনে পড়ে নিজেদের রক্তে স্নাত গ্লেডিয়েটরদের কথা, তেমনি মনে পড়ে অন্য সব কথাও। নিরোর কথা ভাবতে গিয়ে একই সঙ্গে মনে পড়ে তার সমকালীন মহান ও দণ্ডিত দার্শনিক সেনেকার কথা। কমোনডাসের কথা ভাবলে আমরা শিউরে উঠি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে জ্ঞানীপুরুষ মার্কাস অরেলিয়াসের কথাও।

রোম বহু জাতিকে দাস করেছিল। গ্রীসের আমলে যে স্বাধীনতা ছিল, শহরের ও নগরের যে স্বাধীনতা ছিল—রোমের আমলে তার ছায়াটুকু মাত্র অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু গ্রীক জ্ঞান ও গ্রীক শিল্প বজায় ছিল, তা রক্ষিত হয়েছিল ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য। রোমানরা গ্রীকদের একটা অবজ্ঞাসূচক ডাক নাম দিয়েছিল—'গ্রীকপুঙ্গবরা'। কিন্তু রোমানরা পড়াশুনো করত গ্রীক স্কুলে এই গ্রীকপুঙ্গবদেরই কাছে এবং অলিম্পিক ক্রীড়ায় পুরস্কার জিতে নিত। রোমান কবিরা অগ্রসর করে নিয়ে যেত হোমারের কবিতা। ভার্জিল লিখেছিলেন ট্রোজান ইনিয়াসের পর্যটন ও বিচারের কথা। ওভিদের কবিতাগুলো লেখা হয়েছিল নির্বাসনে থাকার সময়ে এবং এই সমস্ত কবিতায় প্রাচীন গ্রীকদের সরল ও মর্মস্পর্শী লোকগাথা বলা হয়েছে। মনুষ্যজাতির যে কাহিনী শুরু করেছিলেন হেরোডোটাস ও থুসাইডিডেস তা অব্যাহত রেখেছিলেন রোমান ঐতিহাসিক লিভি ও ট্যাসিটাস।

ইতিহাস শুধু বাদী নয়, একই সঙ্গে প্রতিবাদীর পক্ষেও উকিল। আমাদের ভাষা থেকেই এর সাক্ষ্য পাওয়া যেতে পারে। আমাদের ভাষার অনেক শব্দ রোমানদের ভাষা ল্যাটিন থেকে এসেছে। বিজ্ঞান আমাদের কাছে এসেছে গ্রীস থেকে রোম হয়ে। আমাদের অভিধানগুলোতে এমন শব্দ প্রচুর আছে যা রোমের পাঠশালার কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

এমনকি কয়েকটি গ্রীক ও ল্যাটিন শব্দ আমরা পেয়েছি তাদের কাছ থেকে : 'জিমন্যাসিয়াম', 'আকাদেমি', 'ল্যাবরেটরি', 'অডিটরিয়াম', 'লেকচার', 'ডকটর', 'প্রফেসর', 'স্টুডেন্ট', 'ফিজিক্স', 'ম্যাথমেটিকস' ও 'ফিলজফি'।

আমরা যদি প্রাচীন জগতের বিজ্ঞানীদের কথা ভুলে যাই তাহলে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেব। এই বিজ্ঞানীরাই তাঁদের বইয়ে মনুষ্যজাতির

অভিজ্ঞতাগুলিকে আমাদের জন্য সমাবেশ ও সংরক্ষণ করেছেন। অলস ধনী ও অলস গরিবের সেই রোমেই ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী বিজ্ঞানীরা যাঁদের শুধু দিনগুলি নয়, রাতগুলিও কাটত নিরলস শ্রমের মধ্যে।

এমনি একজন রোমান বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকার্যকারী ছিলেন প্লিনি। তদুপরি তিনি ছিলেন নৌ-সেনাধ্যক্ষ ও রাষ্ট্রনেতা। প্লিনি একটি উচ্চ-লক্ষ্যের কর্তব্য পালন করতে চাইছিলেন : প্রকৃতিতে যা-কিছু রয়েছে—আকরিক, উদ্ভিদ, জীবজন্তু,—তার সম্পূর্ণ একটি তালিকা রচনা করা।

তিনি বলেছিলেন, 'এ-কাজ আমি যদি সম্পূর্ণ করে যেতে না-ও পারি, তাহলেও কাজটা যে হাতে নিয়েছিলাম সেটাই আনন্দের।'

খেতেন ও ঘুমোতেন খুবই কম। দিনরাত ডুবে থাকতেন ভূগোলবিদ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, প্রকৃতি-বিজ্ঞানী ও ভেষজ-বিজ্ঞানীদের লেখা প্রকৃতি-বিষয়ক বইয়ের মধ্যে। বইয়ের পর বই পড়ে যেতেন, নোট নিতেন, যা পড়েছেন তাই নিয়ে চিন্তা করতেন, তার সঙ্গে নতুন কথা যোগ করতেন। তিনি নিজেও পর্যটনে ও সামরিক অভিযানে অনেক কিছু দেখতেন। অন্তত দু-হাজার বই পাঠ করেছিলেন—সবই তাঁর নিজের বৈজ্ঞানিক রচনার জন্য উপকরণ মাত্র।

ইমারতটি রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করল। বছরের পর বছর পার হতে লাগল, তিনিও খণ্ডের পর খণ্ড প্রকাশ করে চললেন। কয়েক শত খণ্ডে সম্পূর্ণ হলো তাঁর রচনা। এটি কোনোক্রমেই একটি মাত্র ভবন নয়, বরং পুস্তকের সমগ্র একটি নগর। অত্যন্ত পরিশ্রম করে এবং ধীরেসুস্থে তিনি বর্ণনা করলেন তারা ও গ্রহ, জীবজন্তু ও গাছপালা, দূরের দেশ ও প্রাচীন কাল। তিনি অনেক কিছু জানতেন। জানতেন, গ্রীষ্মকালে সূর্য আমাদের কাছে আসে না এবং শীতকালে ছেড়ে চলে যায় না, আলো শব্দের চেয়েও বেশি দ্রুত গতিতে চলে, জোয়ার ঘটিয়ে থাকে চন্দ্র ও সূর্য। কিন্তু তবুও তিনি সহজে বুঝে উঠতে পারতেন না কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা কল্পনা। তিনি ছিলেন প্রাকৃতিক ইতিহাসের হেরোডোটাস।

প্রাচীনকালের গল্পে কবন্ধদের কথা শোনা যেত, যাদের মাথা নেই, যাদের চোখ ও মুখ বুকের মধ্যে। এইসব গল্প তিনি পুনরায় প্রচার করেছিলেন। তিনি ভাবতেন শুক্লপক্ষে সমুদ্রের চিংড়ি অনেক বেড়ে যায়। মনে করতেন, সারমেয় তারামণ্ডলের জন্য সমুদ্রে ঝড় ওঠে এবং সুরা গেঁজে ওঠে। তখনো ভাবতেন, মানুষের সুবিধার জন্যই সমগ্র প্রকৃতির সৃষ্টি। গাছের সৃষ্টি বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য। সেটি এই যে আমরা যেন পেতে পারি ফল, সুরা, জলপাই তেল, গৃহ ও জাহাজ নির্মাণের জন্য কাঠ। লোহা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে, সোনা মানুষকে কলুষিত করার জন্য।

প্লিনি বলেছিলেন, 'সোনার খোঁজে আমরা সারা জগত ঘুরে বেড়াই, যে জমির ওপরে আমাদের বাস সেই জমির মধ্যে সুড়ঙ্গ খনন করি, আর তারপরে অবাক হয়ে ভাবি কেন মাঝে মাঝে আমরা ভূমিকম্প পাই, কেন পৃথিবী পাল্‌টা লড়াই চালায়।' এই ছিল ভূমিকম্পের ব্যাখ্যা—লোভী মানুষের অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে পৃথিবীর লড়াই।

মানুষের কাজে লাগা, এটাই সবকিছুর উদ্দেশ্য।

কিন্তু মানুষ সম্পর্কে খুব একটা উঁচু ধারণা ছিল না প্লিনির। বলতেন,

বন্য জন্তুর চেয়েও মানুষ খারাপ—কেননা, এমনকি সিংহরাও কখনো নিজেদের মধ্যে লড়াই করে না। আর মানুষ সবসময়েই তার সাথী মানুষদের সঙ্গে লড়াই করছে। আর মানুষই হচ্ছে একমাত্র জীব যে আত্মম্ভরী ও লোভী। আর এমনটি হওয়া খুবই সম্ভব যে সেনেটে, সম্রাটের দরবারে ও সার্কাসে যে-সব মানুষের সঙ্গে প্লিনির সাক্ষাৎ হয়েছিল তারা কেউ-ই তাঁর প্রশংসা লাভের যোগ্য ছিল না। কিন্তু প্লিনি নিজেই ছিলেন জীবন্ত প্রমাণ যে রোমে অন্য ধরনের মানুষও ছিল—যেমন তাঁর কর্মনিষ্ঠ জীবন-কালে, তেমনি তাঁর মৃত্যুতে।

তাঁর ভাইপো ছোট-প্লিনি ইতিহাসবিদ ট্যাসিটাসের কাছে তাঁর সম্পর্কে যে-চিঠি লিখেছিল তা এই :

'আপনি আমার কাকার মৃত্যু সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। তাঁর সৌভাগ্য যে তিনি একটি বিরাট রচনা সম্পূর্ণ করেছেন এবং চমৎকার সব বই লিখেছেন। ভাগ্যের এক অসাধারণ যোগাযোগ এই যে একটি সুন্দর স্থান যে-সময়ে ধ্বংস হয় তখনই তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর স্মৃতি অমর হয়ে থাকবে।

'আমার কাকা যে নৌবহরের অধিনায়কত্ব করতেন, ঘটনাচক্রে সেই নৌবহরের সঙ্গে তিনি ছিলেন মিসা অন্তরীপে। ২২শে আগস্ট তারিখে লোকের মুখে শুনলেন, তারা একটি অদ্ভুত চেহারার মেঘ দেখেছে। মেঘটির আকার সুবিশাল এক পাইনগাছের মতো, তার গুঁড়ি আকাশে পৌঁছেছে, তার ডালগুলি সমস্ত দিকে ছড়িয়েছে। বিজ্ঞানী যেমন নতুন কিছু দেখার জন্য উদগ্রবকমের তাড়াহুড়ো করে তেমনি করলেন তিনি, লোকজনকে হুকুম দিলেন যে-জায়গায় তারা এই আশ্চর্য ব্যাপারটি ঘটতে দেখেছে সেই দিকে এই মুহূর্তে জাহাজ ভাসিয়ে দিতে। আর ঠিক এই সময়ে ভিসুভিয়াসের পাদদেশের এলাকা থেকে একটি চিঠি এসে হাজির। চিঠিতে প্রার্থনা জানানো হয়েছে তিনি যেন সাহায্য করার জন্য চলে আসেন।

'সুতরাং পুরো নৌবহরটিকে আবার ঘুরে গিয়ে মহাদেশের দিকে ফিরে আসতে হলো। আমার কাকার জাহাজ সরাসরি গিয়ে পড়ল একেবারে বিপদের মধ্যে। সম্পূর্ণ বিপর্যয়টি তিনি জাহাজের ডেক থেকে লক্ষ্য করলেন এবং নিজের সচিবের কাছে তার একটি বিবরণ মুখে মুখে বলে গেলেন। ধ্বংসকান্ড যেখানে ঘটছে তার আরো কাছাকাছি আসতেই তাঁর জাহাজের ওপরে আরো বেশি-বেশি ও আরও ঘন-ঘন এসে পড়তে লাগল ছাই ও জ্বলন্ত লাভার আস্তরণ। টুকরো টুকরো লাভা তাঁর গায়েও এসে পড়ল। স্টাবিয়ায় এসে তিনি তীরে নামলেন। চারদিকে তখন ঘন অন্ধকার। ভিসুভিয়াস থেকে আগুনের লেলিহান শিখা আকাশের দিকে লাফিয়ে উঠছে। হঠাৎ প্রচন্ড এক ভূমিকম্পে পৃথিবী কেঁপে উঠল। প্লিনি ও তাঁর দলের লোকেরা যে-বাড়িতে ছিল সেই বাড়িটা কেঁপে উঠে ভেঙে পড়তে লাগল।

'প্রত্যেকে ছুটে বেরিয়ে এল। তারা সকলে বালিশ দিয়ে মাথা চাপা দিয়েছিল যাতে বাইরের শিলাবৃষ্টি থেকে বাঁচা যায়। অন্যদের মতো আমার কাকাও চেষ্টা করছিলেন উগ্র ধোঁয়া ও আগুন থেকে নিজেকে বাঁচাতে, কিন্তু হঠাৎ মাটিতে পড়ে গেলেন। তিনি সম্পূর্ণ নিস্তেজ হয়ে

গিয়েছিলেন। অন্যদের সাহায্য নিয়ে কোনোরকমে একবার উঠে দাঁড়ালেন, তারপরেই পড়ে গেলেন—তাঁর মৃত্যু হয়েছিল...'

এই ছিল আগ্নেয়গিরির সেই বিরাট উদ্‌গীরণ ও ভূমিকম্প যার ফলে হারকিউলেনিয়াম ও পম্পেই শহরদুটি ছাইয়ে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল।

ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি ভিসুভিয়াসের চারদিকে শত-শত বছর ধরে মানুষ বাস করে আসছিল। অন্যান্য দিনের মতো এই বিশেষ দিনের সকালেও যে-যার কাজে ব্যস্ত ছিল। নাপিতের দোকানে পালা আসার জন্য লোকে অপেক্ষা করছে, চটিতে সৈনিকরা পান করছে, ক্রেতাদের জন্য পসরা সাজিয়ে বণিকরা তাদের দোকানের কাছে বসে আছে। মেয়েরা দ্রুত পা চালিয়ে বাজারের দিকে চলেছে, গ্রাম থেকে চাষীরা এসেছে ডিম ও মুরগি বিক্রি করতে। রুটি যারা তৈরি করে তারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের বেকারিতে—চুল্লি থেকে সদ্য বার করে আনা গোল গোল রুটির স্তূপের মাঝখানে। জুতো যারা তৈরি করে তারা খদ্দেরদের পায়ের মাপ নিচ্ছে। মাটির পাত্র যারা ফেরি করে তারা নিজেদের পসরা বিক্রির জন্য রাস্তায় ঘুরে ঘুরে হাঁক দিচ্ছে।...

কে ভাবতে পেরেছিল ফুল ও পাতা দিয়ে সাজানো এই নগর আর মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই গনগনে লাল ছাইয়ের পুরু আস্তরণের নিচে সম্পূর্ণ চাপা পড়ে যাবে? কে ধারণা করতে পেরেছিল যে প্রাণে বাঁচবে যে অল্প কয়েকজন তারা দিনকয়েক পরে ছাইয়ের গাদার মধ্যে আঁতিপাতি করে নিজেদের আগেকার ঘরবাড়ির সন্ধান করবে?

প্রকৃতি মানুষের কাছে এই আকস্মিক বার্তা পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়েছে মানুষ কত ক্ষুদ্র, কত অসহায়।

আর এই যে নৌ-অধিনায়ক, যিনি তাঁর নৌবহরকে ধ্বংসের মুখে দাঁড়ানো নগরের কাছে নির্ভয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর সাহসকে প্রশংসা করতে পারবে না এমন কে আছে? আগুন ও ছাই তাঁর মাথার ওপরে বর্ষিত হয়েছিল, কিন্তু তবুও প্লিনি পিছু হটেননি। নৌ-অধিনায়ক হিসেবে তাঁর কর্তব্যের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আনুগত্যে অবিচল থেকে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

এমন সময় আসবে যখন এমনকি আগুন ও বন্যার এই সমস্ত অ-বশীভূত শক্তির খবরদারি ও আয়ত্তীকরণের জন্য মানুষ বিজ্ঞানকে নিয়োগ করবে।

সপ্তম অধ্যায়

উড্ডয়ন ও পতন

১। সমুদ্রের ওপরে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে মানুষের পর্যটন

মানুষ ক্ষুদ্র জীব এবং সংক্ষিপ্ত তার জীবন। তার সামনে বিস্তৃত রয়েছে ধারণায় আনা যায় না এমন বিশাল মহাকাশ, ধারণায় আনা যায় না এমন দীর্ঘ সময়।

ছোট ছোট পা ফেলে নিজের পথে কতদূর সে যেতে পারে? পৃথিবীতে তার বরাদ্দ স্বল্প সময়ের মধ্যে বেশি কিছু কি সে করতে পারে?

কিন্তু মানুষ তো একা হয়ে নেই। সেখানেই তার শক্তি।

আগুন জ্বালিয়ে বা মশাল ধরিয়ে যখন পাহাড় থেকে পাহাড়ে খবর পাঠানো হয় সেই খবর ছোটে সবচেয়ে দ্রুত ধাবমান রেসের ঘোড়ার চেয়েও দ্রুত গতিতে। মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে সেই খবর যতোটা এলাকা পার হয়, তার জন্য দ্রুত ধাবমান ঘোড়ার সময় লাগে বহুদিন। ঠিক একই ব্যাপার ঘটে দেশের ক্ষেত্রে শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হতে গিয়ে—শ্রমের খবর, শিল্পী মনীষী ও বীরদের বিজয়ের খবর পৌঁছে যায় বংশ থেকে বংশে, জাতি থেকে জাতিতে।

সারা বিশ্বে পর্যটন করার, সারা বিশ্বের সকল রাস্তার পরিমাপ নেবার আশা কি একজন মানুষ করতে পারে? কিন্তু প্রাচীন রোমে সমগ্র এক বৃহৎ সাম্রাজ্যের পরিমাপ নেওয়া হয়েছিল। ভূগোলবিদরা মানচিত্রের ওপরে সমস্ত শহর চিহ্নিত করেছিল, পরিমাপবিদরা শহর থেকে শহরের দূরত্ব নির্দেশ করেছিল। এ-কাজে সময় লেগেছিল পঁয়ত্রিশ বছর। শেষপর্যন্ত তৈরি হয়েছিল লম্বা এক গোটানো পুঁথি যাতে রোমের দিকে আসা সমস্ত রাস্তা নির্দেশিত ছিল। প্রত্যেকটি নগর বোঝানো হয়েছিল দুটি ছোট বাড়ি দিয়ে, আঁকাবাঁকা দাগ টেনে বোঝানো হয়েছিল এক সরাইখানা থেকে অপর সরাইখানার দূরত্ব। একজন পর্যটক এই মানচিত্রের দিকে তাকিয়েই বুঝে নিতে পারত কত হাজার ফুট পেরিয়ে এবং কত দিন পর্যটন করার পারে সে পৌঁছতে পারবে স্পার্টা থেকে আর্গোস-এ, আর্গোস থেকে কোরিন্থ-এ।

ভূ-ভাগে ফুটের মাপে দূরত্ব নির্ণয় করাটা যদি দুরূহ হয়, তাহলে সমুদ্রে তা নির্ণয় করা আরো অনেক বেশি শক্ত। সমুদ্রে রাস্তা খুঁজে পাওয়ার উপায় কী? পর্যটক যাতে সমুদ্রে গিয়েও নিজের অবস্থান জানতে পারে সেজন্য টায়ারের মেরিনাস সর্বপ্রথম মানচিত্রের ওপরে কল্পিত মধ্যরেখা

ও সমাক্ষরেখা টানলেন। এই রেখাগুলির অস্তিত্ব কেবলমাত্র মানচিত্রের ওপরে, আসল সমুদ্রে তাদের কোনো চিহ্নই নেই।

আর সারাটা সময় এই বিশ্ব বড়ো থেকে আরো বড়ো হয়ে উঠছিল। খুব বেশি কাল আগের কথা নয়, রোমানরা ভাবত ব্রিটেন বলে কোনো দ্বীপ নেই, ব্রিটেন নিয়ে সমস্ত কাহিনী—এমনকি ব্রিটেন নাম পর্যন্ত—নিছক কল্পনাপ্রসূত। তারপরে, কয়েক বছরের মধ্যেই, সীজার তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে দু-বার এই দ্বীপে গিয়েছিলেন। খুব বেশি কাল আগের কথা নয়, রোমানরা ভাবত সারা বিশ্বের সীমানা হচ্ছে মহাসাগর। তারা চেয়েছিল রোমেরও সীমানা হোক এই মহাসাগর। তবুও কিন্তু রোমান ভূগোলবিদ স্ট্রাবো অনুমান করেছিলেন মহাসাগরের ওপারে জনবসতিপূর্ণ দেশ আছে। পর্যটক জুবা এই সমস্ত দেশের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিলেন। তিনি ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেছিলেন, সেখানে নারকেল ও তালগাছ দেখতে পেয়েছিলেন—কোনো মানুষ দেখতে পাননি। সবচেয়ে বড়ো দ্বীপটিতে তেনেরাইফ আগ্নেয়গিরির মাথার ওপরে দেখতে পেয়েছিলেন পতাকার মতো ঝুলে থাকা একখণ্ড মেঘ। মানুষের সন্ধানে সমস্ত দ্বীপে চুঁড়ে বেরিয়েছিলেন, কিন্তু ছেড়ে-যাওয়া ঘরবাড়ির কিছু চিহ্ন ছাড়া আর কিছু তাঁর নজরে পড়েনি। তাঁকে দেখে কুকুরগুলো ঘেউ-ঘেউ করছিল,—ছেড়ে-যাওয়া ঘরবাড়ি তখনো পর্যন্ত পাহারা দিচ্ছিল এই কুকুরগুলো। তার মানে, মহাসাগর পেরিয়ে এই দ্বীপেও মানুষের বসবাস ছিল।

তারও ওপারে কী আছে? আরো দেশ আছে কি?

দার্শনিক সেনেকা একবার লিখেছিলেন, এমন দিন আসছে যখন মহাসাগর তার শেকল চূর্ণ করবে এবং সমুদ্রের ওপারে নতুন নতুন দেশ আবিষ্কৃত হবে। তখন আর থুলেকে জগতের কিনারা হিসেবে গণ্য করা হবে না।

তাই সারা পৃথিবীর বুকে মানুষের পা পড়ছে।

সময়ও তাকে ডাক দিয়েছিল, যদিও সময়ের মধ্যে দিয়ে পা ফেলে ফেলে চলাটা দেশের মধ্যে দিয়ে পা ফেলে ফেলে চলার চেয়ে আরো দুরূহ। বাবিলনীয়রা সূর্যঘড়ি ও জলঘড়ি আবিষ্কার করেছিল। এথেনীয়রা বায়ুস্তম্ভের ওপরে একটি ঘড়ি স্থাপন করেছিল, যাতে পথচারীরা এক পলক তাকিয়েই দিনের সময় ও সমুদ্রে বাতাসের গতি জেনে নিতে পারে। কিন্তু এই ঘড়িগুলো সবসময়ে একই রকম হতো না, কেননা গ্রীষ্মকালে দিন হতো শীতকালের দিনের চেয়ে বড়ো, আর দিনের মাপ নেওয়া হতো দিনের আলো শুরু হবার সময় থেকে অন্ধকার শুরু হবার সময় পর্যন্ত। এই কারণে শীতকালের ঘন্টা গ্রীষ্মকালের ঘন্টার চেয়ে ছোট ছিল।

তাছাড়া ছিল পঞ্জিকা। বাবিলনীয়রা বহুকাল আগেই বছরকে ভাগ করেছিল তিরিশ দিনের এক-একটি মাসের বারো মাসে। আর মাইলেটাসের থালেস জানতেন যে ৩৬৫¼ দিনে বছর হয়। কিন্তু মাস ও সপ্তাহ সাজাতে গিয়ে লোকে তখনো গোলমাল করে ফেলতে লাগল। মাস ও সপ্তাহ-গুলিকে ঠিকভাবে গুছিয়ে তোলার ভার দেওয়া হলো রোমান পুরোহিতদের ওপরে। কিন্তু তাঁরাও সমস্ত গুলিয়ে ফেললেন। দু-ধরনের বছর তৈরি করলেন তাঁরা—একটি বছরে মাস বারোটি, অপর বছরে তেরোটি। একটি বছর

৩৫৬ দিনে, অপর বছর ৩৭৭ দিনে। ফলে, কখনো কখনো এমনও হতে লাগল যে বছরের প্রথম দিনটি পড়ছে অক্টোবর মাসের পনেরো তারিখে, শরৎকালে শুরু হয়ে যাচ্ছে শীতকাল, বসন্তকালে গ্রীষ্মকাল। পুরোহিতরা পথ হারিয়েছিলেন, বিজ্ঞান ও সূর্য উভয় বিষয়েই।

এই গোলমেলে অবস্থা ঠিকঠাক করার জন্য আলেকজান্দ্রিয়ার জ্যোতির্বিজ্ঞানী সোসিগেনেসকে হুকুম দিলেন সীজার। সোসিগেনেস সবকিছু ঠিকঠাক করে তুললেন এবং একটি বর্ষপঞ্জিকা তৈরি করলেন। এই বর্ষপঞ্জিকায় বছর বারো মাসে, ৩৬৫ দিনে। আর সিকি-দিনটি হিসেবের মধ্যে আনার জন্য তিনি নির্দেশ দিলেন, প্রতি চতুর্থ বছরে ফেব্রুয়ারি মাসে একটি দিন বেশি থাকবে।

কিন্তু শুধু বর্তমান কাল ঠিকঠাক হলেই লোকে সন্তুষ্ট হচ্ছিল না। তারা জানতে চাইছিল তাদের জন্ম হবার আগে দূর অতীতে কী ঘটেছিল। ভূগোলবিদ স্ট্রাবো নিজেকে এই প্রশ্ন করেছিলেন : এই পৃথিবী এখন যেমন চিরকালই কি তাই? না, তিনি নিজেই জবাব দিলেন, পৃথিবী সব সময়েই বদলাচ্ছে। তীরভূমির রেখা এখন যতোটা আগে তার চেয়েও দীর্ঘ ছিল। এখন যেখানে পর্বত আগে একসময়ে সেখানে ছিল সমুদ্র। আগ্নেয়গিরির উদ্‌গীরণের ফলে কখনো কখনো মহাসাগরের তলদেশ থেকে দ্বীপ উঠে আসে। যেমন উঠে এসেছে সিসিলি, মাউন্ট এট্‌নার উদ্‌গীরণের ফলে। মহাদেশ কেমনভাবে হলো তাও ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন স্ট্রাবো। তিনি সন্ধান করেছিলেন বৃহৎ জগতের চাবিকাঠি এবং তাঁর খোঁজ পেয়েছিলেন ক্ষুদ্র জিনিসের জগতে। মিশরে গিজার পিরামিড যে চুনাপাথরে তৈরি সেটি তিনি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং জানতে পেরেছিলেন চুনাপাথর গঠিত সমুদ্রের কাঁকড়া ও শামুকের খোলা থেকে। হাজার হাজার বছর ধরে এই খোলাগুলি সমুদ্রের তলদেশে পড়েছে এবং শেষপর্যন্ত হয়ে উঠেছে বিরাট এক স্তূপ। তখন মহাসাগরের উপরিতলে জেগে উঠে শুকনো জমি হয়ে গিয়েছে।

২। পৃথিবীর ওপরে পরিক্রমা

জগতের ওপরে রোম অনেক উঁচুতে উঠেছিল। সমস্ত চোখ ছিল তার দিকে। রোমান কবি ওভিদ একটি কাহিনী লিখেছিলেন ফীটন সম্পর্কে, যে আকাশে উঠতে পারত এবং উঁচু থেকে নিচের জগৎ অবলোকন করত। ফীটনের মা ছিলেন নশ্বর মানবী, পিতা সূর্যের দেবতা ফীবাস—যিনি চার ঘোড়ার রথ চালিয়ে আকাশ পরিক্রমা করতেন। ফীটন প্রায়ই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত ফীবাস চার ঘোড়ার রথ ছুটিয়ে আকাশ-পথে চলেছেন। দেখে তার ইচ্ছে হতো পিতার রথটি চালিয়ে সে নিজেও এমনি ছুটে চলে।

পিতার দরবারে হাজির হলো ফীটন, কিন্তু চোখধাঁধানো দীপ্তিতে অন্ধ হয়ে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। ফীবাস বসে আছেন ঝকমকে একটি সিংহাসনের ওপরে। তাঁর ডাইনে ও বাঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঘণ্টা ও মাস, বছর ও শতাব্দী। বসন্তের মাথায় ফুলের মুকুট। তার পাশে শরৎ,

আঙুরের লাল রসে রাঙানো। বৃদ্ধ শীতের পাশে দাঁড়িয়ে আছে কোমরে পাকা ফসলের বলয় পরা তরুণ গ্রীষ্ম।

ফীবাস জিজ্ঞেস করলেন, 'পুত্র ফীটন, কী চাও তুমি?'

ফীটন বলল, 'মা যদি ঠিক কথা বলে থাকেন তাহলে তুমি আমার পিতা। আমি তোমার কাছে জানতে চাই মা ঠিক বলেছেন কিনা।'

তার পিতা নিজের মাথা থেকে দীপ্ত কিরণের মুকুটটি সরিয়ে নিলেন, এবং পুত্রকে আরো কাছে আসতে বললেন। তারপরে ফীটনকে আলিঙ্গন করে বললেন, 'তোমার মা ঠিক কথাই বলেছেন আর তোমার কাছে তার প্রমাণ দেবার জন্য আমি কথা দিচ্ছি তুমি যা চাইবে তাই আমি তোমাকে দেব।'

কথাগুলি তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসা মাত্র ফীটন তার পিতার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমি ঠিক একটা দিন তোমার ঘোড়াগুলি ছুটিয়ে যেতে চাই।'

কথাটা শুনে এমনভাবে কোনো ভাবনাচিন্তা না করে কথা দিয়ে ফেলার জন্য তার পিতা দুঃখিত হলেন। তখন, ছেলে যাতে তার প্রার্থনা ফিরিয়ে নেয় সেজন্য বুঝিয়ে শুনিয়ে তাকে রাজী করাতে চেষ্টা করলেন।

কিন্তু ছেলে কোনো কথা শুনতে রাজী নয়। এই নিয়ে বহুক্ষণ ধরে দুজনের মধ্যে বাদানুবাদ চলল। কিন্তু তারপরে আর বিতর্ক চালাবার মতো সময়ও থাকল না। কেননা ততোক্ষণে ঊষার দেবী, গোলাপী আঙুল বিশিষ্ট অরোরা, পূর্বদিকের তোরণ খুলতে শুরু করে দিয়েছিলেন। অস্থির ঘন্টা ও মিনিটগুলি ঘোড়াগুলিকে বাইরে বার করে আনছিল, যে ঘোড়াগুলি ঝকমকে রথটিকে আকাশ দিয়ে টেনে নিয়ে যাবে। ফীটন যাতে আগুন থেকে রক্ষা পায় সেজন্য তাকে একটি অলৌকিক পোশাক উপহার দিলেন ফীবাস, এবং নিজের মাথা থেকে সোনালী কিরণগুলি সরিয়ে নিয়ে পুত্রের মাথায় বসিয়ে দিলেন। তারপরে গভীর দুঃখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন, কেননা তিনি নিশ্চিতই জানতেন পুত্রকে ঘোর বিপদের মধ্যে পড়তে হবে। পুত্রকে সাবধান করে দিলেন রথ যেন খুব উঁচু দিয়ে না চালায়, তাহলে আকাশে আগুন লেগে যেতে পারে; রথ যেন খুব নিচু দিয়ে পৃথিবীর কাছাকাছি না চালায়, তাহলে পৃথিবী ও সেইসঙ্গে পৃথিবীর সবকিছু পুড়ে শেষ হয়ে যেতে পারে।

বললেন, 'পথের ঠিক মাঝখানটি দিয়ে চলবে, যেখানে দেখতে পাবে রথের চাকার দাগ রয়েছে।'

ইতিমধ্যে পশ্চিমদিক দিয়ে রাত্রি দৃষ্টির আড়ালে নেমে গিয়েছে, পূর্বদিক দিয়ে উঠে এসেছে ঊষা। পুত্রকে তার এই উন্মত্ত প্রয়াস থেকে বিরত করার জন্য পিতা আরো একবার অনুনয় করলেন। কিন্তু কান্ডজ্ঞানহীন পুত্র ততোক্ষণে রথের লাগাম হাতের মুঠোয় নিয়ে নিয়েছে। হ্রেষাধ্বনি তুলে ঘোড়াগুলি ছুট লাগাল। মহাসাগরের দেবী তোরণ খুলে দিলেন। তখন আর ফীটনের সামনে দূরবিস্তৃত খোলা আকাশ ছাড়া আর কিছু নেই।

তারই মধ্যে ডুব দিয়ে চলেছে ঘোড়াগুলি। নীল আকাশে পা ফেলে ফেলে ছুট লাগিয়েছে পুবের বাতাসের চেয়েও দ্রুত। উঁচুদিকে রাস্তাটি খাড়া, কিন্তু সারা রাত বিশ্রামের পরে ঘোড়াগুলি এখন সতেজ, খাড়া রাস্তা লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে চলল। ঘোড়াগুলি বুঝতে পেরেছে রথ আজ

অস্বাভাবিক রকমের হালকা, কেননা ছেলেটির ওজন খুব বেশি নয়। জাহাজে যদি ভার না থাকে তাহলে যা হয়, রথেরও সেই অবস্থা—অনবরত লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে আর এদিক-ওদিক দুলছে। ঘোড়াগুলি ব্যাপারটা যেই টের পেয়ে গেল অমনি বাঁধা সড়ক ছেড়ে বেরিয়ে এল। এবারে আতঙ্ক হলো ফীটনের, কোন্ পথে যাবে সে জানে না। সপ্তর্ষির তারাগুলি গলতে শুরু করেছে। মেরুবৃত্তের ওপরে ড্রাগন তার হিমশীতলতার মধ্যে সব-সময়ের ঝিমিয়ে থাকা অবস্থা থেকে চমকে জেগে উঠছে।

ফীটন নিচের দিকে তাকাল। নিচে, অনেক নিচে ছড়িয়ে রয়েছে পৃথিবী। তার হাঁটু কাঁপছে, গাল ফ্যাকাশে, চোখের সামনে সবকিছু অন্ধকার। পিতার অবাধ্য হয়েছে বলে এখন তার দুঃখ হচ্ছে। মনে হচ্ছে, এই রথ কখনো না চালালেই ভালো হতো। পিছন ফিরে তাকাল। পিছনে দীর্ঘ রাস্তা, কিন্তু সামনের রাস্তা আরো দীর্ঘ। কী করবে সে?

ঘোড়াগুলি সামলাবার ক্ষমতা তার নেই। ঘোড়াগুলির নাম সে জানে না, লাগাম ধরে ঘোড়াগুলিকে চালিয়ে নিয়ে যেতে সে অপারগ। আতঙ্কে ডাইনে-বাঁয়ে তাকাল। চারদিকে শুধু দানব। তাকে গ্রাস করার জন্য বৃশ্চিক তার আঁশওলা থাবা বাড়িয়ে দিয়েছে। ছেলেটি তখন আর মাথা ঠিক রাখতে পারল না, হাত থেকে লাগাম ছেড়ে দিল। লাগাম আলগা হতেই টের পেয়ে গেল ঘোড়াগুলি আর খুশিমতো চারদিকে ছোটাছুটি করতে লাগল—কখনো ওপরে তারাগুলির মধ্যে, কখনো নিচে পৃথিবীকে প্রায় ছুঁয়ে। চন্দ্র তার ভাইয়ের রথের এমন অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। ইতিমধ্যে পৃথিবী ধোঁয়ার মেঘে ডুবে গিয়েছে, পর্বতের চুড়ো থেকে ঝলক দিয়ে উঠছে আগুনের শিখা, অরণ্য ও ক্ষেতে আগুন জ্বলছে, সবুজ চারণভূমি মুহূর্তের মধ্যে পুড়ে ছাই, শহর ও দুর্গ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, গোটা গোটা দেশ আগুন গ্রাস করে নিচ্ছে।

ককেসাসে আগুন জ্বলছে, মাউন্ট এট্‌না আগুনের শিখা উগরে দিচ্ছে, হিমে জমে থাকা সাইথিয়া উত্তপ্ত লাল, আল্‌পসের ঢালু তৃণভূমি আগুনের মতো জ্বলছে। সারা জগৎ জুড়ে আগুন। বাতাস হয়ে উঠেছে চুল্লির মতো গা-ঝলসানো গরম। পায়ের নিচে ফীটনের রথও গরম হয়ে উঠছে। ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসার মতো অবস্থা, আগুনের ফুলকি গায়ে এসে পড়ছে। ঘোড়াগুলি যে কোথায় ছুটে চলেছে সে সম্পর্কে এখন আর তার কোনো ধারণাই নেই।

লোকে বলে, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত লিবিয়া মরুভূমি হয়ে আছে। মহাসাগরের জল এত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল যে সমস্ত মাছ জীবন্ত সেদ্ধ হওয়া থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য সমুদ্রের তলদেশে চলে গিয়েছিল। সমুদ্রের দেবতা তিনবার জল থেকে মাথা তুলেছিল শুধু দেখবার জন্য চারদিকে কী ঘটছে। কিন্তু তাকে আবার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ডুবিয়ে নিতে হয়েছিল। এমনকি মহাসাগর-বেষ্টিত পৃথিবী পর্যন্ত হাঁটুজলের গভীরতা পর্যন্ত সমুদ্রের জলে হেঁটে গিয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জিউস-এর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিল :

'সারা বছর ধরে আমি তোমার জন্য কাজ করেছি—তার পুরস্কার কি তুমি এইভাবেই আমাকে দিতে চাও? আমার শরীরে লাঙলের ক্ষত আমি

ভোগ করি—সেটা এজন্য যে আমি যেন মানুষকে শস্য ও ফল খাওয়াতে পারি। আমার ওপরে, বা আমার ভাই সমুদ্রের অধিপতির ওপরে, যদি তোমার করুণা না থাকে, তাহলে অন্ততপক্ষে আকাশকে করুণা করো—যে আকাশে তুমি রাজত্ব করো। আকাশ যদি ধ্বংস হয় তাহলে দেবতারা তাদের গৃহ হারাবে। এখনই যা অবস্থা, অ্যাটলাস আর তার কাঁধের ওপরে ভার রাখতে পারছে না। পৃথিবী ও সমুদ্র ও আকাশ যদি ধ্বংস হয় তাহলে আবার সেই শূন্যতার অবস্থায় ফিরে যেতে হবে। যা আছে তাকে তুমি বাঁচাও।'

পৃথিবীর প্রার্থনা জিউস শুনলেন। স্বর্গ থেকে এসে তাঁর বজ্র নিক্ষেপ করলেন। ঘোড়াগুলি জোয়াল থেকে ছাড়া পেয়ে গেল। রথ চুরমার। বেচারী ফীটন খসে-পড়া তারার মতো নিচের দিকে ছিটকে পড়ল। এরিদানুসের বিরাট নদী কোলে তুলে নিল তাকে। জলদেবীরা তার মুখ ধুয়ে দিয়ে তাকে সমাধি দিল। সমাধির ওপরে পাথরের ফলকে লিখে রাখল :

'ফীটনের দেহ এখানে শায়িত রয়েছে। ফীটন
এতই সাহসী ছিল যে তার পিতার রথ চালিয়েছিল।
বড়ো বেশি সাহস দেখিয়েছিল সে, এই হঠকারিতাই
তার পতনের কারণ।'

প্রাচীন শিশুসুলভ কাহিনীর সঙ্গে ওভিদ জুড়ে দিতেন নতুন বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু তিনি জানতেন তার কাহিনীগুলি অতিকথা ছাড়া কিছু নয়। রোমে অন্য লেখকরা রচনা করছিলেন কবিতা—দেবতা বা বীরদের সম্পর্কে নয়, প্রকৃতির রহস্য নিয়ে গবেষণা করছে যে বিজ্ঞানীরা তাঁদের সম্পর্কে।

গ্রীক দার্শনিক এপিকিউরাস প্রাচীন ক্ষয়-ধরা ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস দেখিয়েছিলেন—তাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন কবি লুক্রেটিয়াস কারুস :

দেবতাদের সম্পর্কে কথা, কিংবা
আকাশ থেকে নেমে-আসা বিদ্যুতের বজ্রকণ্ঠ—
কোনো কিছুই তাকে ভয় দেখাতে পারেনি।
বরং তার নির্ভীক আত্মাকে করে তুলেছে
শক্ত গরাদগুলি ভাঙবার জন্য এগিয়ে যেতে আরো সাহসী।
যে গরাদগুলির পিছনে লুকিয়ে আছে প্রকৃতির রহস্য।
আর তার সাহসী আত্মা নিয়ে গেল তাকে বিজয়ের দিকে।
তার আবির্ভাব ঘটল আগ্নেয় জগতের সীমানার ওপার থেকে...

লুক্রেটিয়াস তাঁর গুরুকে অনুসরণ করলেন তাঁর সাহসের মধ্যে, সমস্ত প্রাচীন বাধানিষেধ অমান্য করার মধ্যে। তাঁর গুরু তাঁকে চালিত করলেন জগতের অনন্ত পথে :

আত্মার আতঙ্কগুলি বিলীন হয়ে যায়
জগতের দেয়ালগুলি ভেঙে পড়ে
সে দেখতে পায় বস্তুর রূপ, আর
জগতের অনন্ত বিস্তার।

লুক্রেটিয়াসের রাস্তায় দেয়াল ছিল একটি নয়, সীমানা ছিল একটি নয়—বহু। এই রাস্তা শুরু হয়েছিল সময়ের সেই অন্ধকার গভীরে যখন শূন্যতা ছাড়া আর কিছু ছিল না, যখন না ছিল সমুদ্র, না জমি, না আকার, এই জগতের সঙ্গে মিল আছে এমন কিছুই যখন ছিল না। পরমাণুগুলি উন্মত্তের মতো আবর্তিত হচ্ছিল, এই ছাড়া-ছাড়া অবস্থায়, এই জোড়া-জোড়া অবস্থায়, এই পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি করার অবস্থায়। লুক্রেটিয়াস সাহসের সঙ্গে প্রথম সীমানাটি পার হয়ে গেলেন। দেখতে পেলেন কেমনভাবে আবর্তমান পরমাণুগুলি জোট বাঁধছে। ভারী পরমাণুগুলি জোট বেঁধে তৈরি হলো পৃথিবী, হালকা পরমাণুগুলি জোট বেঁধে তৈরি হলো সূর্য চন্দ্র ও তারা।

হীরকের মতো ঝিকিমিকি হ্রদ
এখানে ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে
সবুজ প্রান্তর ও অরণ্যের মাঝে।
সারা পৃথিবী এমন নিথর, যেন ধোঁয়ার মেঘে মোড়া।
এই কুয়াশা থেকে বেরিয়ে স্বর্গীয় ইথার
ওপরের বাতাসে উঠে গেল।

এবারে লুক্রেটিয়াস দ্বিতীয় সীমানার কাছে উপস্থিত হলেন, যখন শুকনো জমি মহাসাগর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। দেখলেন, জল থেকে বেরিয়ে এল পৃথিবী, যে পৃথিবী থেকে তখনো আর্দ্রতা ঝরে পড়ছে। তৈরি হলো নিচু জমি ও উঁচু জমি, গিরিচূড়া ও গিরিখাত ঘিরে মাঠ ও প্রান্তর।

লুক্রেটিয়াস তৃতীয় সীমানার কাছে উপস্থিত হলেন, যখন জৈব বস্তু অজৈব বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। ব্যাপারটা কী ঘটছে তা যুক্তি দিয়ে বোঝার আগেই কবির জীবন্ত কল্পনা নিয়ে এই গভীর খাদ পার হয়ে গেলেন। প্রথমে এই ছবিটি আঁকলেন যে পৃথিবী ঘাস ও ঝোপঝাড়ে আবৃত হচ্ছে, যেমন পশু আবৃত হয় লোমশ পশমে। আঁকলেন, সূর্যের উষ্ণ কিরণ ও বৃষ্টির পেলব আর্দ্রতার কল্যাণে জীবন্ত জীবের আবির্ভাব হচ্ছে। পৃথিবী প্রকৃত অর্থেই জননী বসুন্ধরা। সঠিক অনুক্রম মেনে পর-পর দেখা দিতে লাগল প্রথমে জন্তুজানোয়ার, তারপরে পাখি, তারপরে মানুষ।

প্রথম মানুষরা ছিল দানব, তাদের না ছিল হাত, না পা, না মুখ, না চোখ। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে হেরে গিয়ে এই দানবরা বিলুপ্ত হলো। কিন্তু টিকে থাকার সম্ভাবনা যাদের মধ্যে বেশি ছিল তারা বেঁচে রইল। সিংহ বেঁচে গেল তার সাহসের জন্য, শেয়াল তার ধূর্ততার জন্য, হরিণ তার ক্ষিপ্রতার জন্য। মানুষ গোড়ার দিকে বাস করত পশুর মতো, ফলমূল সংগ্রহ করত, ঝড় এলে ঝোপের নিচে বা গুহার মধ্যে আশ্রয় নিত।

তারপরে কবি পরের সীমানায় উপস্থিত হলেন। এখানে মানুষ হয়ে উঠেছে মানবোচিত। তারা জঙ্গলের মধ্যে জন্তুজানোয়ারকে তাড়া করে, বড়ো বড়ো লাঠি দিয়ে পিটিয়ে তাদের মেরে ফেলে, কিংবা জন্তুজানোয়ারের দিকে ঢিল ছোঁড়ে। বাজ পড়ে গাছে আগুন ধরে যায়, সেখান থেকে তারা আগুন সংগ্রহ করে। আগুনের পাশে তৈরি হয় মানুষের প্রথম আবাস। তখনো পর্যন্ত মানুষ আলাদা বাড়িতে বাস করত না। তারা থাকত একসঙ্গে

পরস্পরের কাছে মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য একটা কিছু উপায়ের প্রয়োজন ছিল। প্রথমে তারা এ-কাজটি করত চিৎকার করে বা অঙ্গভঙ্গি করে। ক্রমে ক্রমে অর্থবোধক শব্দ দেখা দিতে লাগল।

সময়ের পথ ধরে অগ্রসর হয়ে কবি উপস্থিত হলেন সেই সময়ে যখন প্রথম শহর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। মানুষ দুই দলে ভাগ হয়ে গেল—একদল শহরে বাস করে ও অন্যেরা গ্রামে বাস করে। লোকে তামা গলাতে শিখল আর নিজেদের জন্য বানিয়ে নিল যুদ্ধের সরঞ্জাম ও কাজের হাতিয়ার। তামার দাম ছিল সোনার চেয়েও বেশি, কেননা তামাকে পিটিয়ে যে কোনো আকার আরো ভালোভাবে দেওয়া চলত। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সবকিছুই বদলায়। তামার জায়গা দখল করল লোহা। নতুন এই ধাতুতে তৈরি যুদ্ধাস্ত্র তামায় তৈরি যুদ্ধাস্ত্রের চেয়ে অনেক ভালো। তামার তলোয়ার লোপ পেল, লোহা দিয়ে তৈরি হলো আরো অনেক ভালো যুদ্ধাস্ত্র।

শত্রু থেকে আড়ালে থাকার জন্য লোকে দুর্গের শক্ত দেয়ালের পিছনে আশ্রয় নিল। এই সমস্ত শক্ত দেয়ালের মধ্যে তারা ধনসম্পদ জড়ো করতে লাগল। ধনের দাম ক্রমেই বেড়ে চলল। সবচেয়ে দামী হয়ে উঠল সোনা, যদিও সেটিকে কোনোক্রমেই সবচেয়ে শক্ত ধাতু বলা চলে না। আগ্রাসী যুদ্ধ-নায়করা দুর্গ আক্রমণ করতে লাগল, শহর ধূলিসাৎ করে দিল। প্রত্যেকেই অন্য প্রত্যেকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল। শেষপর্যন্ত কড়া আইন করতে হলো, সেই আইন মেনে নিয়ে সবাইকে থাকতে হতো।

কবি এগিয়ে চললেন। জমি ও সমুদ্রের ওপরে চাপ বেড়ে চলল মানুষের। সমুদ্র ছেয়ে গেল পাল-তোলা নৌকোয়। অরণ্য সরে গেল পর্বত পর্যন্ত, আর উপত্যকায় দেখা দিল আঙুরের বাগান, জলপাইকুঞ্জ ও ফসলের ক্ষেত। ভাস্করের ছেনি মার্বেল ও ব্রোঞ্জ থেকে কুঁদে কুঁদে ফুটিয়ে তুলল নানা মূর্তি। কবিতা সংগৃহীত হলো আর বংশ থেকে বংশে হস্তান্তরিত হয়ে চলল। যুক্তির দ্বারা চালিত হয়ে মানুষ এগিয়ে চলল শিল্প ও বিজ্ঞানের শিখরের দিকে।

মানুষ কিন্তু নিজেকে খাটো করে দেখল। সবকিছুর জন্য কৃতিত্ব দিল দেবতাদের ক্ষমতাকে। ভাবল, দেবতারা জগৎ শাসন করছে। লোকে বেদীর সামনে মাথা নোয়াল আর এই দেবতাদের কাছেই প্রার্থনা জানাতে লাগল যখন দেখল বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় উঠেছে বা ভূমিকম্প হচ্ছে বা গ্রহণ লেগেছে। তাদের জাহাজ যখন নিরাপদে বন্দরে পৌঁছল তখন তারা এই দেবতাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাল। ছোট শিশু যেমন অন্ধকারকে ভয় পায়, তেমনি বয়স্করা ভয় পেতে লাগল যা-কিছু তারা আগে দেখেনি এমন সমস্ত কিছুকে।

কিন্তু তাদের মধ্যে কিছু জ্ঞানী ব্যক্তিও ছিলেন। তাঁরা লোককে বিজ্ঞান শেখালেন। সূর্যের অন্তর্ভেদী রশ্মি যেমন অন্ধকার দূর করে, তেমনি যুক্তির আলোয় ক্রমে ক্রমে দূর হয় প্রকৃতির ভয়।

এবারে কবি এসে পৌঁছলেন তাঁর নিজের সময়ে, তার স্বদেশ রোমে। সারা বিশ্বকে আয়ত্তে আনার জন্য রোম তখন সংগ্রাম করছে। সীজার তাঁর বাহিনীকে নিয়ে চলেছেন গল্-এর দিকে। কিন্তু লুক্রেটিয়াস বেশিক্ষণের জন্য এখানে থামলেন না। দ্রুত পায়ে এগিয়ে চললেন যাতে ভবিষ্যতের মধ্যে দৃষ্টিপাত করতে পারেন। সেই সময়ে পৌঁছতে পারেন যখন জগৎ আবার

ভেঙে পড়বে এবং আবার ফিরে যাবে সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যে যেখান থেকে জগৎ বেরিয়ে এসেছিল। কেননা পরমাণুর বিনাশ নেই, বিশ্ব অনন্ত। বিশৃঙ্খলা থেকে পরমাণুগুলি আবার গড়ে তুলবে অন্য জগৎ, অন্য মানুষের জন্ম হবে, অন্য এক জগতে পুনরায় চেতনার আবির্ভাব ঘটবে।

অতএব কবি অনেক দূরের দিকে তাকালেন এবং আগে থেকেই দেখতে পেলেন অন্য এক জগৎ, যার সৃষ্টি আমাদের জগতের পরে।

মানুষের জীবনের মেয়াদ ছোট, কিন্তু যুক্তির জীবন দীর্ঘ। পলকের মধ্যে তা শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে যেতে পারে। এটা কি মস্ত এক বিজয় নয়? যাই হোক, এই বিজয় নিয়ে উৎসব করার সময় এখনো আসেনি। লুক্রেটিয়াস অনন্তকে ভেদ করেছিলেন। তিনি কি সবকিছু জানতেন না? না। প্রকৃতিকে জানা এত সহজ নয়। লুক্রেটিয়াসের পূর্ববর্তীরা মস্ত মস্ত মানুষ ছিলেন—এম্পিডোক্লিস, লিউসিপাস, ডিমোক্রিটাস, এপিকিউরাস। তবুও বর্তমানকে ব্যাখ্যা করার জন্য ও ভবিষ্যতকে দেখার জন্য কতবারই না তাঁকে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। বহুবার তিনি পথ হারিয়েছেন, বহুবার ভুল অনুমান করেছেন।

শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়েছে মানুষের জানতে কেমনভাবে এই জগতের সৃষ্টি, কেমনভাবে অজৈব পদার্থ থেকে জৈব পদার্থের উদ্ভব, কোথা থেকে চেতনার আবির্ভাব। প্রতি পদক্ষেপে বিরাট বিরাট তর্ক ও লড়াই হয়ে গিয়েছে। প্রতি পদক্ষেপের সময়ে এমন লোক থেকে গিয়েছে যারা বলে, 'এটা অজ্ঞেয়, মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির বাইরে'। কিন্তু বিজ্ঞান এগিয়ে চলে, নতুনরা তার দলে যোগ দেয়, আর তারাই মানুষকে নিয়ে চলে পূর্ণতর জ্ঞানের দিকে।

৩। মানুষ আরো ধীরপায়ে চলে

প্রাচীনদের রচনা যখন আমরা পড়ি তখন এই ভেবে অবাক হই যে কতকিছু তারা জানত। তাদের ছিল কোপারনিকাস—সামোসের আরিস্টার্কাস, যিনি প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন যে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে নয়। তাদের ছিল ওআট—আলেকজান্দ্রিয়ার কারিগর হিরো, যিনি প্রথম চাকা ঘোরাবার জন্য বাষ্পীয় শক্তি ব্যবহার করেছিলেন। তাদের ছিল জ্যোতির্বিদ—ইরাস্টোস্হেনিস, যিনি প্রথম জানতে পেরেছিলেন যে সমুদ্রে জাহাজ ভাসিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরে আসা চলে। তাদের ছিল ভূগোলবিদ—স্ট্রাবো, যিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে মহাসাগরের ওপারে মহাদেশ আবিষ্কৃত হবে। তাদের ছিল পর্যটক—যুবা, যিনি কানারি দ্বীপে গিয়েছিলেন।

কিন্তু আমরা যদি ভাবি বড়ো-হয়ে-ওঠা সেই মানুষ সামনে এগিয়ে যেতে কোনো বাধা পায়নি তাহলে মস্ত ভুল হবে। তার হাত ও পা বাঁধা ছিল। সে তৈরি করেছিল পয়ঃনালী, খনন করেছিল সুড়ঙ্গ, নিকাশ করেছিল হ্রদ। কিন্তু কাদের হাত এই সমস্ত কাজ করেছিল? দাসদের হাত। এই দাসরা তাদের কাঁধে বহন করেছিল ভারী পাথরের বোঝা. নুয়ে পড়ে দাঁড় টেনেছিল জলপোতে, গভীর ভূগর্ভ খনন করেছিল খনিজের জন্য।

দাসরা না থাকলে কিছুই থাকত না—না প্রাসাদ, না মন্দির, না মঞ্চ, না অলস ধনীদের জন্য বিলাসবহুল ভবন।

এমনি একটি ভবনের দিকে তাকিয়ে দেখা যাক। ভবনের পিছন থেকে উঠে গিয়েছে পর্বত, দু-পাশে পাহাড়ের পাদদেশের ঢালুতে ক্ষেত ও আঙুরের বাগান ছড়ানো, ভবনের জানলা দিয়ে তাকালে খোলা সমুদ্র চোখে পড়ে। গাছপালার মধ্যে ছড়ানো রয়েছে ভারি সুন্দর মার্বেলপাথরের বেঞ্চ।

ভবনের মালিক সারা দিনটি কাটায় বই পড়ে, পায়চারি করে, বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে, সঙ্গীত দর্শন ব্যায়ামচর্চা ও শিকার উপভোগ করে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তার ভোজের আসরে সোনার বাতিদানে বসানো মোমবাতি জ্বলে, বাতিগুলি ধরে থাকে দাসরা। কোনো একজন অতিথি পাণ্ডুলিপি মেলে ধরে একটি কবিতা পাঠ করে—শনি যখন জগৎ শাসন করত সেই সময় সম্পর্কে, আদিম মানুষদের সুখী জীবন সম্পর্কে। অতিথিরা টেবিলের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়, তাদের মাথায় ফুলের মালা, হাতে সুরাভর্তি চকচকে পানপাত্র।

গৃহকর্তা কিন্তু কবিতা শোনে না। তার মন জুড়ে রয়েছে পরের দিনের কাজের চিন্তা। সেই কাজ শেষ করার জন্য তাকে সকাল সকাল উঠতে হবে। পানপাত্রে পীতাভ সুরার দিকে তাকিয়ে তার মনে পড়ে সুরা তৈরির কাজ শেষ করার জন্য কত কিছু এখনো করতে হবে। শিশুকে বড়ো করে তুলতে যতোখানি কষ্ট, এই কাজ শেষ করতেও তাই। আর এই সমস্ত কাজ করাতে হবে শয়তান ও অলস দাসদের দিয়ে। জমিতে ফলন ক্রমেই কমছে। মনে হয় ফসল ও ফল দিতে জমি নারাজ। আর এই সমস্ত কিছুর কারণ, জমির ভার রয়েছে দাসদের ওপরে। ভোর হতে এখনো অনেক দেরি, অতিথিরা এখনো পানভোজনে মত্ত, কিন্তু এরই মধ্যে দাসরা কাজে চলে গিয়েছে, পালিয়ে যেতে না পারে সেজন্য শেকল দিয়ে বাঁধা অবস্থায়। সৈনিকদের মতো দীর্ঘ সারি বেঁধে তারা কাজে চলেছে, তাদের তদারককারীরা চলেছে পাশেপাশে।

পৃথিবীর সব জায়গা থেকে দাসরা এসেছিল। তাদের মধ্যে ছিল সোনালী-চুল নীল-চোখ জার্মান, ঘোরবর্ণ নুবিয়ান ও লাল-দাড়ি সিদিয়ান। তারা কেউ কাউকে চিনত না। তারা বড়ো হয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন আকাশের নিচে। কিন্তু ভাগ্যের ফেরে এই বিদেশে এসে পরস্পরের ভাই হয়েছে। তাদের কপাল পরিষ্কার করে কামানো, যাতে ভুরুর ওপরের ছাপ চোখে পড়ে। তা সত্ত্বেও তারা কিন্তু সবসময়েই চেষ্টা করে পালিয়ে যেতে। যখন ধরা পড়ে ও ফিরিয়ে আনা হয়, প্রচণ্ড শাস্তি পেতে হয় তাদের, অন্ধকূপে ফেলে দেওয়া হয়, ক্রুশবিদ্ধ করা হয়, জামাকাপড় পীচে ভিজিয়ে নিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়।

প্রভু তার দাসদের নিয়ে যা-খুশি করতে পারে। তারা তার সম্পত্তি, তার হাতিয়ার। তা সত্ত্বেও তারা পালিয়ে যায়। তারা ঘৃণা করে তাদের কাজ, তাদের লাঙল, তাদের বলদ, তাদের প্রভু ও তাদের তদারককারীকে। তারা চায় শুধু মুক্ত হতে!

যে দাস সে-ও মানুষ। কিন্তু তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করা হয় যেন সে একটা বলদ বা লাঙল। আর তার হাতে ছেড়ে দেওয়া সেই বলদ বা

লাঙলের ওপরেই সে প্রতিহিংসা নিয়ে থাকে। সেগুলিকে সে দেখে ব্যক্তিগত শত্রু হিসেবে। তার হাতিয়ারগুলি স্থূল ও বেঢপ, কিন্তু সেগুলি আরও উন্নত করে তোলার জন্য কারও মাথাব্যথা নেই। দাস তার খালি পায়ে সুরা মাড়ায়, মুগুর দিয়ে শস্য মাড়াই করে, ইঁট ও চুনসুরকির বোঝা পিঠের ওপরে বয়ে নিয়ে যায়।

দাসের গোটা জীবনটাই দীর্ঘ এক শাস্তি, একটানা নির্যাতন—বছরের পর বছর। জমিদাররা তাদের দাসদের প্রচণ্ড ভয় করে চলে। তারা তাদের দাসদের কপালে চিহ্ন দেগে দেয়, মাথার অর্ধেক মুড়িয়ে দেয়। দাসরা বিদ্রোহ করে, তাদের প্রভুদের ভবন ভেঙে পুড়িয়ে দেয়। গ্লেডিয়েটর-দাস স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে যে বিদ্রোহ হয়েছিল তার কথা সবাই জানে। রোমানদের সেরা সৈন্যবাহিনীও দীর্ঘকাল সেই বিদ্রোহ দমন করতে পারেনি। রাজপথের দুই ধারে সারি সারি ক্রুশ খাড়া হয়েছিল, তাতে দাসদের ক্রুশবিদ্ধ করা হতো। তারা বরং প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু লড়াই ছাড়েনি। দাসের জীবনের চেয়ে খারাপ আর কী হতে পারে।

দাসত্বের পথ সকলকেই একটা বন্ধভূমিতে এনে ফেলেছিল। বেরিয়ে যাবার পথ কী? শুধু দাসরা নিজেরা নয়, এমনকি তাদের প্রভুরাও চেষ্টা করেছিল দাসব্যবস্থার ভারী শেকল থেকে নিজেদের মুক্ত করতে।

জমিদাররা ভাবছিল এই অসন্তোষজনক দাস-শ্রমের বদলে আর কিছু পাওয়া যায় কিনা। তারা নিজেদের জমি খণ্ড-খণ্ড করে প্রজাদের মধ্যে খাজনায় বিলি করে দিল, যে প্রজারা ছিল স্বাধীন রায়ত। একজন স্বাধীন মানুষ একজন দাসের চেয়ে জমির আরো বেশি যত্ন নেবে, এটাই স্বাভাবিক। জমিদাররা তাই আশা করল, এই স্বাধীন মানুষদের হাতে জমি আরো সুফলা হবে। কিন্তু জমিদাররা কোথায় খোঁজ করবে শক্ত-সমর্থ বিশ্বাসী রায়তের? যারা সবচেয়ে নিচু শ্রেণী, সবচেয়ে দারিদ্র্যপীড়িত, তাদের মধ্যে জমি বিলি করাটা কি ঠিক হবে? কিন্তু এই লোকগুলি তো ঋণে ডুবে আছে, খাজনা দেবার সামর্থ্য কোথায় এদের? তাছাড়া এদের হালবলদও নেই, যা বাঁধা রেখে খাজনা আদায় করা যেতে পারে।

জমিদারদের উৎকণ্ঠা বেড়েই চলল। আর প্রজাদেরও সবসময়ে এই দুশ্চিন্তা যে কী করলে ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, কী করলে যথেষ্ট খেতে পাওয়া যায়, আরো কী যে করা যায়। মনে হচ্ছিল, কোনো একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটা ছাড়া প্রজারা তাদের দুর্দশা থেকে মুক্তি পেতে পারে না।

গ্রামের জীবনে দুঃখকষ্ট বেড়েই চলল। কিন্তু শহরের জীবনও যে তার চেয়ে কিছু ভালো ছিল তা নয়। রোমান বণিকদের মুখে অভিযোগ শোনা যেত যে সময় খুবই খারাপ। তাদের সামগ্রীগুলি বিদেশে নকল হচ্ছিল এবং পরে আবার রোমে পাঠানো হচ্ছিল কম দামে বিক্রি করার জন্য। বস্ত্র আসছিল গল্ থেকে, কাঁচের বাসন আলেকজান্দ্রিয়া থেকে, রুপোর কৌটো স্পেন থেকে। কাঁচ ও মাটির পাত্র তৈরির কাজে রোমান কর্মী যদি থাকে একজন তাহলে জেলাগুলিতে, লিয়ঁতে, বোর্দো-তে ট্রীর-এ আছে কয়েক ডজন। আর এই বর্বররা কী চমৎকার পাত্র যে বানায়!

কয়েক ডজন জাতিকে রোম শৃংখলিত করেছিল এবং তাদের দিয়ে কাজ করাচ্ছিল। কাজের এমনই গুণ যে কাজ যারা করে তারা কাজ শিখে ফেলে।

রাইন, রোন ও টেমস নদীর তীরে যারা বাস করত তারা প্রচুর কাজ শিখে ফেলল এবং তার ফলে উন্নতি করল। সে-জায়গায় রোম যা করল তা শুধু খাজনার দাবি তোলা—আরো খাজনা, আরো খাজনা। রোমানদের হাত কাজে অনভ্যস্ত ছিল। কাজ না করে সহজেই জিনিস পাওয়া যাচ্ছিল।

রোমান বণিকরাও কাজকর্ম থামিয়ে দিয়েছিল। সমুদ্র ও মরুভূমির পথে লম্বা লম্বা পাড়ি দেবার বিপদের ঝুঁকি নেওয়া আর কেন? ওসব কাজ করুক সিরীয় ও আরব ও পার্থিয়ান ও মিশরীয়রা। রোমানরা শুধু ইঙ্গিত দিয়ে চলবে মাত্র, তাহলেই ভারতবর্ষের সম্পদ এসে জড়ো হবে তাদের পায়ের কাছে। রোমানরা যেটুকু কাজ নিজেদের জন্য রেখে দিল তা হচ্ছে শুধু দাবি জানানো। আর মানুষের ওপরে আধিপত্য বজায় রাখতে হলে রোমের অবশ্যই থাকা দরকার ছিল শক্তি। রোমানদের তাই ছিল আশ্চর্যরকমের শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সাহসী সৈন্যবাহিনী। কিন্তু এই সৈন্যবাহিনীকে অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হতো এবং ক্রমে ক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে নতুন সৈন্যবাহিনী দলভুক্ত করার দরকার হয়ে পড়ল। শেষপর্যন্ত দেখা গেল সারা সাম্রাজ্য জুড়ে ছড়ানো বিশাল সৈন্যবাহিনীর ঘাটতি পূরণ করার মতো যথেষ্ট সংখ্যক রোমান অবশিষ্ট নেই। তখন হাত বাড়াতে হলো জার্মান ও গরিলাদের সৈন্যদলভুক্ত করার দিকে। শেষকালে এমন হলো যে সৈন্য-বাহিনীতে দেশীয় রোমানদের চেয়ে এই বর্বরদের সংখ্যাই বেশি হয়ে দাঁড়াল। সৈন্যবাহিনীর অধিনায়কত্ব পর্যন্ত জার্মানদের হাতে এসে গেল।

সুতরাং, জগতের কেন্দ্রস্থলে রোম টিকে রইল বিশাল এক পরজীবীর মতো। কিন্তু পরজীবী মাত্রই নিজের ধ্বংস নিজে ডেকে আনে। নিজের ওপরে নির্ভর করে টিকে থাকার সামর্থ্য তার থাকে না। রোম ক্রমেই হতে লাগল আরো বেশি দুর্বল, আর যে-সব জাতিকে সে শৃঙ্খলিত করেছিল তারা আরো বেশি শক্তিশালী। আর রোম যতোই দুর্বল হতে লাগল ততোই হিংস্র হয়ে উঠল টিকে থাকার জন্য তার লড়াই। বর্বরদের অনুপ্রবেশ অনবরত বেড়েই চলছিল, তারও বোঝাপড়া করতে হচ্ছিল রোমকে। ইতালির উত্তরদিকে বিশাল এক দুর্গবপ্র নির্মাণ করেছিল রোমানরা। কিন্তু সেই বপ্রতেও বর্বরদের ঠেকানো গেল না। আল্‌পস ডিঙিয়ে এসে তারা দলে দলে ভিড় করতে লাগল ইতালির উপদ্বীপের রাজপথ বরাবর। ইতালির উন্মুক্ত গ্রামাঞ্চলে বাস করাটাই বিপজ্জনক হয়ে উঠল। প্রত্যেকটি বাগানবাড়ি হয়ে উঠল উঁচু দেয়াল-ঘেরা দুর্গ। এমনকি নগর পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে উঠল। সেইসব দিন আর থাকল না যখন রোমানরা গল্‌-এ নগর বানাত আর সেই নগরকে অলংকৃত করত মন্দির, ক্রীড়াঙ্গন ও মঞ্চ দিয়ে। এখন গল্‌-এর প্রত্যেকটি ভবন এক সশস্ত্র শিবির, নগরের কেন্দ্রস্থলে অস্ত্রাগার আর সেই অস্ত্রাগার ঘিরে জোটবাঁধা ঘরবাড়ি। চারদিক উঁচু দেয়ালে ঘেরা।

শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে গেল। খ্রীষ্টাব্দ তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দী। সন্ধ্যার ঘনায়মান ছায়ার মতো মধ্যযুগ আসন্ন। ল্যাটিন ভাষায় অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ দেখা দিতে লাগল। 'বুর্গুস' শব্দটি ছিল জার্মান, তার অর্থ দুর্গ। রোমানরা দাড়ি গজাল। টোগার বদলে তারা পরতে লাগল বর্বরদের পোশাক—লম্বা আস্তিনওলা শার্ট ও জ্যাকেট। এমনকি উত্তরের নগরগুলিতে মানুষের গায়ে প্রায়ই দেখা যেতে লাগল 'শুবা' বা ফারের কোট।

টোগার বদলে কিনা বর্বরদের 'শুবা'! রোমানদের পক্ষে খুবই দুর্লক্ষণ বলতে হবে।

৪। মানুষ বিজ্ঞানকে অভিশাপ দেয়

রোমান সাম্রাজ্যে জীবন আরো খারাপ হয়ে উঠল। সর্বত্র দেখা যেতে লাগল, লোভী রাজপুরুষের দল সাধারণ মানুষের ওপরে লুটপাট চালাচ্ছে। শুধু সম্রাট নয়, সরকারী বিভাগের প্রত্যেক কর্তা পর্যন্ত নিজেকে ভাবত সীজার ও দেবতা। কারও পানভোজন চলত সারারাত ধরে, সকাল না হওয়া পর্যন্ত। তারপরেও ওষুধ খেয়ে বমি করত যাতে পানভোজন চালিয়ে যেতে পারে। আর অন্যরা না খেয়ে মরত। ভরাপেট মানুষের চেয়ে ভুখা মানুষের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। যতো-না মোটাসোটা মানুষ, তার চেয়ে অনেক বেশি দেখা যেত কংকাল।

গ্রামের দিকে রায়তরা পিষে যাচ্ছিল খাজনা কর ও বিশেষ করের যাঁতাকলে। অনেকেই নিজেদের জমির টুকরো ছেড়ে দিয়ে বিদেশে পালিয়ে গিয়েছিল। তারা বলত, রোমানদের বন্য অমানবিকতা তারা সহ্য করতে পারছিল না। বর্বরদের মধ্যে বসবাস করলে খাজনার ভার দুঃসহ হতো না। রোমান শাসনে স্বাধীন মানুষের চেয়ে বর্বরদের মধ্যে দাসও আরো ভালো-ভাবে জীবন কাটাত।

জমিদারদের আওতা থেকে কৃষকরা যখন পালিয়ে যেত তাদের আবার ধরে আনা হতো। অদৃশ্য এক শেকলে তারা বাঁধা থাকত জমির সঙ্গে। আর পালিয়ে-যাওয়া কৃষককে যখন দাসের মতোই শেকল দিয়ে বাঁধা হতো, অদৃশ্য শেকলটি দৃশ্যমান হতো তখন। তারা দাস ছিল তাদের প্রভুর নয়—জমির। আইনে তাদের তাই বলা হতো।

জমি বিক্রি হতো জমিতে চাষ করত যে-শ্রমিক সেই কৃষক সমেত। এমনিতে স্বাধীন মানুষ, কিন্তু আসলে সে ছিল বাড়ির সহায়ক সরঞ্জামের অংগ—যেমন হয়ে থাকে বলদ বা লাঙল। হস্তশিল্পী বাঁধা থাকে তার হস্তশিল্পের সংগে। কাঠকয়লার ব্যবসায়ীর ছেলেকে হতে হয় কাঠকয়লার ব্যবসায়ী, তাঁতীর ছেলেকে তাঁতী।

কাজ সম্পর্কে সবসময়েই অবজ্ঞা ছিল, মনে করা হতো কাজ হচ্ছে দাসদের ব্যাপার। কিন্তু এখন ব্যাপারটা এই দাঁড়াল—যে-মানুষ স্বাধীন, যে মেহনত করে দৈনন্দিন রুটি রোজগার করে, এমনকি সেও মানুষ বলে গণ্য হচ্ছে না। কৃষক ও হস্তশিল্পীদের সম্পর্কে জারি করা একটি রাজকীয় হুকুমনামায় বলা হয়েছে : "কাজের অবমাননায় কলঙ্কিত এই সমস্ত মানুষ যেন মানবিক মর্যাদা পেতে না চায়। তারা যেখানে আছে সেখানেই থাকুক।"

কাজের অবমাননা!

এই কথাগুলির মধ্যে রয়েছে দাসত্ব-ভিত্তিক একটি ব্যবস্থার ও রাষ্ট্রের মৃত্যু-পরোয়ানা। এই রাষ্ট্রের জীবন শেষ হয়ে এসেছে।

রাজপথে দস্যুদের ভিড়। কৃষকদের চোখে তারা বীর ও প্রতিশোধ-গ্রহণকারী। কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের শক্তি আরো দুর্বল হচ্ছে। জমিদাররা

নিজেরাই খাড়া করছে নিজেদের আদালত এবং নিজেদের ভবনগুলি দুর্গের মতো সুরক্ষিত করে তুলছে। সরকারী প্রশাসনের মজবুত এক সৌধ নির্মাণ করেছিল রোম, সেটি এখন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়েছে। সর্বত্র বিরাজ করছে আইনশৃঙ্খলার অবহেলা ও অরাজকতা। একজন সম্রাট শাসন করছে পশ্চিমে, অপর একজন পূবে। কখনো কখনো একই সঙ্গে চারজন সীজারের আবির্ভাব হচ্ছে।

সকল পথ যায় রোমের দিকে। কিন্তু এখন নতুন নতুন রাজধানী হয়ে গিয়েছে। সীজাররা বাস করছে ট্রিভেস, মিলান, নিকোমিডিয়া ও কনস্টান্টিনোপ্‌ল-এ। এক সময়ে রোম গর্ব করে বলত, সে বিশ্ব জয় করেছে। এখন লুটের মাল নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিচ্ছে বর্বররা। যে-সময় রাজপথ দিয়ে বিজয়ী রোমান সৈন্যবাহিনী মার্চ করে গিয়েছিল সেখান দিয়ে এখন হেঁটে চলেছে ফ্রাঙ্ক গোথ ও স্যাক্‌সনরা। কেউ ডেরা বাঁধল গল্‌-এ, কেউ উপসাগর পেরিয়ে ব্রিটেনে, কেউ-বা আবার স্পেনে।

রোমের মৃত্যু হচ্ছিল, একশো বছর ধরে চলেছিল তার মৃত্যু-যন্ত্রণা।

পূব থেকে হূনরা ঝাঁপিয়ে পড়ল, আগুনে পুড়িয়ে ছারখার করে দিল জগৎ, রক্তস্নান করিয়ে দিল। প্রত্যেকটি আঙিনায়, প্রত্যেকটি ঘরে নিজস্ব দেবতা ছিল। লোকে সেইসব দেবতার কাছে মুক্তির জন্য প্রার্থনা জানাল। কিন্তু দেবতারা কেন মানুষের প্রার্থনা শুনছে না? যতো রকমের বিদেশী দেবতা আছে—যেমন মিশরীয়দের আইসিস, বাবিলনীয়দের আস্‌তার্তে—সকলের কাছে লোকে শরণ নিল। একজন রোমান সম্রাট বেদী তুলল দেবতা মিথ্‌রাসের উদ্দেশে। লোকে শেষ পর্যন্ত আশা টিকিয়ে রাখল যে একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটে যেতে পারে, ভরসা রাখল ডাকিনীতন্ত্র ও যাদুর ওপরে। জগৎ আবার ভরে গেল কুসংস্কারে, ডুবে গেল অন্ধ বিশ্বাসে।

নিজেদের ওপরেই মানুষের আর আস্থা রইল না। তারা অনুভব করতে লাগল তাদের কোনো দাম নেই, তারা অসহায়। তারা বলল, ‘এত সমস্ত বিজ্ঞান, তা আমাদের কী উপকার করেছে? তবুও তো আমি শেষ হয়ে যাচ্ছি। পৃথিবী সমতল না গোল, তা দিয়ে আমার কী যায় আসে? তারাগুলি আকাশে স্থির হয়ে আছে না নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে, তাতে আমার কী উপকারটা হয় শুনি? বিজ্ঞান আমাকে না দিয়েছে স্বাধীনতা, না সুখ। আর যাই হোক না কেন, সত্য কী, তা কি আমি জানতে পারি? যতোই জানি সত্য থেকে দূরে সরে যাই।’ এমনিভাবে বিজ্ঞানকে মানুষ অভিশাপ দিতে লাগল, যে বিজ্ঞানের ওপরে তারা এতটা ভরসা রেখেছিল।

লোকে আশা করতে লাগল যে একজন ত্রাতার আবির্ভাব হবে, যিনি হবেন গরিব ও পদদলিতদের বন্ধু। এই বিশ্বাসের জন্ম হয়েছিল ছোট জুডিয়াতে, সেখানে মানুষ অনেককাল ধরে আশা করে আসছিল যে একজন মেসিয়া বা ত্রাতা আসছেন। গ্যালিলিতে জেলে ও চাষীরা, দাস ও ভিখিরিরা মুখে মুখে এই কথা ছড়িয়ে দিল যে ত্রাতা সত্যিই এসে গিয়েছেন। তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন, তাদের জন্য রক্ত ঝরিয়ে তাদের মুক্তি অর্জন করেছেন, তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন, তাদের বাঁচাবার জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন।

রোম চেয়েছিল এই ক্রমবর্ধমান ধর্মকে পিষে মেরে ফেলতে, রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিতে, আগুনে পুড়িয়ে ছাই করতে। কিন্তু যতোই নির্যাতন চলুক,

তা যেন এই নতুন বিশ্বাসের ছড়িয়ে-পড়া আগুনে আরো জ্বালানি যোগান দিল।

হিংস্র পশুর খাদ্য করে তোলা হলো খ্রীষ্টানদের, শূলে বেঁধে পোড়ানো হলো, মহিষের পায়ে বেঁধে রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হলো। রোমানরা সমস্ত রকমে চেষ্টা করল যাতে খ্রীষ্টানরা তাদের যীশুকে অস্বীকার করে। খ্রীষ্টানদের তারা বলল, 'তোমরা শুধু একবার সম্রাটের কাছে প্রার্থনা করো তাহলেই তোমরা প্রাণে বেঁচে যাবে।' কিন্তু কোনো কিছুতেই কাজ হলো না। এমনকি বাচ্চা ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত জবাব দিল, 'আমি খ্রীষ্টান।'

একজন শাসনকর্তা সম্রাটের কাছে চিঠি লিখল, 'এই বিশ্বাস শুধু যে বড়ো বড়ো শহরগুলিকে গ্রাস করেছে তা নয়, সবচেয়ে ছোট ছোট গ্রামগুলিতে পর্যন্ত ছড়িয়েছে। তবুও আমি মনে করি এই বিশ্বাসকে দমন করতে পারব।'

সে ভুল মনে করেছিল।

একটা সময় ছিল যখন রোম পাথরের দেয়াল চূর্ণ করে অগ্রসর হয়েছে, জাতি থেকে জাতিকে পৃথক করে রাখে যে অদৃশ্য আড়াল তা ধ্বংস করেছে, বহু প্রাচীন রীতিনীতি ও ঐতিহ্য ভেঙেছে। এই সমস্ত প্রাচীন ধর্ম ও বিশ্বাসের খণ্ড থেকে জন্ম নিচ্ছে এক নতুন ধর্ম। এই ধর্ম সকলের কাছে সমানভাবে দোর খুলে দিয়েছে, কোনো তফাত করেনি গ্রীক ও ইহুদির মধ্যে, রোমান ও বর্বরের মধ্যে। প্রত্যেকেই মানুষ।

সুসমাচার পড়ে একজন গ্রীকের মনে পড়ত তার দার্শনিকদের কথা। প্লেটো বলে গিয়েছিলেন নতুন ও আরও উৎকৃষ্ট জগতের কথা, যেখানে মানুষ একসঙ্গে মিলেমিশে সুখে বাস করবে। ডায়োজিনিস কখনো গ্রীক ও বর্বরকে আলাদা করে দেখেননি। নিজেকে তিনি বলতেন বিশ্বের নাগরিক।

সুসমাচার পড়ে একজন রোমানের মনে পড়ত সেনেকার কথা, যিনি মন্দের জায়গায় ভালোকে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু সরল সাধারণ মানুষ—যারা কোনোদিন প্লেটো বা সেনেকার নাম শোনেনি তারা সবচেয়ে ভালোবাসত নতুন ধর্ম। বড়ো বড়ো নগরের রাস্তায়—আলেকজান্দ্রিয়ায়, সীজারিয়ায়—মানুষের ভিড় জমে যেত। তাদের মধ্যে থাকত কারিগর দাস ও গরিব মানুষরা। খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের কথা তারা আগ্রহের সঙ্গে শুনত।

বক্তারা চিৎকার করে বলত, 'রোম, তুমি নিপাত যাও! নোংরা, চরিত্রহীন রোম, তুমি নিপাত যাও! দিন আসছে যখন আগুন তোমাকে ধ্বংস করবে। ছাইয়ের পাহাড়ে ডুবে যাবে তোমার প্রাসাদ। নগরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে নেকড়েরা।'

'তোমরা যারা মেহনত করো, তোমরা যারা ভারে ক্লিষ্ট, চলে এসো আমার কাছে।... আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব।... নম্ররাই ধন্য, কেননা এই পৃথিবীর মালিকানা তাদেরই।'

লোকে আগ্রহের সঙ্গে এসব কথা শুনত। কপালে দাগ ও কাঁধে ক্ষত-চিহ্ন নিয়ে দাসরা কথাগুলি অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিল। কতটুকু আশা করতে পারত তারা? হতাশায় মরিয়া হয়ে উঠে কতবারই-না তারা অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল! আলেকজান্দ্রিয়ায় রাস্তার লড়াইয়ে

যে-সব বাড়ি ভেঙে পড়েছে বা পুড়ে গিয়েছে সেখানকার ধ্বংসাবশেষে এখনো ঘাস গজায়নি। নগরের পুরো এক-একটি এলাকা পাথর ও ছাইয়ের স্তূপে পরিণত হয়েছিল। বহু প্রাসাদেরই কোনো চিহ্ন থাকেনি। এমনকি যে মিউজিয়ম নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ার এত গর্ব সেটিও সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছিল। কিন্তু এই অভ্যুত্থানকেও রোমান সৈন্যবাহিনী চরম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে দমন করেছিল।

আর যারা এইসব লড়াইয়ের পরেও বেঁচেছিল তাদেরই বা আশা করার কী ছিল? অবশ্যই, তাদের হীনাবস্থা থেকে তারা উদ্ধার পেতে পারত একমাত্র যদি একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটত—ত্রাতা তাঁর পুনরুত্থানের মধ্যে দিয়ে মুক্তি এনে দিতে পারত তাদের। অতএব তারা মনোযোগের সঙ্গে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের বাণী শুনেছিল, যারা ছিল তাদের মতোই দাস।

বছরের পর বছর কাটে, পার হয়ে যায় তৃতীয় ও চতুর্থ শতক। শেষ-পর্যন্ত সম্রাট নিজেও বুঝতে শুরু করেন যে নতুন ধর্মকে দমন করার চেষ্টা অর্থহীন। তাছাড়াও কথা আছে, সাম্রাজ্যের জন্য তো এটাই দরকার—সর্বজনীন একটি ধর্ম, যার সাহায্যে সাম্রাজ্যকে অটুট রাখা যায়।

অতএব, শতকের পর শতক নির্যাতন চলার পরে খ্রীষ্টানরা অবশেষে বিজয়ী হয়। সম্রাট কনস্টান্‌টিন নিজেই এই নতুন ধর্ম গ্রহণ করেন ও খ্রীষ্টান হন। প্যাগান দেবতাদের চেয়েও শক্তিশালী হন খ্রীষ্ট। সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য তাকে খ্রীষ্টের রক্ষণাবেক্ষণে সঁপে দেবার প্রয়োজন ছিল।

ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়কুটো আঁকড়ে ধরে তেমনি রোম তুলে ধরল ক্রুশ। একসময়ে রোমানরা দাসদের ক্রুশবিদ্ধ করত, এখন ক্রুশ হয়ে উঠল ধ্বংসপ্রাপ্ত রোমের পতাকা। কিন্তু সেই ক্রুশ রোমকে রক্ষা করতে পারেনি। ক্রুশ থেকে যেতে পারত, রোমের বিশপ হয়ে উঠতে পারতেন সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তি, কিন্তু রোম সাম্রাজ্যের কোনো ভবিষ্যৎ ছিল না। দুরারোগ্য ব্যাধিতে সাম্রাজ্যের মৃত্যু হচ্ছিল। ব্যাধিটি হচ্ছে দাসত্ব—খ্রীষ্টধর্ম সেই ব্যাধি নিরাময় করতে পারত না। শুধু পারত যন্ত্রণাকে আরো দীর্ঘস্থায়ী করতে।

ধর্মীয় বাণী দেবার সময়ে বিশপরা দাসদের বলত, 'খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী আমাদের ভাইরা', কিন্তু নিজেদের দাসদের মুক্তি দেবার জন্য তাদের কোনো তাড়া ছিল না। তারা দাসদের জন্য স্বর্গরাজ্য অঙ্গীকার করত, কিন্তু পৃথিবীর রাজ্যটি রেখে দেওয়া হতো পৃথিবীর জীবন্ত শাসকদের হাতে। আগেকার কালের প্যাগানদের চেয়েও এই শাসকরা ছিল আরো বেশি নির্মম, যার পরিচয় পাওয়া যেত পালিয়ে-যাওয়া দাসদের ফিরিয়ে আনা ও বর্বরদের অভ্যুত্থানকে দমন করার ব্যাপারে। রোম নিজের কবর নিজেই খুঁড়ছিল।

তারপরে সেই ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গিয়েছিল। রোম অবরোধ করেছিল বর্বররা। সারা নগর অনাহারে ছিল। মানুষজন পাগল হয়ে গিয়েছিল, পরস্পরকে খুন করেছিল, এমনকি মায়েরা নিজেদের সন্তানদের পর্যন্ত রেহাই দেয়নি। দাসরা নগর দখল করে নিয়েছিল ও অবরোধকারীদের সামনে নগরের তোরণ খুলে দিয়েছিল।

শতকের পর শতক দাস-মালিকরা বর্বরদের মনে করে আসছিল মানুষের চেয়েও হীন। 'বর্বর' ও 'দাস' প্রকৃতপক্ষে তাদের কাছে মানুষ বলে গণ্য

হতো না। এখন সময় হয়েছে যখন বর্বর ও দাসরা রোমান প্রভুদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ।

দাসত্বের দ্বারা রোম শক্তিশালী হয়েছিল। দাসত্বই তার ধ্বংসের কারণ হলো।

উত্তর থেকে গোথ্‌রা এসে রোমকে শেষ করেছিল। তাদের পরে এসেছিল ভ্যান্ডালরা। তারা সমস্ত বড়ো বড়ো মন্দির ও মঞ্চ ধ্বংস করেছিল, পুলের ধারে সাজানো মূর্তি ভেঙেছিল, রোমান কবিদের রচনাবলী পুড়িয়ে দিয়েছিল।

কবিতা নিয়ে ভ্যান্ডালদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। এই বুনো মানুষরা তখনো পরে থাকত বন্য পশুর চামড়ার পোশাক। তারপরেও দু হাজার বছর ধরে লোক রোমের লুটপাটকারীদের নাম হিসেবে 'ভ্যান্ডাল' শব্দটি মনে রেখেছে। বিস্মৃতির চেয়ে অপযশ আরো লজ্জার বিষয়।

সকল পথ গিয়েছে রোমের সভার দিকে। এখন সেই সভাস্থলে গ্রামের রাস্তার মতো ঘাস গজিয়েছে। এই সমস্ত রাস্তা যেখানে এসে মিলিত হতো—বিশ্ববিজয়ে অভিলাষী রোমের কেন্দ্র—সেখানে তখন ছিল সোনায় মোড়া স্তম্ভ। এখন সেখানে শুয়োর চরে বেড়াচ্ছে।

এখান থেকেই আমাদের নায়ক মানুষ তার যাত্রাপথ আলাদা করে নিক। রোমান সাম্রাজ্যের শেষ তো আর মানুষজাতির শেষ নয়।

এই বইয়ে কত নাম আমরা পেয়েছি, কত মানুষ, কত ঘটনা।

আমরা গিয়েছি নগর থেকে নগরে, যুগ থেকে যুগে। গিয়েছি মাইলেটাসে, এথেন্সে, আলেকজান্দ্রিয়ায়, রোমে। জেনেছি অনেক নাম—থালেস, ডিমোক্রিটাস, আরিস্টটল, লুক্রেটিয়াস।

আমাদের বই যদিও শেষ হচ্ছে, কিন্তু আমাদের নায়কের জীবন অন্তহীন। তার কাহিনী আমরা কখনো শেষ করতে পারব না, কেননা মানুষ বড়ো থেকে আরো বড়ো হচ্ছে, অধিক থেকে আরো অধিক গড়ে তুলছে।

পরের বইয়ে আমরা আবার আমাদের নায়কের কথায় ফিরে আসব। তাকে লক্ষ্য করব জগৎ গড়ে তোলার কাজের মধ্যে।

নামসূচী